ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত

জাবেদ মুহাম্মাদ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত

জাবেদ মুহাম্মাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪২৯
কার্তিক ১৪১৫
অকটোবর ২০০৮

ISBN : 984-843-037-6

মুদ্রণ : আল ফালাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত বিশ টাকা

Islami Arthya Byabosthay Jakat Written by Jabed Mohammad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 2008 Price Taka 120.00 only.

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.০১। যাকাত ১৫

১.০২। যাকাতের অর্থ ১৫

১.০৩। আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত ও যাকাতের সমার্থক শব্দ ১৬

১.০৪। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ ১৭

১.০৫। যাকাত প্রবর্তন ও ফরয হওয়ার দলিল ১৮

■ মাক্কী যুগে যাকাতের ইঙ্গিত ১৮

■ মাদানী যুগে যাকাত প্রদানের তাকীদ ও বিধি-বিধান ২৪

১.০৬। যাকাত আদায় প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ ২৮

■ ইসলাম পূর্ব যুগে অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি ২৮

■ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও এ নবীর উম্মাতের প্রতি ৩০

১.০৭। যথার্থভাবে যাকাত না দেয়ার পরিণতি ৩৪

■ ইহকালীন অশান্তি ৩৫

❑ ইহকালে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া ৩৬

❑ আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা হারানো ৩৬

❑ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বঞ্চিত হওয়া ৩৭

❑ শাস্তির পথ সুগম করে দেয়া ৩৭

■ পরকালীন শাস্তি ৩৯

❑ ধন-সম্পদকে আগুনে উত্তপ্ত করে সেঁকা দেয়া ৩৯

❑ বিষধর সাপ রূপে ধন-সম্পদের দংশন ৪০

❑ কিয়ামাতের দিন গরু ও উটের পদ-দলন ও শিং দিয়ে গুঁতো মারা ৪০

১.০৮। যাকাত মানুষের পরীক্ষার মাধ্যম ঃ কে ঈমানদার, কে মুশরিক ৪১
১.০৯। যাকাত দান বা অনুকম্পা নয়; যাকাত অধিকার ৪২
১.১০। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৪৫
১.১১। যাকাত অমান্যকারী ব্যক্তি কাফির ৪৭
১.১২। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবীগণের যুদ্ধ ৪৯
■ হযরত আবু বাকর (রা.)-এর যুক্তি ৫০
১.১৩। যাকাত মানে ইনকাম ট্যাক্স নয় ৫১
১.১৪। যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য ৫২
১.১৫। যাকাত ও সাদাকাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০১। সম্পদ দাতা কে ৫৫
২.০২। সম্পদের মালিক কে ৫৫
২.০৩। জমিতে ফসল দাতা কে ৫৭
২.০৪। মেধা ও যোগ্যতা কার দান ৬০
২.০৫। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ৬২
■ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্ত ৬২
❑ মুসলিম হওয়া ৬২
❑ বালিগ হওয়া ৬২
❑ আকেল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ৬৩
❑ স্বাধীন হওয়া ৬৩
❑ নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা ৬৩
❑ সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা ৬৩
❑ সম্পদ এক বছর থাকা ৬৪
❑ যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত ৬৪
❑ মৃত ব্যক্তির যাকাত ৬৪
❑ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত ৬৪
❑ বর্হিবিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাত ৬৪

❑ কয়েদী বা সাজাপ্রাপ্ত আসামীর যাকাত ৬৪

❑ মুসাফিরের যাকাত ৬৫

■ ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে শর্ত ৬৫

❑ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ৬৫

❑ ওয়াকফ ৬৫

❑ অবৈধ সম্পদ ৬৫

❑ বর্ধনশীল সম্পদ/প্রবৃদ্ধি ৬৬

❑ নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা ৬৬

❑ মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ৬৬

❑ ঋণমুক্ত হওয়া ৬৭

২.০৬। গণী (ধনী) কে ৬৭

২.০৭। যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ৬৮

২.০৮। নাবালিগ ও পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত ৭১

২.০৯। সুদখোর, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের উপর যাকাত ৭২

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০১। নিসাব কী ৭৩

৩.০২। যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে ৭৪

❑ সোনা-রূপা ৭৪

❑ নগদ অর্থ ৭৫

❑ সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ডের যাকাত ৭৫

❑ ডিপোজিট স্কিম বা দীর্ঘস্থায়ী জমা ৭৫

❑ যৌথ মালিকানাধীন মালের যাকাত ৭৬

❑ তৈজসপত্র, অলংকার, বাড়ি-ঘর ৭৬

❑ বন্ধকী মালের যাকাত ৭৭

❑ ঋণ ও যাকাত ৭৭

❑ ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ৭৭

❑ খনিজ সম্পদ ৭৮
❑ গরু-মহিষ ৭৮
❑ ছাগল-ভেড়া ৭৯
❑ উট ৭৯
❑ ঘোড়া ৮০
❑ লব্ধ গুপ্তধন ৮০
৩.০৩। যাকাতের সম-সাময়িক মাসায়েল ৮০
❑ শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতির যাকাত ৮০
❑ শিল্প-কারখানার উৎপাদনের উপকরণের যাকাত ৮১
❑ বাড়ি ভাড়া ও ফ্লাট বিক্রির ব্যবসা ৮১
❑ গাড়ি ৮২
❑ সরকারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাকাত ৮৩
❑ শেয়ারের ক্ষেত্রে যাকাত ৮৩
❑ বন্ডের ক্ষেত্রে যাকাত ৮৪
❑ হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে যাকাত ৮৫
❑ বাড়ি-ঘরের আসবাবপত্রের যাকাত ৮৫
❑ পেনশনের টাকার যাকাত ৮৬
❑ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত ৮৬
❑ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিক্রির জন্য যে পণ্য রাখা হয় তার যাকাত ৮৭
❑ ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স (বীমা)-এ জমাকৃত অর্থের যাকাত ৮৭
❑ হজ্জ, বিবাহ-শাদী, পড়ালেখার জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত ৮৮
❑ বেনামী সম্পদের যাকাত ৮৮
❑ সিকিউরিটি মানি বা জামানতের টাকার উপর যাকাত ৮৮
❑ হারাম উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদের যাকাত ৮৮
৩.০৪। যেসব সম্পদে যাকাত নেই ৮৯
৩.০৫। যাকাত প্রদানের তারিখ ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০১। উশর কী ৯১

৪.০২। উশর ফরয হওয়ার শর্ত ৯১

৪.০৩। উশর ফরয হওয়ার কুরআন ভিত্তিক দলিল ৯২

৪.০৪। উশরের হাদীসভিত্তিক দলিল ৯৫

৪.০৫। উশরের নিসাব ৯৬

৪.০৬। কৃষিজ ফল ও ফসলের উশর ৯৭

৪.০৭। মধুর উশর ৯৮

৪.০৮। শাক-সব্জির উশর ৯৯

৪.০৯। ইজারা দেয়া জমির ফসলের উশর ৯৯

৪.১০। ওয়াকফকৃত জমির ফসলের উশর ৯৯

৪.১১। ভাগচাষ, আরিয়াহ ও অবৈধ দখলী জমির উশর ১০০

৪.১২। যৌথ মালিকানাভুক্ত জমির উশর ১০০

৪.১৩। যেসব শস্যে উশর নেই ১০০

৪.১৪। উশর বাধ্যতামূলক হওয়ার পর রহিত হওয়ার বিধান ১০১

৪.১৫। উশরী জমির পরিচিতি ১০১

- বাংলাদেশের জমি কী উশরী ১০১
- উশরী পানি ১০৫

৪.১৬। উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য ১০৬

৪.১৭। খারাজ (খাজনা) কী ১০৭

৪.১৮। খারাজী জমির পরিচিতি ১০৮

৪.১৯। খারাজ ও তার শ্রেণী বিভাগ ১০৮

৪.২০। খারাজী পানি ১০৯

৪.২১। খারাজের নিসাব ও তা ব্যয়ের খাত ১০৯

৪.২২। খারাজ রহিত হওয়া ১০৯

৪.২৩। জবর দখলী ইজারা দেয়া জমির খারাজ ১১০
৪.২৪। উশর ও জমির খাজনার মধ্যে পার্থক্য ১১০

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০১। যাকাত আদায় করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ১১২
৫.০২। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাকাতের অর্থ কোথায় দেবেন, কিভাবে দেবেন ১১৪
৫.০৩। বাংলাদেশে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ ১১৪
৫.০৪। বাংলাদেশে প্রাপ্তব্য উশরের পরিমাণ নির্ধারণ ১১৭
৫.০৫। যাকাত আদায় ও তার নিয়মাবলী ১১৮
৫.০৬। যেসব মালের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক ১১৯
৫.০৭। যাকাত কখন আদায় করা উত্তম ১২০
৫.০৮। যাকাত বাবদ প্রদত্ত মালের মান ১২১
৫.০৯। যাকাত প্রদানকারীর পুরস্কার ১২১
- ■ ইহকালীন পুরস্কার ১২১
  - ❑ সম্পদ বৃদ্ধি পায় ১২৩
  - ❑ সম্পদ ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয় ১২৪
  - ❑ মন কলুষমুক্ত হয় ১২৫
  - ❑ মানবতাবোধ জাগ্রত হয় ১২৫
- ■ পরকালীন পুরস্কার ১২৬

৫.১০। যাকাত হিসেবে কী দেয়া উত্তম ১২৭
- ■ নগদ টাকা ১২৭
- ■ শাড়ী-লুঙ্গি ১২৭
- ■ অন্যান্য উপকরণ ১২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০১। কুরআনের বিধান অনুযায়ী যাকাত প্রাপ্তির হকদার কে বা কারা ১২৯
- ■ দরিদ্র ব্যক্তিগণ (আল-ফুকারা) ১৩১
- ■ অভাবী ব্যক্তিগণ (আল-মাসাকিন) ১৩১

■ যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীগণ (আমিলুন) ১৩২
■ মন জয় করার জন্য (মু'আল্লাফাতুল কুলূব) ১৩৩
■ গলদেশ (গোলাম) মুক্তি ১৩৪
■ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (গারিম) ১৩৫
■ আল্লাহর পথে (ফী সাবিলিল্লাহ) ১৩৬
■ মুসাফির-পর্যটক (ইবনুস সাবীল) ১৩৮
৬.০২। যাকাত প্রদান কি আটটি খাতের মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে ১৩৯
৬.০৩। আট শ্রেণীর প্রত্যেককে যাকাত প্রদান ফরয কি না ১৪০
৬.০৪। যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কারা অগ্রাধিকার পাবে ১৪০
৬.০৫। জনকল্যাণমূলক কোন কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কি না ১৪৩
৬.০৬। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় ১৪৩
৬.০৭। যাকাত কী পরিমাণ দেয়া উত্তম ১৪৫
■ ভিক্ষুক পোষা বা ভিক্ষাবৃত্তি উৎসাহিত করার মত না দেয়া ১৪৫
■ জীবিকার উপায় করে দেয়া ১৪৫
■ যখন দেবেই তখন সচ্ছল করে দেয়া ১৪৭
■ বিয়েতে সহযোগিতা প্রদান ১৪৭
■ জ্ঞান অর্জন ও বইপত্র দেয়া ১৪৮
৬.০৮। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা ১৪৯
৬.০৯। বিভিন্ন সংগঠন, মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কর্তৃক যাকাত আদায় ও বণ্টন ১৫৩
৬.১০। অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান ১৫৬
৬.১১। যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন ১৫৭
৬.১২। যাকাত আদায় না করে মারা যাওয়া ১৫৭
৬.১৩। যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং কাউকে ঋণ দেয়া ১৫৮
৬.১৪। নোট, চেক ইত্যাদি দ্বারা যাকাত দেয়া ১৫৮
৬.১৫। মানি-অর্ডার যোগে যাকাত দেয়া ১৫৯

৬.১৬। যথার্থভাবে যাকাত আদায় না করার ফলে
সমাজ ও সামাজিকতার চিত্র ১৫৯
৬.১৭। যাকাত আদায়কারী আল্লাহ ও ঈমানদারদের বন্ধু, আদর্শ মানুষ ১৬২

সপ্তম অধ্যায়

৭.০১। সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ১৬৪
৭.০২। সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব ১৬৪
৭.০৩। ফিতরা কার উপর ওয়াজিব ১৬৬
৭.০৪। যে রোযা রাখেনি তার উপরও কি ওয়াজিব ১৬৭
৭.০৫। কাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়ালীর উপর ওয়াজিব ১৬৮
৭.০৬। ফিতরা কী পরিমাণ দিতে হবে ১৬৮
৭.০৭। ফিতরা কোন সময় দেয়া উত্তম ১৭০
৭.০৮। ফিতরা কাদের দেয়া যাবে ১৭১
৭.০৯। ফিতরা কাদের দেয়া যাবে না ১৭২
৭.১০। ফিতরা দিলে কী উপকার হবে ১৭২

অষ্টম অধ্যায়

৮.০১। প্রশ্নোত্তর বিভাগ ১৭৫
■ যাকাত সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ১৭৫
■ উশর সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ২২৯
■ সাদাকাতুল ফিতর সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ২৩৭

প্রকাশকের কথা

যাকাত ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। বিভিন্ন কারণে সমাজ জীবনে যেই অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় তা দূর করণে যাকাতের ভূমিকা অসাধারণ। সুদ অগণিত মানুষের কাছ থেকে টাকা ছেঁকে নিয়ে এসে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত করে। এর বিপরীতে যাকাত বিত্তবানদের হাত থেকে টাকা বের করে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেয়। অর্থ-সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণে যাকাত একমাত্র প্রক্রিয়া না হলেও নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। যাকাত বহুমাত্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। ব্যক্তি ও সম্পদ উভয়েই এই কল্যাণ লাভ করে থাকে।

তরুণ লেখক জাভেদ মুহাম্মাদ যাকাতের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে লিখেছেন "ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত" শীর্ষক বইটি। তাঁর বইটিতে যাকাত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের প্রয়াস বিদ্যমান। আমাদের বিশ্বাস এই বই পাঠ করে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যাকাত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে বিপুলভাবে উপকৃত হবেন। বইটির কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানাবার জন্য সম্মানিত পাঠকদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে "ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত" শীর্ষক বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

এ সাদাকা তো কেবল–
ফকিরদের জন্য,
মিসকিনদের জন্য,
যারা সাদাকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত তাদের জন্য,
যাদের মন জয় করা প্রয়াজন তাদের জন্য,
দাস মুক্তির জন্য,
ঋণগ্রস্তদের ঋণ মুক্তির জন্য,
আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ও
মুসাফিরদের জন্য।
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফারয বিধান। আল্লাহ্ জ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ।

–সূরা আত্ তাওবা ঃ ৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

যাকাত

দ্বীন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। কালেমা বা ঈমান ও নামায আদায়ের পর যাকাত রীতিমত আদায় করেই একজন ব্যক্তি মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অধিকারী হতে পারে মুসলিম উম্মাহর ভাই হওয়ার, পারে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ করে নিতে। যার স্বীকৃতি আমরা আল-কুরআনুল কারীমে পাই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين

"যদি এই লোকেরা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১১)

প্রকৃতপক্ষে যাকাত ইবাদাতের পর্যায়ে গণ্য। আল-কুরআনুল কারীমে নামাযের সঙ্গেই আছে যাকাতের উল্লেখ। যাকাত ইসলামের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়নের ক্ষেত্রে যাকাত সবচাইতে কার্যকর ব্যবস্থা। যাকাত সম্পদশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার হবার কারণে যদি কেউ এটি পরিশোধ না করে তাহলে সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠী যেমন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি সমাজে বেড়ে যায় নানা অন্যায় ও শান্তি-সম্প্রীতি বিরোধী কর্মকাণ্ড। পক্ষান্তরে তার বাস্তবায়নে সামগ্রিকভাবে সমাজ থেকে অন্যায় আচরণ দূরীভূত হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থা হয় সুষ্ঠু সুন্দর, বিকশিত ও সুসংহত। মানুষ হয় ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত। সম্পদ-শালীদের সম্পদ হয় নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ।

যাকাতের অর্থ

যাকাত আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধকরণ ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত শব্দটি সম্পদশালীদের সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

"তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত উসুল কর যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

যাকাত একদিকে যাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে। অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। যাকাতের এই প্রবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-মালের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হলো যাকাত। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এটি সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্যও ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ প্রদান করে। সম্পদের এ সুষম বণ্টনের জন্য ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে এই যাকাত।

আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত ও যাকাতের সমার্থক শব্দ

আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি বার বার উল্লেখ করাই মুসলিম জাতিকে ইঙ্গিত প্রদান করে তার গুরুত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে কতটুকু। মূলত: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদেরকে যাকাতের গুরুত্ব বুঝানোর লক্ষ্যে আল-কুরআনুল কারীমে 'যাকাত' শব্দটি ৩০ বার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২৭ বার সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী ০৩ বার সাদাকা শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে– যা যাকাতকেই নির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে যাকাতের সমার্থক আরো দুটি শব্দ হলো সাদাকাহ ও ইনফাক।

সাদাকাহ শব্দের অর্থ হলো সততা বা সত্যবাদিতা। সাদাকাহ ঐ সম্পদকে বলা হয় যা খালেস নিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা হয়। শব্দটি কুরআনুল কারীমে ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এটি ব্যাপক অর্থবোধক। এ জন্যই সাদকায়ে ওয়াজিব (যাকাত, উশর, সাদকাতুল ফিতর)-কেও সাদকাহ বলা যেতে পারে। আবার সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল দান করা হলে সেটাকেও সাদকাহ বলা হবে।

ইনফাক শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো খরচ করা, ব্যয় করা। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ায় ৭৩ বার এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকবারই তা ব্যবহৃত হয়েছে যাকাত অর্থে।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। সাধারণত সালাতের পরই সিয়ামের উল্লেখ করা হয় বলে অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, সালাতের পরই বুঝি সিয়ামের স্থান। কিন্তু আল-কুরআনুল কারীম থেকে জানা যায় সালাতের পর যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য দিকে রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন :

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان

"ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত।

০১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল;
০২. নামায কায়েম করা;
০৩. যাকাত দেয়া;
০৪. হজ্জ করা এবং
০৫. রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করা।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ০৭)

সুতরাং বুঝা গেল— কেউ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা মানে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই পাঁচটি ভিত্তি বা খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক জীবন পরিচালনার কোন বিকল্প পথ নেই। যারা এর কোন একটিকে মানতে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক নীতির একটুও অবমূল্যায়ন করবে তারা দ্বীন তথা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

মূলত: মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম মেনে চলার নামই ইবাদাত। এ ইবাদাতকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

০১. দৈহিক ইবাদাত ও

০২. আর্থিক ইবাদাত।

দৈহিক ইবাদতের গ্রহণযোগ্য বাস্তবরূপ হচ্ছে সালাত আদায় করা আর আর্থিক ইবাদাতের বাস্তবরূপ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। এ দু'টিই মুসলিম উম্মাহর সামর্থবানদের প্রতি সমানভাবে ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত।

যাকাত প্রবর্তন ও ফরয হওয়ার দলিল

মাক্কী যুগে যাকাতের ইঙ্গিত

প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.) মক্কায় অবস্থানকালে তৎকালীন মক্কার লোকদের দারিদ্র্য বিমোচন, ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিতকরণ ও সেখানকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শুভ সূচনা করে মানুষের মাঝে মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং তাদের মন থেকে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দূর করে আদর্শ চরিত্রে বলিয়ান করার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত বিষয়ক যে আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল করেন তা হচ্ছে :

وويل للمشركين - الذين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كافرون

"...... সেই মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অস্বীকারকারী।" (সূরা হামীম-আস-সাজদাহ: ০৬-০৭)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে মুশরিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে যাকাত শব্দটি সর্বপ্রথম সংযোজন করা হয়েছে। এখানে যাকাত শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে তাফসীর কারকদের মত হলো, যাকাত শব্দের অর্থ আত্মার পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা- যা একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দাখিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। সেই সাথে যারা এক আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ়তা অবলম্বন করে না ও তাঁর নিকট ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চায় না তারা মুশরিক; তারা যেমনি আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করে না, তেমনি মৃত্যুর পর আরেক জীবন রয়েছে যেখানে দুনিয়ার ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের পুরস্কার দেয়া হবে এ কথাও বিশ্বাস করে না- এমন মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত। আয়াতটির এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), তাঁর ছাত্র ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) থেকে।

আবার তাফসীরকারকদের আরেকটি অভিমত হচ্ছে– এখানে যাকাত বলতে ধন-সম্পদের যাকাতকে বুঝানো হয়েছে।

বস্তুত তাফসীরকারকদের এ দুই অভিমতের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এখানে যাকাত শব্দটির তাফসীরে এক একটি দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করা হয়েছে মাত্র। আর এ দুটি অভিমতকে একত্র করে দিতেও কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং এ তাফসীরের উপর নির্ভর করে যে কথা বলা যায় তা হলো– আল-কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত সংক্রান্ত এ প্রথম আয়াতটি দ্বারা তৎকালীন মুশরিকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর শিরক পরিহার করা, নিজেদের অধিক সম্পদ থেকে অন্তরের পরিশুদ্ধি সাধনের জন্যে অভাবীদের মাঝে সম্পদ ব্যয় করা আবশ্যক। মূলত এ আয়াতের মাধ্যমে অভাবী, অক্ষম লোকদের মনে এমন আশ্বাসও জাগিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, যদি দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, কুরআনিক বিধি-বিধান মানুষ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে, তাহলে তাদের চরম দুর্দশা লাঘব হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কমে যাবে, তখন সমাজ থেকে শিরকের ফলে যে দুর্ভোগ রয়েছে তার মূলোৎপাটন হবে, জনগণের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পাবে।

এরপরই নাযিল হয়েছে :

الم تلك ايت الكتاب الحكيم - هدى ورحمة للمحسنين -

الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقنون -

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون -

"আলিফ-লাম-মীম। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর তারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা লুকমান : ০১–০৫)

এখানে সফলকাম ব্যক্তিদের পরিচয় দিতে গিয়ে কয়েকটি সৎকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে :

০১. সালাত কায়েম করা।

০২. যাকাত দেয়া।

০৩. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ তিনটি সৎকর্ম যারা করে তারাই যে আল্লাহ নির্দেশিত সঠিক পথে চলছে এবং চূড়ান্ত সাফল্য ও কল্যাণ যে কেবল তারাই লাভ করবে, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার বর্ণনার ভঙ্গি ও শব্দের বিন্যাস এও প্রমাণ করে যে, এ তিনটি সৎকর্ম একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্ন। যেমন সালাত কায়েম করলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ যাকাত না দিলে সালাতের মূল্য হবে না আবার সালাত কায়েম করা ও যাকাত দেয়া নির্ভর করে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের উপর। এবার এ দুটি বা এর যে কোন একটি কাজও যে বা যারা বাস্তবায়ন করবে না তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যায় যে তারা আখিরাত তথা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে মোটেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেননা আল্লাহর বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে তা হলো সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরাই কেবল চূড়ান্ত সাফল্যের অধিকারী হবে। এর কোন একটিকেও অস্বীকার করা বা জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন না করাই হবে পরকালীন জীবনে চরম ব্যর্থতার কারণ।

অত:পর আবিসিনিয়া বা হাবশায় হিজরাতের পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নাযিল করেন সূরা মারইয়াম। এখানেও আল্লাহ শিশু ঈসা (আ.)কে লক্ষ্য করে বলেন :

قال انى عبد الله اتنى الكتب وجعلنى نبيا - وجعلنى مبركا

اين ما كنت واوصنى بالصلوة والزكوة ما دمت حيا -

"সে বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।" (সূরা মারইয়াম : ৩০-৩১)

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীয়াতেও সালাত, যাকাতের বিধান ছিল এবং তাকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এ দু'টি কাজ যে শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এগুলো অতীতের উম্মাতের উপরও ফারয ছিল এখনও আছে। ফলে উম্মতে মুহাম্মদীকেও মেনে চলতে হবে নতুবা শাস্তি নিশ্চিত।

তারপর হাবশায় হিজরাতের বছর রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়েছে সূরা আর-রূম। এখানেও একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত প্রসঙ্গে বলেন :

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

"মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়, এ যাকাত দানকারীরাই সমৃদ্ধশালী।"

(সূরা আর-রূম : ৩৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময়ে মক্কার লোকজনেরা ব্যাপকভাবে সুদ ব্যবসার সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা মনে করত সুদী ব্যবসায় ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ধনী হওয়া যায়। আর কুরআনে যে যাকাতের কথা বলা হয়েছে, এতে ধন-সম্পদ কমে যায়। তৎকালীন সময়ে আরবে ব্যাপক প্রচলিত এ সুদ ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল সর্বপ্রথম নাযিলকৃত এ আয়াত। পাশাপাশি সুদ থেকে মুক্তির জন্য সুদে টাকা গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে এ আয়াতে যাকাত প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে। বস্তুত সুদ ভিত্তিক শোষণমূলক অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি– যা সকলের জন্য কল্যাণধর্মী।

অত:পর মাক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা আল-আম্বিয়া, সূরা আল-মুমিনুন ও সূরা আন-নামল-এ যাকাত বিষয়ক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াত তিনটি হলো পর্যায়ক্রমে :

وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عبدين

"এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ বা বিধান অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদাত করত।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩)

উল্লেখিত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হযরত ইসহাক এবং ইয়াকূব (আ.)-এর সৎকর্ম সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এ আয়াতকেও যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মাতের প্রতি অভিন্ন যে নির্দেশনাটি পাওয়া যায় তাহলো–

০১. সৎকর্মপরায়ণ হওয়া।

০২. সালাত কায়েম করা।

০৩. যাকাত দেয়া এবং
০৪. আল্লাহর বিধান মেনে চলে তাঁরই ইবাদাত করা।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

قد افلح المؤمنون - الذين هم فى صلاتهم خاشعون - والذين هم عن اللغو معرضون - والذين هم للزكوة فاعلون - والذين هم لفروجهم حافظون -

"নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে সেই মুমিন লোকেরা যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত, যারা বেহুদা কাজ থেকে বিরত, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।" (সূরা আল মুমিনুন : ০১-০৫)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে মুমিন বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কয়েকটি গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো :

০১. বিনয়াবনত হয়ে সালাত আদায় করা।
০২. বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকা।
০৩. যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে তৎপর থাকা।
০৪. নৈতিক চরিত্রকে সংরক্ষণ করা।

বস্তুত এসব গুণের সমাবেশ যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে ঘটবে সেই হবে মুমিন আর এমন মুমিন ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজে কল্যাণ বিরাজমান থাকবে।

অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন :

طس - تلك ايت القران وكتاب مبين - هدى وبشرى للمؤمنين - الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقنون

"তা-সীন; এ আয়াতগুলো আল-কুরআনুল কারীমের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের। পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।" (সূরা আন-নামল : ০১-০৩)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন আল-কুরআনুল কারীম হিদায়াত দানকারী ও সুসংবাদ বহনকারী সেই ঈমানদার লোকদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাহলো পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তারা অবশ্যই অবশ্যই সালাত কায়েম করবে এবং

যাকাত দেবে। কেননা আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা বা পালনকর্তা হিসেবে মেনে নেয়া, কুরআনকে আল্লাহর কিতাবরূপে গ্রহণ করা এবং মুহাম্মাদ (সা.)কে আল্লাহ্ প্রেরিত সত্য নবী ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার বা আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার অনিবার্য প্রমাণ হচ্ছে নিয়মিত সালাত কায়েম করা ও হিসাবমত যাকাত আদায় করা। আর এ দু'টি শর্ত যারা জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে তারাই মূলত পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তকারী।

এভাবে মক্কাবাসীকে সালাত ও যাকাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে করতে রাসূল (সা.)-এর মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্ আরেকটি সূরা নাযিল করেন। এর নাম সূরা আল-আ'রাফ। এতেও আল্লাহ্ উল্লেখ করেন :

واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الاخرة انا هدنا اليك قال عذابى اصيب به من اشاء ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمنون

"আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া– তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৬)

যাকাত সংক্রান্ত আয়াতে মাক্কী জীবনের এ শেষ অংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাতের পূর্বে সালাতের কথা বাদ দিয়ে তাকওয়া অবলম্বনের কথা বলেছেন। মূলত: তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি বা আল্লাহর ভয়। এবার যাদের মনে আল্লাহর ভয় কাজ করবে তারা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া বিধান পরিপূর্ণভাবে জীবনে বাস্তবায়ন করবে অর্থাৎ সালাত, যাকাতসহ সকল প্রকার ভাল কাজ করবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ আল্লাহর ভয় যখন মনে আসবে তখন মানুষ ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় আল্লাহর সকল নির্দেশ মেনে চলবে। আর তাইতো তাকওয়া অবলম্বনের ইঙ্গিত এবং যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতগুলোতে কোথাও যাকাত দাও– এমন আদেশ প্রদান করা হয়নি। বস্তুত এ আয়াতগুলোতে মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর মধ্যে সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাসহ আল্লাহ ভীতি অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যা মূলত তৎকালীন দুনিয়ার প্রতি আসক্ত মানুষের মন-মগজ ও চিন্তার অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত

করা, তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করা, পবিত্র করা, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী করা এবং সবশেষে রাসূল (সা.)-এর অনুসারী হয়ে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতে আরো প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, এ দুনিয়ার বুকে সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, এতে কোন মানুষ বা সৃষ্টিই উপেক্ষিত ও তাদের হক থেকে বঞ্চিত হবে না।

মাদানী যুগে যাকাত প্রদানের তাকিদ ও বিধি-বিধান

প্রিয়নবী রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন তখন প্রথম বছরেই যে সূরাটি নাযিল হয়েছে তাঁর নাম সূরা আল-হাজ্জ। এ সূরার দু'টি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز - الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

"আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা তাঁকে সাহায্য করবে যদিও আল্লাহ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, সর্বজয়ী। সে সাহায্যকারী তারা, যাদের আমরা যদি দুনিয়ায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায়-বণ্টন করবে এবং ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অবশ্য সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই এখতিয়ারে।"

(সূরা আল-হাজ্জ : ৪০-৪১)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে দেশের সরকার প্রধান বা প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করেছেন তা হলো:

০১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবশ্যই সাহায্য করবেন যারা তাকে সাহায্য করে অর্থাৎ অবশ্যই সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ নিজে মেনে চলবে এবং অধীনস্থ সবাইকে মেনে চলতে দিক-নির্দেশনা দেবে। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যারা দুনিয়ার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের নির্দেশ দেন এই বলে–

০২. তারা সালাত কায়েম করবে।

০৩. যাকাত আদায়-বণ্টন করবে।

০৪. ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।

এভাবে মদীনাবাসীর মাঝে এ নির্দেশগুলো বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে জিহাদ করে হলেও এগুলো বাস্তবায়ন করে একটি আদর্শ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়ে একই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আবারও বলেন :

وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله

"এবং তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে (আল্লাহর ব্যাপারাদি নিয়ে) তাঁর জন্য জিহাদ যেভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় সেভাবে। তিনিই তোমাদের বাছাই করেছেন এবং দ্বীন পালনে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা, প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের নিয়ে আসা আল্লাহর আদর্শ ব্যবস্থা। তিনিই তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন– পূর্বেও এবং এই গ্রন্থেও, যাতে রাসূল তোমাদের পথপ্রদর্শক-সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা হতে পার জনগণের পথপ্রদর্শক-সাক্ষী। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও, আর আল্লাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)

এরপর মাদানী জীবনের দুই বছরের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল (সা.)-এর কাছে যে সূরাটি নাযিল করেন তাহলো সূরা আল-বাকারা। এ সূরাতেও যাকাতের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পাঁচটি স্থানে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين

"এবং সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও ও রুকূকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সাথে রুকূ কর।" (সূরা আল-বাকারা : ৪৩)

واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا .... واقيموا الصلوة واتوا الزكوة .....

"আর স্মরণ করুন, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে... আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।"

(সূরা আল-বাকারা : ৮৩)

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله

"সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা পরকালের জন্য ভাল যা কিছু পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা মজুদ পাবে। তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।" (সূরা আল-বাকারা : ১১০)

واقام الصلوة واتى الزكوة

"সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

ان الذين امنوا وعملوا الصالحت واقاموا الصلوة واتوا الزكوة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

"যারাই ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আর সালাত কায়েম করেছে, যাকাত দিয়েছে, তাঁদের জন্য তাদের শুভ কর্মফল রয়েছে আল্লাহর নিকট এবং তাদের কোন ভয় নেই, চিন্তারও কোন কারণ নেই।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৭)

তৃতীয় হিজরী সনের শুরুতে নাযিল হয়েছে সূরা আন-নিসা। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত প্রসঙ্গে বলেন :

الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلوة واتوا الزكوة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية

"হে নবী! আপনি কি লক্ষ্য করেননি সেই লোকদের ব্যাপার, যাদের প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে, আপাতত তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। পরে যখন তাদের উপর যুদ্ধ করাকে ফরয করে দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক মানুষকে ততটাই ভয় পেতে লাগল যতটা ভয় আল্লাহকে পাওয়া উচিত কিংবা তার চাইতেও অধিক কঠিন ও তীব্র।"

(সূরা আন-নিসা : ৭৭)

উল্লেখিত আয়াতের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদের উপর জিহাদ (যুদ্ধ) ফরয করার পূর্বে সালাত ও যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

কারণ মানুষের মধ্যে সালাত ও যাকাত তাদের ঈমানী শক্তি ও আর্থিক অভাব দূরীভূত করার মাধ্যমে তাদেরকে যে কোন শত্রুর মুকাবিলা করতে সাহস যোগাবে এবং এভাবে মুসলিমরা ভ্রাতৃত্ববোধে বলিয়ান হবে, এক আদর্শে সংগঠিত হবে।

এরপর অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة

ويؤتون الزكوة وهم راكعون

"তোমাদের একমাত্র বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক-অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা অবনত থাকতে অভ্যস্ত।" (সূরা আল-মায়িদা : ৫৫)

এ আয়াতে যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় তাদের অভয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, তোমাদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক-অভিভাবক স্বয়ং আমি আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও ঈমানদার লোকেরা। সুতরাং মুসলিমদের ভয়ের বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই নেই।

তারপর সূরা আত-তাওবায় আল্লাহ বলেন :

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم

واقعدوا لهم كل مرصد - فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة

فخلوا سبيلهم

"অত:পর মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও, তাদের পাকড়াও কর। তাদের পরিবেষ্টিত কর এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের পাকড়াও করার জন্য অবস্থান গ্রহণ কর। অত:পর তারা যদি তাওবা করে ও সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়ার নীতি মেনে চলে, তাহলে তাদের পথ মুক্ত করে দাও।"

(সূরা আত-তাওবা : ০৫)

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين

"ওরা যদি তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়ার নীতি গ্রহণ করে, তাহলে ওরা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, যারা তাওবা করে ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করে, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সালাত কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার কাজ শুরু করে তাদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ কর। এ

সালাত ও যাকাত দেয়ার উপরই ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সদস্য হওয়া নির্ভর করে।

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين

"আল্লাহর মসজিদসমূহ নির্মাণ ও আবাদ করতে পারে কেবল সেই লোক যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সালাত কায়েম করেছে ও যাকাত দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনি। খুবই সম্ভব যে, তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১৮)

يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله

"তারা ভাল কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজের নিষেধ করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদেরকেই রহমত দান করেন।" (সূরা আত-তাওবা : ৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনে নাযিলকৃত উল্লেখিত এ আয়াতগুলোর মধ্যে সূরা আল-বাকারার ৪৩ ও ৮৩ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একদম পরিষ্কারভাবে সরাসরি সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও বলে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশই যাকাতকে যারাই ইসলামী দ্বীনের তাওহীদী সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের উপর ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। এখানে যাকাত আদায় সংক্রান্ত দু'টি নির্দেশই বহুবচনের ফলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ দু'টি কাজই সামষ্টিকভাবে ও জামাআতবন্দী বা সংগঠিত হয়ে করতে হবে। আর এতেই সমাজের লোকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক উন্নয়ন হবে। মুসলিমরা হবে অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভ্রাতৃত্ববোধে সমুজ্জল।

যাকাত আদায় প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ
ইসলাম পূর্ব যুগে অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি

দরিদ্র ও বঞ্চিতদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার হুকুম শুধু যে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের প্রতিই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং

কুরআনুল কারীমের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ইসলাম পূর্ব যুগেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। আর এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামের কোন অধ্যায়েই কোন নবীর সময়ে কোন মুসলিমকেই নামায ও যাকাত হতে রেহাই দেয়া হয়নি।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশের নবীদের প্রসঙ্গে আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام

الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عبدين

"আমি তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমারই বিধান অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করে। আমার ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভালো কাজ করার, নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছি। তারা প্রকৃতরূপে আমার ইবাদাত করত।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩)

হযরত মূসা (আ.) তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! এই দুনিয়ায় তুমি আমাদের মঙ্গল দাও, পরকালেও কল্যাণ দান করো।' এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

عذابى اصيب به من اشاء ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها

للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمنون

"যাকে ইচ্ছা হবে, তাকে আমার আযাবে নিক্ষেপ করবো। যদিও আমার রহমত সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো যারা আমাকে ভয় করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর যারা আমার বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৬)

হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وكان يامر اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا

"তিনি তার লোকদেরকে নামায এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।" (সূরা মারইয়াম : ৫৫)

বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহ পাক যেসব বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন তার ভেতর যাকাত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও ছিল। আল-কুরআনের ভাষায় :

واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسانا ... واقيموا الصلوة واتوا الزكوة ......

"আর স্মরণ করুন, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে... আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।"

(সূরা আল-বাকারা : ৮৩)

অপর এক সূরায় বলা হয়েছে :

ولقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا - وقال الله انى معكم - لئن اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة وامنتم برسلى وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا - لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنت تجرى من تحتها الانهر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل -

"আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের ভেতর থেকে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলেন আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর ও ওদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এর পর কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে সে সরল পথ হারাবে।" (সূরা আল-মায়িদা : ১২)

রাসূলে কারীমের (সা.) পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)ই সর্বশেষ নবী ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন–

واوصنى بالصلوة والزكوة ما دمت حيا

"তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।" (সূরা মারইয়াম : ৩১)

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও এ নবীর উম্মাতের প্রতি

মুসলিমরা কাফির-মুশরিকদের অন্যায়-অত্যাচারে ও নিষ্ঠুর নির্যাতন- নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে মদীনায় হিজরাত করলেন। শেষের দিকে হিজরাত করলেন

হযরত আবু বকর (রা.)সহ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হিজরাতের পরবর্তী বছরে অর্থাৎ হিজরাতের দ্বিতীয় বছরেই যাকাত ফরযরূপে ঘোষিত হল। সূরা আল-বাকারায় বলা হল :

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" (সূরা আল-বাকারা : ১১০)

হিজরী নবম সনে নাযিল হয় সূরা আত্-তাওবা। সূরার শুরুতে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে তাদের জন্য চার মাস সময়ের অবকাশ দিয়েছেন। এই সময়সীমার মধ্যে তারা দুনিয়ার সর্বত্র পরিভ্রমণপূর্বক নিজেদের জন্য সুচিন্তিত পন্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদের যেখানে পাবে হত্যা করতে, বন্দী করতে, অবরোধ করতে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় থাকতে বলা হল। সেই সঙ্গে এও বলা হল যে :

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم

"যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে।" (সূরা আত-তাওবা : ০৫)

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা ও তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য তিনটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, শিরক ও কুফর থেকে তাওবা করা, আর তার প্রমাণ হবে কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-র সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় নামায আদায় যা প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করতে হয়। কেননা হাদীসের ভাষায় নামাযই হল একজন মুমিন মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে প্রধান পার্থক্যকারী। তদুপরি মুসলিমদের পারস্পরিক, আত্মিক, সামাজিক ও দ্বীনী যোগসূত্র রক্ষার মাধ্যম এবং তৃতীয়ত, নিয়মিত যাকাত আদায় যা ধনীদের উপর তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও দুঃখী সাধারণের কল্যাণের জন্য ফরয করা হয়েছে। এই যাকাত মুসলিম জনগণের পারস্পরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কসূত্র রক্ষার আরেকটি মাধ্যম। পুনরায় ঘোষিত হয়েছে :

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين

"অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই।" (সূরা আত-তাওবা : ১১)

উল্লেখ্য যে, কুরআনুল কারীমের সর্বত্রই নামাযের পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে; আর এ থেকেই উভয় ইবাদাতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি থেকে তা আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে।

امرتم باقامة الصلوة وايتاء الزكوة ومن لم يزك فلا صلوة له

"তোমাদের সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যাকাত না দিলে তার সালাতও হবে না।"

(তাফসীরে তাবারী ১৪ : ১৫৩ পৃ.)

ইবনে যায়েদ বলেন :

افترضت الصلوة والزكوة جميعا لم يفرق بينهما

নামায ও যাকাত একত্রে ফরয করা হয়েছে এবং এ দু'য়ের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

এরপর তিনি সূরা আত-তাওবার ১১তম আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন : যাকাত ব্যতিরেকে কেবল নামায গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন : আল্লাহ তায়ালা আবু বাকর (রা.)কে রহম করুন তিনি। ছিলেন খ্যাতিমান ফিকাহবিদ। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন আল্লাহ যে দু'টো জিনিসকে একত্র করেছেন আমি সে দু'টোকে কখনই বিচ্ছিন্ন করব না।

সূরা আত্-তাওবাতেই মসজিদ আবাদকারী ও প্রতিষ্ঠাকারীদের সিফাত বয়ান করতে গিয়ে যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে তার ভেতর যাকাত প্রদান অন্যতম।

انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين

"তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না; ওদেরই হিদায়াত প্রাপ্তির আশা আছে।"

(সূরা আত-তাওবা : ১৮)

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আর নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু আগেভাগে পাঠাবে (করবে) তা আল্লাহর নিকট পাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ-কর্ম দেখছেন।" (সূরা আল-বাকারা : ১১০)

সূরা আত-তাওবার ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

"আপনি তাদের মাল হতে যাকাত আদায় করুন, যা দ্বারা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবেন।" (সূরা আত- তাওবা : ১০৩)

সূরা আল-আনআমের ১৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده

"এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং অধিকার আদায় কর– এগুলো কর্তনের সময়ে।" (সূরা আল-আনআম : ১৪১)

হাদীসে জিবরীলে বলা হয়েছে যে, "একবার ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের বেশে রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, ইসলাম কি? উত্তরে তিনি জানালেন ঃ ইসলাম এই যে, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করবেন এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করবেন না। বিধিবদ্ধ নামায কায়েম করবেন ও বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করবেন.........।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমার সাক্ষ্যসহ। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলে তাদের উপর নামায ফরয করা হয়। তারা তাও পালন করতে থাকলে তাদের উপর সাওম (রোযা) ফরয করা হল। তারা যখন একেও সত্যরূপে মেনে নিল তখন তাদের উপর যাকাত ফরয করা হল। তা মেনে নেওয়ার পর হজ্জ ফরয করা হল। এরপর ফরয করা হয় জিহাদ। অতঃপর তাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت

لكم الاسلام دينا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ০৩)

যথার্থভাবে যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত না দেয়া বা যথার্থভাবে নিজে আদায় না করা এবং অন্যকেও আদায়ে উৎসাহিত না করা মানে আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ লংঘন। এখানেই শেষ নয়, যাকাত ফরয হওয়ার মত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যারা যথার্থভাবে হিসাব কষে যাকাত আদায় করে না তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও মানুষের হক হরণকারী। আর তাই তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন :

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما
اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا

"প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৪৯)

اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل
فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا

"তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে– তখন তারা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে– তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।"

(আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৯৮)

انفحی أو انضحی أو أنفقی ولا تحصی فیحصی الله علیك ولا
توعی فیوعی الله علیك

"(আল্লাহর পথে) খরচ করো আর কত খরচ করলে তার হিসাব রেখো না। আর যদি তাই কর তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের গুণে গুণে দিবেন। আর জমা করে রেখো না তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন (অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে দিবেন না)।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং ২২৪৬)

এরপরও যারা যাকাত আদায় করে না তা সম্ভব একমাত্র–

০১. নির্বোধ লোকদের পক্ষে;

০২. অজ্ঞ পশুতুল্য মূর্খ লোকদের পক্ষে;

০৩. যারা সরাসরি আল্লাহকে স্রষ্টা, রাসূল (সা.)কে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেয় না এমন মুশরিকদের পক্ষে;

০৪. দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আখিরাত সম্পর্কে গাফেল লোকদের পক্ষে;

০৫. যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধী কাজ করায় তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে লা'নত নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে এবং

০৬. যারা বিবেক বর্জিত, আদর্শহীন, মানবতাহীন, মমত্বটুকু যাদের সম্পদের পাহাড়ে ঘিরে আছে, ভালবাসা, আদর-স্নেহ যাদের মন থেকে সরে গেছে এমন সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন অন্যের হক হরণকারী ব্যক্তিদের পক্ষেই যাকাত না দেয়া সম্ভব হতে পারে। তবে কি তারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে আল্লাহর দুনিয়াতে অবস্থান গ্রহণ করে দম্ভ ভরে চলবে! না তাতো হতেই পারে না। যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নেই তারা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আছে ও থাকবে, শুধু তাদের জ্ঞান চক্ষু নেই বলে তারা তা বুঝতে পারে না। তাদের জন্য ইহকালে অশান্তি ও পরকালে শাস্তি নিশ্চিত।

ইহকালীন অশান্তি

প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যারা যাকাত যথার্থভাবে আদায় করে না, তাদের উপর এ জগতেই শাস্তি স্বরূপ অশান্তি চাপিয়ে দেয়া হয়। আজকের সমাজে কতিপয় সম্পদশালী লোক আছে যারা ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ্জ বার বার বহুবার করে থাকে, উমরা পালন করে থাকে। যদিও ইসলামের এ রুকন সম্পর্কে বলা হয়েছে, দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। তথাপিও এক শ্রেণীর লোক বার বার হজ্জ করে, শুধু মজাই পায়, আনন্দ লাগে, শান্তি পায় এ কথা বলে তারা বার বার হজ্জ করে। হ্যাঁ, যারা পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পদও আছে তারা বার বার হজ্জে যাওয়া দোষের নয় বরং সাওয়াবের কিন্তু যারা বার বার হজ্জ করে অথচ বছর শেষে হিসাব করে সঠিকভাবে যাকাতের অর্থ হকদারদের হাতে তুলে দেয় না তাদের হজ্জ তো কবুল হওয়ার কোন সুযোগই নেই। প্রকৃতপক্ষে তারাই হজ্জে বার বার গিয়ে মজা পায়, আনন্দ পায় কিন্তু শান্তি পাওয়ার কথা তাদের মুখ থেকে শুনা যায় না, কারণ শান্তি দেবার মালিক তো স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

যারা আল্লাহর বিধানে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করল না আল্লাহ তো তাদের শাস্তি দিতেই পারেন না বা আল্লাহ মহান এ হিসেবে দিলেও তা হবে পরীক্ষামূলক, সাময়িক। যদি তারা দ্বীনে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যায় তাওবা করে তো আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন।

অন্যদিকে যারা সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত যথার্থভাবে আদায় করে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো ইহজগতে তাদের শাস্তি দিতেই পারেন না। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করায় তৎকালীন অন্যতম সম্পদশালী কারুনের শেষ পরিণতি তো আমাদের সকলেরই জানা।

আল-কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিতে যাকাত না দিয়ে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, আদর্শবান, সত্যবাদী ও নেককার লোকদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। তা হতে হলে অবশ্যই রীতিমত যাকাত দিতে হবে।

০১. ইহকালে রহমত থেকে বঞ্চিত ঃ যাকাত না দিয়ে মানুষ আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না। কেননা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের জন্যে রহমত লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمنون

"আমার রহমত সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছে। তা আমি লিখে দেব সেই লোকদের জন্যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৬)

০২. আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা হারানো ঃ যাকাত যারা যথাযথ হিসেব করে দেবে না তারা আল্লাহর বন্ধুত্ব, রাসূলের এবং মুমিনদের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ নিজেই বলেছেন :

انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم ركعون - ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغلبون

"তোমাদের একমাত্র বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই অনুগত। আর আল্লাহ,

তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের যারাই অভিভাবক বানাবে, (তারাই আল্লাহর দলভুক্ত) শেষ পর্যন্ত তারাই (আল্লাহর দলই) বিজয়ী হবে।"

(সূরা আল-মায়িদা : ৫৫–৫৬)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عن عبدة وقال لا تحصى فيحصى الله عليك

"হযরত আবদা ইবনে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা (রা.)কে বলেছেন : (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৪১)

০৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বঞ্চিত ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা– যারাই আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করবেন। কিন্তু এই সাহায্য সেই লোক কখনই পাবে না যে যাকাত দেবে না। ইরশাদ হয়েছে :

ولينصرن الله من ينصره - ان الله لقوى عزيز - الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر - ولله عاقبة الامور

"যে লোক আল্লাহকে সাহায্য করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহ শক্তিসম্পন্ন, সর্বজয়ী। তারা সেই লোক, যাদের আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। আর সর্ব কাজের পরিণতি আল্লাহর এখতিয়ারেই।" (সূরা আল-হাজ্জ ৪০–৪১)

০৪. শাস্তির পথ সুগম করে দেয়া ঃ এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর উম্মাতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা :

قول الله عز و جل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মানে, অচিরেই আমি তার জন্য (শান্তির) সহজ পথকে আরো সহজ করে দেব।

কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে অসত্য আরোপ করে, সত্ত্বরই আমি তার জন্য (শাস্তির) পথকে সুগম করে দেব।"

(সূরা আল-লাইল: ৫-১০)

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৪৯)

আজ তাইতো আমরা দেখি দুনিয়ার যিন্দেগীতে কেউ কেউ মনে করছে শান্তিতে আছে কিন্তু আসলে অশান্তি তাদের এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে তাদের দ্বীনের ভেতরে থাকার যে শান্তি সে শান্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে শত শত অশান্তির মধ্যেও তারা বলে শান্তিতেই তো আছি।

আজকাল কোন কোন সম্পদশালী বা ধনীর এপার্টমেন্টগুলোতে যা ঘটছে, স্ত্রী স্বামীর অনুগত নয়, সন্তান মা-বাবাকে মা-বাবা বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ, আদর্শ শিক্ষা অর্জন করেনি, নামায আদায় করে না, সিয়াম পালন করে না, নানা ধরনের কোষ্ঠ-কাঠিন্য, জটিল রোগ, প্রতিদিন ঔষধ খেতে খেতে দূরবস্থা, বুকে ক্যান্সার, মাথায় ক্যান্সার, পুরো শরীরে ক্যান্সার, রক্ত নষ্ট, হাটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, আত্মার পরিশুদ্ধতার অভাবে এমন অবস্থা, রোগটা যে কী তা অনেকের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চেষ্টা শেষ হওয়া সত্ত্বেও ধরা পড়ছে না। এভাবে বিছানায় গড়াগড়ি, হাসপাতাল আর ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি তারপরও যদি বলে ভাল আছি তাহলে পাঠক মহলের কি বুঝতে বাকী থাকে কেমন ভাল আছে তারা? তারপর এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে জানাযার নামাযে লোকজন নেই, শুধু আল্লাহ কর্তৃক দেয়া আদেশের কারণে এক শ্রেণীর লোকজন এসে মাটির নীচে খাদিয়ে দেয় তারপরও যদি তাদের পরবর্তী বংশধরেরা বলে ভালোই আছি তাহলে কি একথা বললে ভুল হবে যে তারা আসলেই মূর্খ? তাদের চোখ থাকতেও তারা অন্ধ, কান থাকতেও তারা বধির, মুখ থাকতেও তারা বোবা।

যাহোক এ আলোচনায় যে বিষয়টি পরিষ্কার তাহলো যাকাত যারা আদায় করে না দুনিয়ার যিন্দেগীতেই তাদের শাস্তি স্বরূপ অশান্তির তুষের আগুন তাদের

মাঝে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর যারা যথার্থভাবে দেয় তারা তো আল্লাহরই ভাষায় সার্থক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

قد افلح المؤمنون ..... والذين هم للزكوة فعلون

"অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে মুমিনরা.........। যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়।"

(সূরা আল-মুমিনুন : ০১-০৪)

পরকালীন শাস্তি

যাকাত না দেয়ার পরকালীন শাস্তি যে কতো ভয়ঙ্কর এবং কষ্টদায়ক তা নিম্নের আলোচনায় স্পষ্ট :

০১. ধন-সম্পদকে আগুনে উত্তপ্ত করে সেঁকা দেয়া : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না (যাকাত আদায় করে না) তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সে দিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এই হচ্ছে তা-ই যা তোমরা জমা করতে নিজেদের জন্য। অতএব এখন জমা রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।"

(সূরা আত-তাওবা : ৩৪-৩৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার কথা বলেছেন তার অর্থ শুধু এই তিন অঙ্গই নয় সমস্ত শরীরও হতে পারে। তবে এ তিন অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, মিসকীন বা দরিদ্ররা কিছু চায়, যাকাত চায় তখন সে প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তারপর পাশ কাটিয়ে না শুনার ভান করে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষ্যান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গ দগ্ধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

০২. বিষধর সাপ রূপে ধন-সম্পদের দংশন : মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان طوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে যদি ঐ সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার ধন-সম্পদ এমন এক ভয়ংকর বিষধর সর্পের রূপ ধারন করবে যার মাথায় থাকবে দু'টি কালো বর্ণের চিহ্ন। কিয়ামাতের দিন ঐ সাপ তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ তার দুই চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে– আমি তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত বিত্ত।" (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩১২)

তারপর নবী কারীম (সা.) এ আয়াত পাঠ করেন :

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ولله ميراث السموت والارض والله بما تعملون خبير

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। বস্তুত: এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামাতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৮০)

০৩. কিয়ামাতের দিন গরু ও উটের পদ-দলন ও শিং দিয়ে গুঁতো মারা : রাসূল (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون الا من قال هكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذى نفسى بيده لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تطؤه

باخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت اخراها عادت عليه

اولاها حتى يقضى بين الناس

"অধিক সম্পদ কুক্ষিগতকারীগণ, কিন্তু যারা এই, এই ও এই পরিমাণ দিয়েছে তারা ব্যতীত। তিনি সামনে, ডানে ও বাঁয়ে হাতের ইশারা করলেন। অত:পর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি এমন উট অথবা গরু রেখে মারা গেল যার যাকাত সে আদায় করেনি, কিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বাবস্থার চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে তার কাছে আসবে এবং নিজেদের পায়ের ক্ষুর দিয়ে তাকে পিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো মারবে। সর্বশেষ জন্তুটি চলে যাওয়ার পর পুনরায় প্রথম জন্তুটি আসবে। মানুষের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির এ ধারা অব্যাহত থাকবে।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৫৭৪)

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হলো, যাকাত ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক বিধান ও দ্বীনের একটি মৌলিক স্তম্ভ। যাকাত দেয়া দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং দরিদ্রের হক, আর আদায় করা ধনীদের অবশ্য কর্তব্য। তাই অন্যান্য ইবাদাতের মত যাকাত দেয়া-নেয়াও দু'পক্ষই খালেস নিয়াতে করা উচিত। যাকাত দিতে পারা তাই কোন অহংকারের বিষয় নয়।

আজকাল এক শ্রেণীর ধনী-সম্পদশালী তাদের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে তাদের (যাকাত) হক তো পুরোপুরি হিসাব করে দেয়ই না বরং যা কিছুই দেয় তা আবার অন্য আত্মীয়দের বলে বেড়ায়– আমি তাদেরকে দেই, এটা দেই ওটা দেই ইত্যাদি। যা শুনে ঐ ব্যক্তি বা পরিবার লজ্জিত হয়, কষ্ট পায়। অথচ হিসেব করে দিলে সে আরো বেশি পাওয়ার কথা। তাছাড়া বলে বেড়ানো বা অহংকার করার তো কিছুই নেই এটাতো তাদের অধিকার আর আপনাকে পরীক্ষা করার মাধ্যম।

যাকাত মানুষের পরীক্ষার মাধ্যম ঃ কে ঈমানদার, কে মুশরিক

আজকাল এক শ্রেণীর মানুষ সালাত আদায় করে, রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করে; হজ্জও করে কিন্তু হিসেবমত যাকাত আদায় করে না। টাকা জমায়, টাকা বাড়াতে চায়, অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতে চায়। কিন্তু যেই যাকাতের কথা বলা হয় তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়। অপবাদ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। আর বলে এ বয়সে এত ইসলাম-ইসলাম বলার দরকার কী! সম্পদ অর্জন যে কত কষ্ট তা সে বুঝবে কী!

আমরা কম খরচ করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করেছি যে অর্থ তা কি মানুষকে দেয়ার জন্য। আমাদের চেয়ে আরও কত বেশি সম্পদশালী আছে তারা দেবে ইত্যাদি। যা মূলত: যাকাতের বিধান মেনে না নেয়া এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করারই শামিল। আর তাই এমন মুসলিম প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

.... افتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيمة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

"...... তবে কি তোমরা ঈমান আন কিতাবের কিছু অংশে এবং কুফরী কর কিছু অংশের সাথে? অতএব তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে, তাদের শাস্তি তো দুনিয়ার যিন্দেগীতে অপমান এবং কিয়ামাতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবে। আর আল্লাহ গাফিল নন, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে।"

(সূরা আল-বাকারা : ৮৫)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত ও পঞ্চম স্তম্ভ সিয়াম যেমন ঈমানদারদের উপর ফরয, তেমনি তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতও ফরয। মূলত যাকাত ইসলামের একটি বড় স্তম্ভ। একে বড় স্তম্ভ এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে কুরবানী ও আত্মত্যাগের শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা ও সম্পদ পূজার দোষসমূহ দূর হয়ে যায়। সম্পদের পূজারী বা অর্থের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি ইসলামের কোন কাজে আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে নিজের কায়িক পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পদ কোন স্বার্থের তাকিদ ছাড়াই কুরবান দিতে পারে সেই হতে পারে ঈমানদার হিসেবে গণ্য। যাকাত মুসলিমদেরকে এ কুরবানী দিতে অভ্যস্ত করে তোলে এবং তাদেরকে এমন যোগ্যতা দান করে যে, যখনই আল্লাহর পথে তাকে সম্পদ ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয় তখন সে আপন সম্পদকে বুকে আঁকড়ে বসে থাকে না, বরং অন্তর খুলে দিয়ে ব্যয় করে থাকে।

যাকাত দান বা অনুকম্পা নয়; যাকাত অধিকার

ইসলাম প্রথম থেকেই মুসলিমদেরকে দান-খয়রাতে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। গরীব ও অসহায় লোকদের, পিতৃহীন অনাথ শিশু ও বিধবাদের প্রতি দানের হাত প্রসারিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে, বুভুক্ষ লোকদের খাদ্যদানে এবং বস্ত্রহীনকে পরিধেয় বস্ত্রদানে উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশাপাশি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও

যারা তা না করবে, শুধু নিজেরা ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়বে তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

অতঃপর ইসলাম দান-খয়রাতের প্রতি ধনীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেই থেমে থাকেনি বরং দান-সাদাকাকে অভাবী ও শোষিত-বঞ্চিতদের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং এই অধিকার প্রদানের জন্য মুসলিমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায় :

وات ذالقربى حقه والمسكين وابن السبيل

"আর দাও নিকটাত্মীয় মিসকীন ও মুসাফিরকে তাদের হক (অধিকার)।"
(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

فات ذا لقربى حقه والمسكين وابن السبيل - ذلك خير للذين

يريدون وجه الله

"অতএব আত্মীয়কে দাও তাদের প্রাপ্য (হক) এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও; যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয়।" (সূরা আর-রূম : ৩৮)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে 'হক' তথা অধিকার শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলোচ্য শব্দের ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ পাক মুসলিমের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, দান-খয়রাত ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং দান-সাদাকা দ্বারা আমরা নিকটাত্মীয় ও গরীবদের অনুগৃহীত করছি না বরং এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। অতএব আমার ইচ্ছা হলে দেব, নইলে দেব না– এটা তেমন নয়।

তাছাড়া মানুষ যে সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করে সে তার প্রকৃত মালিক নয়, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আমানতদার মাত্র। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। সুতরাং একজন আমানতদার হিসাবে মানুষ প্রকৃত মালিকের নির্দেশনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদ আয়-উপার্জন ও ব্যয়-বিনিয়োগ করবে এটাই বিবেকের দাবী।

মানুষের জীবন-জীবিকার মানগত তারতম্যের বিষয়টি ইসলাম স্বীকার করে। মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার পার্থক্য মহান আল্লাহর অমোঘ বিধানেরই অংশ। তাই বলে মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল তারতম্য হবে এটি কাঙ্ক্ষিত নয়। দরিদ্র তার শ্রম বিনিয়োগ করে আর ধনী বিনিয়োগ করে তার পুঁজি তথা মূলধন। দরিদ্র তার শ্রমের বিনিময়ে পায় পারিশ্রমিক, পক্ষান্তরে ধনী তার পুঁজির বিনিময়ে অর্জন করে প্রচুর মুনাফা। ধনীর উপার্জন দরিদ্রের শ্রম থেকে আসে বিধায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধনীর পুঁজি এবং দরিদ্রের শ্রম একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ধনীর সম্পদ

দরিদ্রের শ্রম হতে আসে বিধায় ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আর শরীয়াত সম্মত অধিকার হল যাকাত। এজন্য ইসলামে যাকাতকে বলা হয় قنطرة الاسلام –ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনাকারী এবং সমাজ দেহের রোগ নিরাময়ের অন্যতম প্রতিষেধক।

সূরা আল-আনআমের একটি আয়াতের দিকে নজর বুলালে আমরা দেখতে পাই :

وهو الذى انشأ جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه - كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যয়তূন ও দাড়িও সৃষ্টি করেছেন– এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার 'দেয়' (হক বা অধিকার) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনআম : ১৪১)

আলোচ্য আয়াতে জমি যে ফল ও ফসল ফলায় তাতে দেয় 'হক' তথা অধিকার রয়েছে বলে আল্লাহ জানিয়েছেন এবং ফল-ফসল পাড়া বা কাটার দিনই তা আদায় করে দিতে হবে বলে আল্লাহ জানান।

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন :

"এই নির্দেশ ছিল যাকাতের হুকুম নাযিল হবার আগের। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন তার ক্ষেতের ফসল থেকে দান করত, পশুরা বিচরণ করত। পিতৃহীন ফকীর-মিসকীন ও অক্ষম লোকেরা তা থেকে অংশ পেত।"

শরীয়াতের পরিভাষায় একেই 'উশর' বলা হয়। ইসলামের প্রথম দিকে এর কোন হার বা পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। ফল-ফসলের মালিকের ইচ্ছা বা মর্জির উপর তা নির্ভর করত। পরবর্তীকালে আল্লাহর রাসূল (সা.) দেয় হক-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন এবং মদীনা শরীফে এর বাস্তবায়ন ঘটে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে উশর বা অর্ধেক উশর ফরয ঘোষিত হয় পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ শস্য বা ফলমূল থেকে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদাতসমূহের মধ্যে যাকাত অন্যতম। সুতরাং নিয়মিতভাবে এটি আদায় করা সম্পদশালী ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। আর তাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাতের প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানে তুলে ধরছি।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ– যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ জাতীয়করণ। অর্থাৎ এর মূল কথা হলো জনগণ কাজ করবে, উপার্জন করবে, কষ্ট করবে, সব কিছুর মালিকানা সরকারের হাতে থাকবে। সরকার তাদের যা প্রয়োজন তা তাদেরকে দেবে। ফলে অল্প কয়েক বছরেই এ অর্থব্যবস্থা তাদের জন্মস্থানেই আত্মহত্যা করেছে।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পর বিশ্বে যে অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থারও অন্যগুলোর মত একটি ভিত্তি রয়েছে, তা হলো যাকাত। অর্থাৎ যাকাত একদিকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যা ব্যতিরেকে কেউ ইসলামী যিন্দেগী গড়তে সক্ষম নয়; অন্যদিকে এটি ইসলামী অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ, যার উপর ভিত্তি করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে উঠে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ মানুষের অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। অন্যদিকে সম্পদের ব্যাপক ব্যয়-ব্যবহার ও বিনিয়োগই হচ্ছে তার জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ সম্পদ তথা মূলধন বিনিয়োগ না করলে এটি যেমন করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে না, তেমনি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় এ যাকাতের ফলে এক সময় মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাত মূলধনকে দ্রবীভূত, সচল-সক্রিয় ও মুনাফা আহরণে গতিশীল করে। আর এভাবে মূলধনের চিরন্তন আবর্তন মানবদেহে রক্তের অব্যাহত চলাচলের ন্যায় সমাজদেহে সুস্থতা ও অর্থনীতিতে সচ্ছলতা আনয়ন করে।

আমরা সকলেই জানি– সঞ্চিত অর্থ বা মূলধনের মুনাফা লাভের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা কার্যকর হয় কেবলমাত্র বিনিয়োগের মাধ্যমে। আর বিনিয়োগের ব্যাপকতা সমাজ থেকে দূর করে বেকারত্ব, অস্থিরতা, কর্মহীনতা। এভাবেই আসে সমাজ ও পরিবার অঙ্গনে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা আর সর্বোপরি সমাজ মুক্ত হয় অলস মস্তিষ্ক শয়তানের ফন্দি আটা কুচিন্তা চেতনার কুফল থেকে।

অবশ্য বিনিয়োগে ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। তবে মানুষ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে রাসূল (সা.) সমর্থিত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে এতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে এবং

এ বিশ্বাসই মনে বদ্ধমূল করে একজন খাঁটি মুমিন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকে। আর তাই মূলধন পর্যায়ে ইসলামের এ দৃষ্টিকোণ ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের থেকেই স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। কেননা পুঁজিবাদে ব্যক্তিগত পুঁজির প্রাধান্য আর সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সর্বগ্রাসিতা আধুনিক এ বিশ্বে সকলেরই জানা।

এ পর্যায়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখার বিপরীতে বিনিয়োগে উৎসাহী করার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله
فبشرهم بعذاب اليم

"আর যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য (নগদ অর্থ) পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় ও বিনিয়োগ করে না, তাদের মহাপীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

"যেন তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান সম্পদ কেবল তাদের মাঝেই আবর্তিত সম্পদে পরিণত না হয়।" (সূরা আল-হাশর : ০৭)

তবে একটি কথা সত্য, যাকাতের গুরুত্ব ইসলাম প্রিয় জনগণ অনুধাবন করতে না পারায় বর্তমান সমাজের মুসলিম জনগণ এর প্রতি উপেক্ষা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করছে। আবার যারা যাকাতকে মেনে নিয়েছে তারাও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে বিনা হিসাবেই বাজারের সবচেয়ে কম দামী কয়েক পিস শাড়ী-লুঙ্গি বিলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। আর এসব দেখে এক শ্রেণীর লোক একে মধ্যযুগীয় খয়রাতী ব্যবস্থা বলে ঘৃণা পোষণ করছে। আবার কেউ কেউ যাকাত দানের লক্ষ্যে মাইকিং করে ডেকে এনে অনেককে ফিরিয়ে দিচ্ছে, কেউবা লাশ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, কেউবা আহত হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে– এ অবস্থা দেখে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মিডিয়া যাকাতকে মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির উপকরণ মনে না করে মানুষ মারার ফাঁদ হিসেবে উল্লেখ করছে। তাই আধুনিক বস্তুবাদী অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাতকে মূল্যায়ন করতে নারাজ।

অন্যদিকে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। ফলে এর বাস্তবরূপ ও ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা লাভ করাও সম্ভব হয়নি। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও যাকাত ভিত্তিক একটি কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই; বরং যা তারা মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছে তা ভয়ঙ্কর। সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের কতিপয় সম্পদশালী

ব্যক্তি যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টনকে নিয়েছে বিলাসিতা হিসেবে, সুনাম-সুখ্যাতি, সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে। তবে আশার কথা হচ্ছে, যাকাত দেয়া যে দান বা দয়া নয়; এটা আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি যে ভুল এবং এক উন্নত, নির্ভুল ও সুষ্ঠু পন্থায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাত আদায় ও বন্টন করাই যে ইসলামের নির্দেশ এসব কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই লোকদের বর্তমান ধারণা বা বিলি-বন্টনের অবস্থার পরিবর্তন হবে।

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গভাবে মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও গ্যারান্টি দিয়েছে। তাই ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারী ও মজুদদারীর মাধ্যমে উপার্জন এবং মানবতা বিধ্বংসী নীতি সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে ইসলাম কখনো প্রশ্রয় দেয়নি বরং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم

"আল্লাহ সুদকে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করে দেন; সাদাকায় ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ (সুদখোর) পাপী লোকদের মাত্রই পছন্দ করেন না।"

(সূরা আল-বাকারা : ২৭৬)

যাকাত অমান্যকারী কাফির

ইসলামী শরীয়াতে যাকাত ফরয এবং এটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অস্বীকারকারী, অমান্যকারীদের ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ ও সকল ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তারা নিশ্চিতভাবে কাফির। আর যারা যাকাত আদায় করে না তারা ফাসিক।

যাকাত অস্বীকারকারী ইসলাম থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক থেকে তীর নির্গত হয়ে যায়। যদিও লোকটি মুসলিম নামধারী, মুসলিম সমাজেই তার বসবাস, তারপরও যাকাত অস্বীকার করার কারণে সে নির্ঘাত কাফির বলে গণ্য হবে। তার উপর মুরতাদ হবার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তাওবা করতে বলা হবে তাওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা, যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত; তা দ্বীন ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কাজেই একে অস্বীকার করা হলে আল্লাহকেই অস্বীকার করা হয়, রাসূল (সা.)কেও অমান্য করা হয়। অতএব তাদের কাফির হবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না। ইবনে কুদামা ফকীহর এই মত। অধিকন্তু যারা যাকাতকে উপেক্ষা ও অবহেলার চোখে দেখে এবং বলে যে, তা এ যুগের জন্য উপযুক্ত নয়, এটা ইসলামের নামে বেশি বাড়াবাড়ি, টাকা-পয়সা উপার্জন করা বহু কষ্টের, গরিবরা কাজ করতে পারে না? তাদের যাকাত দেব কেন? তারা মুসলিম সন্তান এবং মুসলিম পিতা-মাতার

কোলে লালিত-পালিত হলেও তাদের একথা ও কাজ সুস্পষ্ট মুরতাদ হবার কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য, আজ মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম নেই। যার কারণে ঐ সমস্ত সম্পদশালীরা পার পেয়ে যাচ্ছে, যাকাত আদায় না করেও তারা দম্ভ ভরে যাকাতের বিপক্ষে কথা বলার মত দুঃসাহস দেখাচ্ছে। যাহোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের হেদায়াত দান করুন আর তাদের বুঝার শক্তি দান করুন যে এটি অবশ্যই আদায় করতে হবে, আর তাহলেই হওয়া যাবে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম। আল্লাহ বলেন :

الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كفرون

"যারা যাকাত দেয় না তারা হলো সেসব লোক যারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ০৭)

এরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين ونفصل الايت لقوم يعلمون

"তবে তারা যদি (কুফর ও শিরক থেকে) তাওবা করে (ফিরে আসে) এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১১)

এ আয়াতে যাকাত প্রদান করাকে ইসলামে প্রবেশ করার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابى هريرة قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصمة منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابى بكر فعرفت انه الحق

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর এবং আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হয়ে গেল, তখন (আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমর (রা.) বলেন, আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (যারা কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে), অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবি আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর ওপর। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (অর্থাৎ আবু বকরের অভিমত) সঠিক।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবীগণের যুদ্ধ

মুসলিম উম্মাহর সম্পদশালী লোকদের জন্যে যাকাত আদায় যে ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কাজ এবং তা এক কথায় ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত আট শ্রেণীর মানুষের হক তা কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি। অতএব ইসলামী শরীয়াহ'র দৃষ্টিতে ফরযকে অস্বীকারকারী হল কাফির বা মুরতাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকদের কাজ বলে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ঘোষণা হয়েছে:

... وويل للمشركين - الذين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كفرون

"....... ধ্বংস অনিবার্য, ঐ সকল মুশরিকদের জন্যে যারা যাকাত আদায় করে না।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ০৬-০৭)

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর কিছু লোক সালাত ও সিয়াম আদায় করা সত্ত্বেও কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করে। ইসলামের ভিত যা তৃতীয় রুকন এ যাকাত যথার্থভাবে আদায় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তাদের

বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকর (রা.) যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন,

"আল্লাহর কসম! যারা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দিতো তারা যদি আজ ছাগলের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

সে সময়ে হযরত উমার (রা.) সহ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রশ্ন করেন, যারা তাওহীদ, রিসালাতে বিশ্বাসী, সালাতও আদায় করে, শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করাতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হবে কেন? তারপর হযরত আবু বাকর (রা.)-এর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও দৃঢ়তার কারণে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে ইয়ামামার যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। সুতরাং কালেমায় অন্তর্ভুক্তির পরে অর্থাৎ মুসলিম হওয়ার পরও কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে ইসলামী সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা করা যে অপরিহার্য সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো, যাকাত সম্পদশালীদের সম্পদে দরিদ্র্যদের অধিকার। আর অধিকার আদায়ের জন্যে চূড়ান্ত চেষ্টা হিসেবে যুদ্ধ অপরিহার্য।

হযরত আবু বাকর (রা.)-এর যুক্তি

রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামের প্রথম খলীফা হলেন হযরত আবু বাকর (রা.)। সে সময়ে কয়েকটি গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বাকর (রা.)-এর মত হলো যাকাত হচ্ছে ধন-মালের হক। ধন-মালকে পবিত্র করার জন্য তা আদায় করতে হবে। অন্যদিকে যাকাতকে সালাতের মতই মনে করতে হবে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহয় সর্বত্র সালাত ও যাকাত এ দু'টি এক সঙ্গে ও পাশাপাশি উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.) যে যুক্তি পেশ করেছেন, তা থেকে মনে হয়– হযরত উমার (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম প্রকাশ্যে সালাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে উমার (রা.) দ্বিমত প্রকাশ করেন। পরে মতদ্বৈধতার বিষয়টিকে ঐকমত্যে নিয়ে আসা হয়। অবশেষে হযরত উমার (রা.) হযরত আবু বাকর (রা.)-এর অভিমতকে নির্ভুল মনে করেন এবং যাকাত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধকে মনে-প্রাণে মেনে নেন।

রাসূলে কারীম (সা.)-এর পর যেসব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে, তাদের ব্যাপারে প্রথম খলীফার অনুসৃত নীতি ছিল এই। সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর এ নীতি অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করেন এবং যুদ্ধে শরীক হন। এমনকি প্রথমে এ ব্যাপারে যাঁর মনে সংশয় জেগেছিল তিনিও। এ থেকে যাকাত

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হল। ইসলামী শরীয়াতে এ ইজমা একটা অন্যতম দলীল। এ প্রেক্ষিতে ইমাম নববী লিখেছেন : কোন ব্যক্তি বা কোন জনগোষ্ঠী যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যুদ্ধ করতেও তারা রাজী না হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য। হযরত আবু হুরাইরা (রা.)ও বলেছেন : প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরাম যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। কিন্তু হযরত আবু বাকর (রা.) যখন যুদ্ধের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, তাঁর দলীলও তিনি সকলের সমক্ষে পেশ করেন, তখন এ মতের যৌক্তিকতা সকলের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন সকলেই তা মেনে নেন এবং সর্বসম্মতভাবে এ যুদ্ধ কার্যকর হয়। (ইসলামের যাকাত বিধান, ইউসুফ আল কারযাভী)

সম্ভবত ইতিহাসে হযরত আবু বাকর (রা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম দরিদ্র, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেরই শোষণ করে আসছিল। কিন্তু তারা কোন শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায়নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে এ পর্যন্ত কেউই রাজী হয়নি। কিন্তু হযরত আবু বাকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সৃষ্ট সংশয়ে বিভ্রান্ত হতে রাজী হননি। তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে সেই যুদ্ধ করে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যাকাত মানে ইনকাম ট্যাক্স নয়

যাকাত ট্যাক্স নয়। যাকাত স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির প্রতি অবশ্য পালনীয় একটি আদেশ। পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের পাঁচটি ভিত বা খুঁটি বা স্তম্ভের তৃতীয়তম স্তম্ভ। ফলে তার বিধান মেনে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া একটি উঁচুমানের ইবাদাত। আজকাল অনেকেই যাকাতের ব্যাপারে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। তাদের ধারণা যাকাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্যান্য ট্যাক্সের মতই এক ধরনের ট্যাক্স। প্রকৃতপক্ষে যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত কোন ট্যাক্স নয়, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম যুগে নবী কারীম (সা.)ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ট্যাক্সের প্রবর্তন করেননি। বরং হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

অন্যদিকে যাকাতের ব্যাপারে এ কথাও মনে করা যাবে না যে, যাকাতদাতা ফকীর-মিসকীনদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন, দয়া করছেন। এটা কখনোই নয়। বরং বলব, ফকীর-মিসকীনগণই ধনীদের প্রতি, সম্পদশালীদের প্রতি ইহসান করছেন, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহর ব্যাংকে সম্পদ জমা করার সুযোগ

করে দিচ্ছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। তাদের সম্পদ ও আত্মাকে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন, সর্বোপরি তাঁদেরকে ইসলামী যিন্দেগীতে অন্তর্ভুক্ত করে ইহজগতে এ পৃথিবীর মালিক ও শাসকের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এবং পরকালে জান্নাত লাভের সুযোগ করে দিচ্ছেন। যা সত্যিই সেই সম্পদ-শালীদের জন্য বড় ইহসান, বড় দেয়া। এ আলোচনায় কেউ কেউ হয়তোবা ভ্রু কুঞ্চিত করতে পারেন তাদের বুঝার লক্ষ্যে আরেকটু ব্যাখ্যা করছি। আপনি যদি কাউকে (আপনজন, পরিচিত জন) টাকা দিয়ে আপনার একাউন্টে জমা দিতে বলেন এবং সে জমাও দেয় এতে কি আপনার মনে হওয়া সমুচিত হবে যে আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করছেন? এ প্রশ্নের জবাবে আপনার উত্তর যদি না হয় তাহলে গরীব-দেরকে যাকাত দেয়াও কোনক্রমেই আপনাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হতে পারে না।

সুতরাং কোন খোঁড়া যুক্তি দিয়েই যাকাত ট্যাক্স এ কথা বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কেননা আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘোষণা করেন :

من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضعفه له اضعافا کثیرا

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়? সেই জিনিসই তাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়া হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৪৫)

এখানে যাকাত-সাদাকা বা যে কোন ধরনের দানকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্জে হাসানা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই যারা যাকাত দেবেন তাঁদের এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তার এ দান কয়েক গুণ বাড়িয়ে আল্লাহ তাকে ফেরত দেবেন।

অবশ্য এখানে আরেকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার, একথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ বুঝি কারো মুখাপেক্ষী বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে ধনীদের বা সম্পদশালীদের এ দান গরীব-মিসকীনদের হাতে পৌছানোর আগেই তা আল্লাহর নিকট পৌছে যায়।

যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য

যাকাত ও কর দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যাকাত হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক সম্পদশালীদের উপর আরোপিত আদেশ, যা দরিদ্রের ও আল্লাহর হক হিসেবে আল-কুরআনুল কারীমে বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যদিকে কর হলো দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক সম্পদশালীদের উপর আরোপিত আদেশ। যা সমগ্র দেশবাসীর হক হিসেবে চিহ্নিত। সুতরাং এ অর্থে

যাকাত ও কর দুইটির আদেশদাতা ভিন্ন, দুইটির হকদার ভিন্ন হওয়ায় দু'টি আদেশই সম্পদশালীদের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

কোন যাকাতদাতা যদি মনে করে যাকাত তো দেই কর দেব কেন? আবার যদি করদাতা মনে করে করতো দেই যাকাত দেব কেন? তাহলে উভয়ের উভয় ধারণাই ভুল বলে প্রমাণিত হবে। প্রকৃত কথা হলো, দেশের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ একজন নাগরিক ও একজন সৃষ্টিজীব হিসেবে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যাহোক জনমনে এই সম্পর্কে বিভ্রান্তি, প্রশ্ন ও সংশয় অপনোদনের জন্যে এ দুইয়ের অন্তর্নিহিত পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

০১. যাকাত আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ। অন্যদিকে কর দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক আরোপিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ।

০২. যাকাত হলো বছর শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত সম্পদের উপর আরোপিত লেভী। অন্যদিকে কর হলো ব্যক্তির আয়ের উপর আরোপিত লেভী।

০৩. যাকাত ধর্মীয় বিধান– যা শুধু দেশের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যদিকে কর দেশের সকল নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

০৪. যাকাতের অর্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়যোগ্য। অন্যদিকে করের অর্থ সরকার যে কোন কাজে ব্যয় করতে পারে।

০৫. যাকাত মূলত: দরিদ্রের হক। অন্যদিকে কর সমগ্র দেশবাসীর হক।

০৬. যাকাত প্রদানকারী মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে চলে ইহজগতে শান্তি ও আখিরাতে চির সুখের স্থান জান্নাত কামনা করতে পারে। অন্যদিকে কর প্রদানকারী কোন রকম ব্যক্তিগত প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করতে পারে না।

০৭. যাকাত আদায়ের জন্য নূন্যতম নিসাব পরিমাণ সম্পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। ফলে তা কম সম্পদশালীদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের নূন্যতম সীমা থাকলেও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কোন সীমা উল্লেখ নেই।

০৮. যাকাত সব সময়ই স্থির। অন্যদিকে কর আয়ের উপর নির্ভর করে পরিবর্তনশীল।

০৯. যাকাত অর্থের মাধ্যমে প্রদান করা উত্তম। অন্যদিকে কর অর্থের মাধ্যমেই প্রদান করা হয়।

১০. দেশে ইসলামী বিধি-বিধান মুতাবিক পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা না থাকায় যাকাত আদায়ের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। অন্যদিকে কর আদায়ের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে পার্থক্য

আল-কুরআনুল কারীমে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে সাদাকাহ বণ্টনের ৮টি খাত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সূরায় বর্ণিত এ সাদাকাহ শব্দটিকে যাকাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যার জন্য অনেকেই সাদাকাহ ও যাকাতকে একই রকম মনে করে থাকেন। কিন্তু আসলে তা নয়। মূলত: বিষয়টি এভাবে বলা যায় যে, সকল যাকাতই সাদাকাহ, কিন্তু সকল সাদাকাহ যাকাত নয়। শুধু বাধ্যতামূলক সাদাকাহ-ই যাকাত। যাহোক যাকাতের মত একটি বাধ্যতামূলক আদেশের সাথে সাদাকাহ'র বিষয়টিকে অনেকে এক করে দেয়ায় মূলত এ আলোচনা।

০১. যাকাত মূলত: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ। অন্যদিকে সাদাকাহও এক অর্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ।

০২. যাকাত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে সঞ্চিত সম্পদের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে সাদাকাহ আদৌ সে রকম কিছু নয়।

০৩. যাকাত অবশ্যই আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ৮টি খাতেই বণ্টন করতে হবে। অন্যদিকে সাদাকাহ বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট খাতের উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে।

০৪. যাকাত ও সাদাকাহ মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য।

০৫. যাকাত মূলত: দরিদ্রদের জন্য, অন্যদিকে সাদাকাহ মূলত: সকলের জন্য।

০৬. যাকাতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নূন্যতম সম্পদের পরিমাণের নিসাব উল্লেখ রয়েছে, যার নীচে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয় না। অন্যদিকে সাদাকাহর ক্ষেত্রে এমন কোন রকম নিসাবের উল্লেখ নেই।

০৭. যাকাতের প্রদেয় হার স্থির ও কিয়ামাত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে সাদাকাহর প্রদেয় হার বলতে কিছু নেই। এটি ব্যক্তির মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

০৮. যাকাত প্রত্যেক বছরই প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে সাদাকাহর ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

০৯. যাকাত প্রদান না করলে ইহজগত ও পরজগতে শাস্তি নিশ্চিত। অন্যদিকে সাদাকাহ প্রদান না করলে সাওয়াব পাবে না।

১০. যাকাত প্রদান না করলে মুসলিম বেঈমান বা কাফির হয়ে যায়। অন্যদিকে সাদাকার ক্ষেত্রে এমন কোন কঠিন শর্ত নেই। তবে মুসলিম হিসেবে সবাই এমন সাওয়াবপূর্ণ কাজটি করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদ দাতা কে

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত। মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে এ এক বিশেষ অনুগ্রহ। আর তাইতো হালাল উপায়ে এ সম্পদ অর্জনে ইসলাম মানুষকে প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সালাত আদায়ের পর হালাল সম্পদের অন্বেষণে যমীনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله

"যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম রিযক অনুসন্ধান কর।" (সূরা আল-জুমুয়া : ১০)

وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم

"এবং দিবসের নিদর্শনকে আমি আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করতে পার।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১২)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وانه هو اضحك وابكى - وانه هو امات واحيا - .... وانه هو

اغنى واقنى

"আর তিনিই (আল্লাহ) হাসান, তিনিই কাঁদান, আর তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।"

(সূরা আন-নাজম : ৪৩-৪৪, ৪৮)

সম্পদের মালিক কে

যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টির মালিক-এ কথা সহজেই বোধগম্য। আর তাই পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে এবং আসবে সব সম্পদের মালিক দাতা হিসেবে মহান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله

على كل شيء قدير

"আসমান ও জমিন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল-মায়িদা : ১৭)

وله من فى السموت والارض كل له قنتون

"আসমান ও জমিনে যারা আছে, তারা সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত।"
(সূরা আর-রূম : ২৬)

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل الحمد

لله بل اكثرهم لا يعلمون - لله ما فى السموات والارض ان الله

هو الغنى الحميد

"আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। আল্লাহরই যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, অতি প্রশংসিত।" (সূরা লুকমান : ২৫-২৬)

উল্লেখিত আয়াতসহ পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে পৃথিবীর সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক তা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তারপরই সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দুনিয়ার অঙ্গনে মানুষকে সাময়িকভাবে সম্পদের মালিকানা প্রদান করে বলেন :

اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها

ملكون - وذللنها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون

"তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি আমার সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গৃহপালিত পশু? তারপর তারা এগুলোর মালিক হয়। আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা খায়।" (সূরা ইয়াসীন : ৭১-৭২)

সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে যে সম্পদ আমাদের নিকট আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হক বা অধিকার হলো আল্লাহর। এবার যারা আল্লাহর দেয়া এ সম্পদ আল্লাহর হুকুম মত ব্যয় করবে সে সম্পদের মালিকানায় থাকা তার জন্যই যথার্থ হবে। নতুবা অনধিকার চর্চার কারণে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। হয়তো তা হতে পারে দুনিয়ার জীবনে, আর চূড়ান্তভাবে আখিরাতে।

কারণ একটি বিষয় স্পষ্ট– দিন-রাতের পরিবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণ সহ আসমান ও জমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى اليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير

"তিনি প্রবেশ করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাতের মধ্যে আর তিনি কাজে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদের তোমরা ডাক, তারা তো খেজুরের আঁটির খোসারও মালিক নয়।" (সূরা আল-ফাতির : ১৩)

জমিতে ফসল দাতা কে

জমিতে বীজ বপন বা পুঁতে দেয়া মানুষের কাজ কিন্তু এরপর এ বীজ থেকে চারাগাছ জন্মানোর ক্ষমতা পৃথিবীতে কোন মানুষের নেই। সুতরাং বলা যায়, জমিতে ফসল দাতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। পৃথিবীর বুকে যে যত বেশি ক্ষমতাবানই হোক না কেন এ বিষয়ে তার বা তাদের কোন হাত নেই। আর তাইতো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেই যে জমিতে ফসল দাতা বা উৎপন্নকারী সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার জন্য প্রশ্নের সুরে বলেন :

افرءيتم ما تحرثون - ءانتم تزرعونه ام نحن الزرعون - لو نشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفكهون

"তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে অবশ্যই তা খড়-কুটায় পরিণত করে দিতে পারি; তখন তোমরা হয়ে পড়বে হতবুদ্ধি।"
(সূরা আল-ওয়াকিয়াহ : ৬৩–৬৫)

ان الله فلق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فانى تؤفكون

"নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনিই বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। তিনিই আল্লাহ সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে।" (সূরা আল-আনআম : ৯৫)

وهو الذى انشا جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী এবং যার কতক মাচান অবলম্বী নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, আর যাইতুন ও আনার, যা পরস্পর সদৃশ। এগুলো থেকে ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং ফসল কাটার দিন তার হক দান কর। অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীকে।"

(সূরা আল-আনআম : ১৪১)

انما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلنه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قدرون عليها اتها امرنا ليلا او نهارا فجعلنها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايت لقوم يتفكرون

"বস্তুত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে। তারপর যখন জমিন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে উঠে, আর জমিনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন এসে পড়ল তার উপর

আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে, ফলে আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি আয়াতসমূহ চিন্তাশীল লোকদের জন্য।" (সূরা ইউনুস : ২৪)

মূলত: কৃষক ভূমিতে যে বীজ বপন করে তা অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য পানি, বাতাস, আলো ও তাপ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আর এসব কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অধীন। তিনিই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে বনানী সৃষ্টি করেন, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই এরূপ করার। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তিনিই যে সকল কিছুর স্রষ্টা, উৎপাদনকারী একথা মানুষকে মনে করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ বিমুখতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জিজ্ঞাসার সুরে বলেন :

امن خلق السموت والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم قوم يعدلون

"যাদের তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা শ্রেয়, না, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং যিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন তিনিই? তারপর আমি তা দিয়ে মনোরম উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি; তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তো তোমাদের নেই। আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ? বরং তারা এমন লোক, যারা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।"

(সূরা আন-নামল : ৬০)

اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجروز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ও পতিত জমিনে পানি প্রবাহিত করি, তারপর তার সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, তা থেকে খায় তাদের গৃহপালিত জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও। তবুও কি তারা দেখে না?" (সূরা আস-সাজদা : ২৭)

এভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে তিনিই যে জমিতে ফসল উৎপন্নকারী, পৃথিবীতে আর যে কেউ এটি পারে না, ভবিষ্যতেও পারবে না সে কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং জমিতে ফসল উৎপন্নকারী হিসেবে, ফসলের দাতা হিসেবে, ফসল হেফাযতকারী হিসেবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের কাছে ন্যূনতম

কৃতজ্ঞতাবোধ তো প্রত্যাশা করতেই পারেন। এ উৎপন্ন ফসল থেকে আল্লাহ কিছু ফসল চাইতেই পারেন– যা আল-হাদীসে উশর নামে বর্ণিত হয়েছে। যা দরিদ্রদেরকে বা জমিহীন, কর্মক্ষমতাহীন অসহায় মানুষকে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে, যাতে এমন মানুষগুলোও আল্লাহর শোকরগোজার হতে পারে। কারণ আল্লাহ শোকর গোজারীকে পছন্দ করেন। আর তাইতো সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

وايـة لهـم الارض الـمـيـتـة احـيـيـنـهـا واخرجنـا مـنـهـا حـبـا فـمـنـه

يـاكـلـون - وجـعـلـنـا فـيـهـا جـنـت مـن نـخـيـل واعـنـاب وفـجـرنـا فـيـهـا

مـن الـعـيـون - لـيـاكـلـوا مـن ثـمـره ومـا عـمـلـتـه ايـديـهـم افـلا يـشـكـرون

"তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত জমিন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তারা আহার করে। আর আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি প্রস্রবণসমূহ, যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?" (সূরা ইয়াসীন : ৩৩–৩৫)

মেধা ও যোগ্যতা কার দান

মেধা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দান, মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। এটি প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত এমন এক সম্পদ যা পৃথিবীর কোন জিনিস দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর এজন্যই বলা হয় এ এক অলৌকিক দান। এ মেধা গঠনে সরাসরি কোন মানুষের হাত নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকে ইচ্ছা প্রখর বা তীক্ষ্ণ মেধা দান করে থাকেন; যাকে ইচ্ছা দান করেন না– এজন্যই সকল মানুষের মেধা ও যোগ্যতা এক রকম হয় না। অবশ্য আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের ফলে মেধার কিছুটা গঠন হতে পারে বলে বিজ্ঞান মনে করে থাকে। তবে যে কথা না বললেই নয় সেটা হলো, মেধা পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্র বলি আর অনুন্নত রাষ্ট্রই বলি কোথাও ব্যাগ ভর্তি করে বেচাকেনা হয় এমন কথা শোনা যায় না। ফলে অনেক সম্পদশালীর সন্তানকেও দেখি মেধাহীন আবার অনেক দরিদ্র খেটে খাওয়া পরিবারের সন্তানদেরকেও দেখি অনেক অনেক মেধাবী। অবশ্য একটি কথা বলে রাখা দরকার মহান স্রষ্টা কাউকেই একদম মেধাহীন করে দুনিয়ায়

পাঠাননি। এক দিক না একদিকে তাদের মেধা আছেই, তবে ব্যবহারের কারণে তাদের যোগ্যতার ঘাটতি এবং গ্রহণযোগ্যতার তারতম্য ঘটে থাকে মাত্র। এবার প্রশ্ন : এ মেধা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেন দিয়েছেন? আছে কি তার কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য? আছে কি মেধাবীদের কোন দায়িত্ব-কর্তব্য?

হ্যাঁ, অবশ্যই। এ মেধা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর নীতি কায়েম ও অন্য সৃষ্টির কল্যাণে ভূমিকা রাখার জন্য। শুধু মেধা খাটিয়ে সম্পদ অর্জন আরেকটু এগিয়ে অন্যের সম্পদ হরণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে খাও দাও ফূর্তি কর, যা ইচ্ছা তাই কর এ নীতিতে গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য মেধা ও যোগ্যতা আল্লাহ দান করেননি। একজন মেধাবী হওয়ার সুবাদে আল্লাহর দেয়া এ দুনিয়ায় বিচরণ করে, আল্লাহর দেয়া সকল নিয়ামত ভোগ করে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে বেঁচে থেকে আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধে চলবে, অন্যকে চলতে উৎসাহিত করবে, আল্লাহর বাণী আল-কুরআনুল কারীমের সংশোধন দাবি করবে এমন মাতব্বরী, গর্ব-অহংকার করার জন্য আল্লাহ কাউকে মেধা দান করেননি। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ গর্ব-অহংকার করে বলে আমার মেধা দিয়ে আমি সম্পদ অর্জন করেছি, আমার যোগ্যতার বিনিময়ে আমি মাসে এত অর্থ উপার্জন করছি, এ সম্পদ আমার, এ সম্পদ আমিই ভোগ করব। এসব কথা বলা যাবে না। বরং মনে করতে হবে এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ কাউকে মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পরীক্ষা করছেন সে এ মেধা ও যোগ্যতা কি আল্লাহর আদেশ অনুসারে ব্যবহার করছে না মনে যা চায়, যেভাবে চায় সেভাবেই ব্যবহার করছে। যদি মনে যা চায় সেভাবেই ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ চাইলে এ মেধা যেকোন মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারেন। যেহেতু একটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি মেধা আল্লাহর দান, আল্লাহ কর্তৃক দেয়া সম্পদ, মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ সেহেতু এ মেধা দাতা হিসেবে তিনি চাইলে তা কেড়ে নেয়াও তার জন্য কঠিন বা সময় সাপেক্ষ কোন বিষয় নয়। এর জন্য আল্লাহকে কোন জবাবদিহিতার কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হবে না। তাইতো আমরা দেখি জগতের অনেক মানুষকে আল্লাহ মেধা দিয়ে করেছেন গৌরবান্বিত, সম্মানিত, যারা আজ ভূমিকা পালন করছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায়, আর আরেক শ্রেণীকে করছেন অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, পর্যদস্ত। তারা আল্লাহর দেয়া মেধাকে আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধে খাটানোর ফলে দুনিয়ার অঙ্গনেই পাচ্ছে অনেক শাস্তি– যা বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সমতুল্য।

সুতরাং মেধা ও যোগ্যতা প্রদানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হওয়ার কারণে অবশ্যই এ মেধা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যয় করার

এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকলকে সমান মেধা ও যোগ্যতা দান করেননি সেহেতু মেধা ও যোগ্যতার দ্বারা যারা সফলতায় উত্তীর্ণ হবে, সম্পদশালী হবে তাদের এ সম্পদে সম্পদহীনদের হক ও অধিকার রয়েছে বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

সম্পদও আল্লাহ নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে ব্যয় করলে আল্লাহ যে কোনভাবেই এ সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন। এখানে জগতে প্রচলিত ঠিক এমন একটি প্রবাদ উল্লেখ করছি– এ কূল ভাঙ্গে ও-কূল গড়ে এই তো নদীর খেলারে ভাই এই তো নদীর খেলা, সকাল বেলা আমীররে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা, এই তো নদীর খেলা।

ঠিক এমন কথা পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ ঘোষণা করেন :

يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم

"... আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান সম্মান দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইউনুস : ১০৭)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্ত

যাকাত সালাতের মতই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ। আর তাই সালাত আদায়ের যেমন কিছু শর্ত আছে তেমনি যাকাতেরও রয়েছে কতিপয় শর্ত। ইসলামী আইনবিদদের মতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ফরয যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে :

০১. মুসলিম হওয়াঃ যাকাত প্রদান মুসলিম সম্পদশালীদের জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি তাদের জন্য যাকাত নয়। অর্থাৎ যাকাত শুধু মুসলিমদের জন্য ফরয; অমুসলিমদের জন্য নয়।

০২. বালিগ হওয়াঃ তাকলীফ অর্থ দায়িত্ব পালনের জন্য আইনসঙ্গত যোগ্যতা। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই যাকাত আদায়ের জন্য বালিগ ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন (বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগের স্থিতিশীলতা) হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁরা বলেন, যারা দ্বীনের আরকান-আহকাম পালনের যোগ্য নয় তাদের সম্পদের উপর যাকাত প্রদানও বাধ্যতামূলক নয়। কারণ যাকাত প্রদানও একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। (হানাফী মাযহাব)

০৩. আকেল বা বুদ্ধিসম্পন্নঃ আকেল মানে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া। কারণ পাগলের মালে কোন যাকাত নেই; যদিও তার পাগলামী পূর্ণ বছরে অব্যাহত থাকে। (হানাফী মাযহাব)

০৪. স্বাধীন হওয়াঃ যাকাত ফরয হবার অন্যতম শর্ত হলো ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাস-দাসীর উপর যাকাত বর্তায় না।

০৫. নিসাবঃ নিসাব হলো অর্থ-সম্পদের সেই নির্দিষ্ট ও নূন্যতম পরিমাণ, সংখ্যা বা সীমা যার নিচে হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয় না। অর্থাৎ যাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রয়েছে সেসব লোকের উপরই যাকাত ফরয হয়।

০৬. সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানাঃ সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। সম্পদ মালিকের এখতিয়ারে থাকা, সম্পদের উপর অন্য কারো অধিকার না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করতে পারাই হলো মালিকানার আসল কথা। তবে একমাত্র 'সুনির্দিষ্ট' ও 'পূর্ণাঙ্গ' কথা দু'টো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয় তার উপর যাকাত নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারী মালিকানাধীন সম্পদ। তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের উপরও যাকাত ধার্য হবে না, তবে ওয়াকফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে। যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। জমির ফল-ফসলের ক্ষেত্রে জমির মালিক হওয়া জরুরী নয়; কেবল উৎপাদিত ফসলের মালিক হলেই উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। যদি কোন মুসলিম জমি ভাড়া, লীজ, বর্গা বা ইজারা নিয়ে ফসল উৎপাদন করে কিংবা যদি ওয়াকফের জমিতে উৎপাদিত ফসল হয় তবুও উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে।

০৭. সম্পদ এক বছর থাকাঃ কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই কেবল সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا نصر بن على الجهضمى ثنا شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৭৯২)

তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (উশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

০৮. যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাতঃ যদি যৌথভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে; তবে মালিকগণ নিজ নিজ অংশের যাকাত নিজেরাও পরিশোধ করতে পারেন।

০৯. মৃত ব্যক্তির যাকাতঃ নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি যাকাত পরিশোধ করার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ অথবা তার প্রতিনিধি, কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা এবং কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করবেন।

১০. তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাতঃ কর্তৃপক্ষ বা মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের দেখা-শোনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে সম্পদ ন্যস্ত করা হয়ে থাকলে, সে সম্পদের যাকাত মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারীকেই প্রদান করতে হবে।

১১. বর্হির্বিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাতঃ কারো সম্পদ যদি বিদেশের ব্যাংকে থাকে বা কেউ যদি বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে সে দেশে যদি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন থাকে এবং উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে নেয় তাহলে নিজ দেশে আর তাকে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি ঐ দেশে ইসলামী সরকার না থাকে এবং যাকাত কেটে না নেয় তাহলে নিজ দেশে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

অন্যদিকে সম্পদ দেশে আর সম্পদের মালিক বিদেশে অবস্থান করছেন এমন ক্ষেত্রেও তার প্রতিনিধি বা পরিবারবর্গের সদস্য-সদস্যারা যাকাত আদায় করতে হবে।

১২. কয়েদী বা সাজাপ্রাপ্ত আসামীর যাকাতঃ বড় বড় ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী যখন রাজনৈতিক ইস্যু বা অন্য কোন কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে

অবস্থান করেন তখন তার সম্পদের উপরেও যাকাত, উশর ওয়াজিব। মালিকের অনুপস্থিতিতে যে তার ব্যবসা, কৃষি বা অর্থ-সম্পদের অভিভাবক হবে বা তত্ত্বাবধায়ক হবে সে ব্যক্তিই তার পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরিহার্য কার্য সম্পাদনের ন্যায় তার সম্পদ ও ফসলের যাকাত (উশর) পরিশোধ করবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়।

১৩. মুসাফিরের যাকাতঃ মুসাফির যদি সাহেবে নিসাব হয় তাহলে তার সম্পদ ও ফল-ফসলের উপর যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব। তবে এ কথাও সত্য যে, বিশেষ প্রয়োজনে মুসাফির হিসেবে সে নিজেও যাকাত পাবার হকদার। সফর তাকে যাকাত গ্রহণের হকদার করে আর সাহেবে নিসাব হওয়া তার উপর যাকাত ফরয করে দেয়।

ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে শর্ত

ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হওয়ার যেমন শর্ত রয়েছে তেমনি ব্যক্তির সম্পদের উপরও যাকাত ফরয হবার শর্ত রয়েছে। এখানে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবার শর্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

০১. মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াঃ যাকাত সে মালের উপরই ফরয হবে যে মালের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া কারোর কাছে বা অধীনে যদি কোন সম্পদ থাকে তাহলে সে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে না। যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ যদি কেউ কারোর অধীনে রাখে তাহলে এ রাখাটাই অবৈধ। কাজেই এক্ষেত্রে যাকাত ফরয হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

০২. ওয়াকফঃ ইসলামী ফকীহদের মতে মসজিদ, আল্লাহর পথে মুজাহিদ, ইয়াতীম এবং দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ যাকাতের আওতাভুক্ত নয়।

০৩. অবৈধ সম্পদঃ চুরি-ডাকাতি, জোর-জবরদস্তি, প্রতারণা, জালিয়াতি, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে কেউ অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারে। ইসলামের দাবি হলো এই সমুদয় অর্থই প্রকৃত মালিককে অথবা তার অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি ঐ সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি বা অর্থের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া না যায়, বা কারোর জানা না থাকে কে সে সম্পদের মালিক তাহলে তার সমুদয় অর্থ-সম্পদই দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। এবার এ কাজ না করে কেউ যদি এ ধরনের সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে বছর পূর্তি হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে।

এক্ষেত্রে যদি ঋণ থাকে তাহলেও কি যাকাত দিতে হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ ফকীহ ঋণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– সুঋণ ও কুঋণ। যে ঋণগ্রহীতা

স্বীকার করে এবং পরিশোধেরও অঙ্গীকার করে তাই হলো সুঋণ। এর উপর যাকাত দিতে হবে। এর বিপরীত হলো কুঋণ। এর উপর যাকাত দিতে হবে না।

০৪. বর্ধনশীল সম্পদ/প্রবৃদ্ধিঃ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করার একটি অন্যতম শর্ত হলো সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। অর্থাৎ যে সম্পদ মালিকের আয় বা মুনাফা বৃদ্ধি করে তার উপরই যাকাত দিতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে সুদখোরের দৃষ্টিতে তাদের সম্পদও বর্ধনশীল কিন্তু সুদ হারাম হওয়ায় এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত ফরয নয়। সুদের মাধ্যমে তথা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত না করে এমনিতেই সাদাকা করে দিতে হবে। অন্যদিকে এ শর্তের আলোকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, গাড়ি-বাড়ি, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, চলাচলের জন্য সঞ্চিত ফল-ফসল, মাটির নিচে প্রোথিত সম্পদ, যার হদিস জানা নেই ইত্যাদি মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়; তাই এ সবের উপর যাকাত নেই। কিন্তু গরু-ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ, ব্যবসার পণ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মেশিন ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল; তাই এগুলোর উপর যাকাত ধার্য হবে।

০৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকাঃ যাকাত ধার্য হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে কোন ব্যক্তির কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। নিসাব বলা হয় শরীয়াত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। সাধারণভাবে ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপা বা ৭.৫ তোলা সোনা বা এর মূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারো কাছে ৭.৫ তোলা সোনা বা ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান অথবা সব সম্পদ মিলে ৫২.৫ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উটের ক্ষেত্রে ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে। কৃষিজাত ফসলের নিসাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক বা ২৮ মণ।

০৬. মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদঃ সারা বছর মৌল প্রয়োজন মিটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايت

لعلكم تتفكرون

"(হে নবী!) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (আল্লাহর পথে) তারা কী খরচ করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২১৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'অতিরিক্ত' বলতে পরিবারের খরচ বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়।

০৭. ঋণমুক্ত হওয়াঃ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা নিসাব তার চেয়ে কম হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তবে ঋণ পরিশোধের পর বা ঋণের সম-পরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর যদি সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়, সে ঋণের ক্ষেত্রে যে বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, সে বছর সেই পরিমাণ ঋণ বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর ঋণ পরিশোধ অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় সে সম্পদের উপর যাকাত দেয়া উচিত। উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার শর্ত নেই। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত থাকেন তবে উশর পরিশোধ করার পরই ঋণ শোধ করতে হবে।

গণী (ধনী) কে

ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী কে? কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যক্তিকে ধনী বলে সম্বোধন করা যাবে এবং তাঁদের উপর যাকাত, কুরবানী ও সাদকাতুল ফিত্তর আদায় করা বাধ্যতামূলক হবে তার ইঙ্গিত এখানে প্রদান করা হলো :

ধনী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

০১. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয়;

০২. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয় না, কিন্তু কুরবানী করা ও রোযার ফিতরা প্রদান বাধ্যতামূলক হয়;

০৩. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ও রোযার ফিতরা প্রদান বাধ্যতামূলক হয় না, কিন্তু তার জন্য যাঞ্চা করা হারাম হয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا قتيبة وعلى بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال على اخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن

عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش او خدوش او كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে (যাঞ্চা করে) অথচ তা থেকে বেঁচে থাকার মত সম্বল তার রয়েছে, সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে তার মুখমণ্ডলে এই যাঞ্চার ক্ষত নিয়ে হাজির হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে সে অন্যের কাছে হাত পাততে পারবে না? তিনি বলেন : পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সমপরিমাণ সোনা।

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬০৪)

যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়াত করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। অর্থাৎ যাকাত আদায় করার সময় বা যাকাতের মাল অন্য মাল থেকে পৃথক করার সময় যাকাত আদায়ের নিয়াত করতে হবে। যাকাত আদায়ের নিয়াত না করে শুধু টাকা-পয়সা প্রদান করলে তা শুধু দান হিসেবে পরিগণিত হবে। যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই যাকাতদাতা যাকাতের মাল প্রদান করার সময় যদি যাকাতের নিয়াত না করে থাকে পরে যাকে মাল দেওয়া হয়েছে তার মালিকানায় উক্ত মাল থাকা অবস্থায় যেন যাকাতের নিয়াত করে নেয়। যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিয়াতে নিজের যাকাতের মাল বণ্টন করার জন্য অন্য কারো হাওয়ালা করে তবে বণ্টনকারী ব্যক্তি মাল বণ্টনের সময় যাকাতের নিয়াত না করলেও যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

নিয়াতের ক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং কেউ যদি অন্তরে যাকাতের নিয়াত করে তা বণ্টনের সময় মুখে অন্য কোন শব্দ যেমন, হেবা, ঋণ ইত্যাদি উচ্চারণ করে তাতেও যাকাত শুদ্ধ হবে।

কোন ব্যক্তি যদি উকিলের নিকট যাকাতের মাল সোপর্দ করার নিয়াত করে যে এটা নফল সাদাকা বা কাফফারা। পরে উকিলের হাতে সে মাল থাকা অবস্থায় সে যাকাতের নিয়াত করে নেয় অথচ উকিল তা জানল না বরং সে নফল বা

কাফফারার নিয়াতেই যাকাতের মাল গ্রহীতাকে দিয়ে দিল তাহলেও যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে মাল বণ্টন করার উকিল বানিয়েছে এবং তার কাছে উভয়েই যাকাতের মাল হস্তান্তর করে দিয়েছে। সে উভয়ের মাল একত্রিত করে ফেলে তাহলে এ দান তার নিজের পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে এবং তাদের যাকাত আদায় হবে না। কাজেই তাদের উভয়ের মালের জন্য সে-ই দায়ী থাকবে। তবে যদি তারা উভয়ে পূর্ব থেকেই একত্রিত করার অনুমতি দিয়ে থাকে অথবা একত্রিত করার পর ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার পূর্বে তারা অনুমতি প্রদান করে তাহলে যাকাত আদায় হবে। এক্ষেত্রে যদি স্পষ্ট অনুমতির পরিবর্তে অনুমতির ইঙ্গিতও পাওয়া যায় তাহলেও উভয়ের যাকাত আদায় সহীহ হবে।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

কোন ব্যক্তি যদি ফকীর-মিসকীনের পক্ষ থেকে উকিল হয় আর সে যাকাতের মাল গ্রহণের পর মিলিয়ে ফেলে তাহলেও যাকাত আদায় হবে। একাধিক ফকীর ব্যক্তি যদি সম্মিলিতভাবে কোন এক ব্যক্তিকে যাকাত গ্রহণের উকিল বানায় এবং তার নিকট এ পরিমাণ মাল জমা হয় যে, তাদের মধ্যে এ মাল বণ্টন করা হলে তারা প্রত্যেকেই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে যায়, এরপরও উক্ত উকিল ব্যক্তির নিকট যাকাতের মাল প্রদান করা হলে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় সহীহ হবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মাল নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত দাতাদের যাকাত সহীহ হবে। আর যদি একাধিক ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে কোন এক ব্যক্তিকে উকিল নির্ধারণ করে তবে উকিলের নিকট জমাকৃত মাল প্রত্যেকের অংশে পূর্ণ নিসাব পরিমাণ হলে এ অবস্থায় উকিলের নিকট যাকাত প্রদান করলে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

আর যদি যাকাত গ্রহণকারী ফকীরদের পক্ষ থেকে উকিল না হয় বরং সে নিজেই স্বেচ্ছায় ফকীরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করে তাহলে তার নিকট জমাকৃত মাল নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়ে গেলেও যাকাত দাতার যাকাত আদায় সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

উকিল যদি তার নিজের অভাবগ্রস্ত বালিগ সন্তান বা স্ত্রীকে যাকাতের মাল দেয় তাতেও যাকাতদাতার যাকাত আদায় সহীহ হবে। উকিল যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে তার নাবালিগ সন্তানকেও যাকাতের মাল দিতে পারবে। তবে সে নিজে খেতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

কিন্তু যদি মালদার ব্যক্তি যাকাতের মাল উকিলকে সোপর্দ করার সময় বলে যে, তুমি এ মাল যেখানে ইচ্ছা বণ্টন করতে পারবে। তবে সে নিজেও গ্রহণ করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যাকাতদাতা যদি নির্ধারিত করে দেয় যে অমুককে যাকাত দেবে, তাহলে তাকেই দিতে হবে। অন্য কাউকে অথবা নিজের সন্তান বা স্ত্রীকে দিতে পারবে না। তবে 'বাহরুর রায়েক' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে না দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে দিলেও যাকাত আদায় সহীহ্ হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যাকাতদাতা ব্যক্তি উকিলের নিকট যে টাকা-পয়সা দিয়েছে উকিল যদি তা নিজে রেখে দিয়ে নিজের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করে এই নিয়াতে যে যাকাত দাতার টাকা থেকে সে তা পূরণ করে দেবে, তবে যাকাতদাতার যাকাত আদায় সহীহ্ হবে। আর যদি উক্ত টাকা নিজের জন্য খরচ করে পরে নিজের মাল থেকে যাকাত আদায় করে তাহলে আদায় সহীহ্ হবে না। বরং তা তার নিজের পক্ষ থেকে দান হিসেবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যাকাতের নিয়াতে অন্য মাল থেকে যাকাতের মাল পৃথক করলেই তার দায়িত্ব পূর্ণ হবে না বরং ফকীরকে দেওয়ায় এর দায়িত্ব পূর্ণ হবে। যাকাতের নিয়াতে অন্য মাল থেকে যাকাতের মাল পৃথক করার পর সে মাল নষ্ট হয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে অথবা সে নিজে মারা গেলে যাকাত আদায় হবে না।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যে মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়েছিল সে মাল সম্পূর্ণ সাদাকা করে দিলে তার যিম্মা যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মান্নতের নিয়াত করে বা অন্য কোন ওয়াজিব সাদাকার নিয়াত করে সম্পূর্ণ মাল দান করে দেয় তাহলে যা নিয়াত করেছে তাই আদায় হবে এবং যাকাত ভিন্নভাবে আদায় করতে হবে।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যদি পূর্ণ মালের কিছু অংশ যাকাতের নিয়াত করা ব্যতীত সাদাকা করে দেয় তাহলে উক্ত মালের যাকাত তার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট মালের যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যদি কোন গরীব লোকের কাছে কারো ঋণ পাওনা থাকে আর সে তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে যে পরিমাণ ক্ষমা করেছে সেই পরিমাণ মালের যাকাত দিতে হবে না। অবশিষ্ট ঋণের যাকাত দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

কোন বিত্তশালী ব্যক্তি যদি কোন ফকীরকে হুকুম করে যে, অমুকের নিকট যে ঋণ পাওনা আছে তা উসুল করে নিয়ে যাও। এর দ্বারা সে যদি ঐ মালের যাকাত প্রদানের নিয়াত করে যা তার কাছে মজুদ রয়েছে তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যদি কোন বিত্তশালী ব্যক্তি কোন গরীব মিসকীনকে কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি কর্জ দিয়ে যাকাতের নিয়াতে মাফ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু

এইরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করলে সে যদি এটি দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে তবে তা গ্রহণ করা উক্ত ধনীর জন্য দুরস্ত আছে।

(ফাতাওয়ায়ে দুররুল মুখতার, ২য় খণ্ড)

অনুরূপভাবে গরীব ব্যক্তির নিকট পাওনা ঋণ তাকেই হিবা করে দিয়ে যদি ঐ মালের যাকাতের নিয়্যাত করে যা তার নিকট মজুদ আছে তবেও যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু যদি যাকাতদাতা ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতাকে যাকাতের টাকা প্রদান করে এ টাকা থেকে তার পাওনা উসুল করে নেয়, তবে তার যাকাত সহীহ্ হবে।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

নাবালিগ ও পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত

প্রত্যেক সাবালক মুসলিম নর-নারী, সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সম্পদশালী ব্যক্তির ধন-সম্পদেই যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে সমস্ত আলেম-উলামার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নাবালিগ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয কিনা বা নাবালিগ যতক্ষণ পূর্ণ বয়স্ক না হবে এবং পাগল যত দিনে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন না হবে ততদিন তাদের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তই হলো বালিগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং নাবালিগ বালক এর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে পাগলের উপরও যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি তা পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত হয়। (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর যদি বছরের শুরু অথবা শেষে কিছু দিন সুস্থ মস্তিষ্ক থাকে, এর পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে (আয়নী : শরহুল হিদায়া)। এটাই জাহিরী রিওয়ায়েত (কাফী)। সদরুল ইসলাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (শরহুন্ নিকায়া : শায়খ আবুল মাকারিম)। আরযী পাগলের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি বালিগ হওয়ার পর পাগল হয়, তবে তার জন্য এ মাসআলা। আর আসল পাগল তথা কেউ যদি পাগল অবস্থায় বালিগ হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সুস্থ হওয়ার পর হতে তার বছর গণনা ধর্তব্য হবে (কাফী)।

অনুরূপভাবে কোন বালক যদি বালিগ হয়, তাহলে বালিগ হওয়ার সময় হতে তার বছর ধর্তব্য হবে। (তাবয়ীন)

বেহুঁশ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এই বেহুশী পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত থাকে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

সুদখোর, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের উপর যাকাত

সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ইসলামের বিধান অনুযায়ী হারাম। এর যে কোন একটি পন্থার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করার চেষ্টা মানে অন্যের হক হরণ করা। এ সম্পদের অধিকারী তারা যাদের কাছ থেকে কেউ-কেউ তা বিভিন্ন কৌশল বা পন্থায় নিয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে যারা সম্পদ ভোগ করছে তারা যেহেতু সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় সেহেতু এ সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ মাল যে কোন পরিমাণই হোক না কেন এর উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং ইসলামের বিধান হলো সুদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আনা হয়েছে তাদের কাছে তা ফেরত দেয়া। অথবা যদি এমনটি হয় ফেরত দেয়ার জন্যে কোন পক্ষ বা প্রতিষ্ঠান (সুদী ব্যাংক বা সুদের ব্যবসা করে এমন প্রতিষ্ঠান)কে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে উক্ত টাকা বা সে টাকার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সাদাকা করে দিতে হবে। আর এতে সওয়াব পাওয়ার নিয়াত করা যাবে না। কারণ যে সম্পদে তাদের মালিকানা নেই সে সম্পদ সাদাকা করলে সওয়াব পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, জুয়া ইত্যাদি যে কোন পন্থায় অর্জিত সম্পদ হারাম। আর এ হারাম মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না। বরং সব সম্পদই সাদাকা করে দেয়া ফরয।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

অন্যদিকে হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ যদি ব্যক্তির হালাল সম্পদের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে হারাম মালে সেই ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাতে যাকাত ফরয হবে এবং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। আর যদি পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে হারাম মাল পৃথক করার পর হালাল সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

তৃতীয় অধ্যায়
নিসাব কী

নিসাব হলো শরীয়াহ্ নির্ধারিত সম্পদের নিম্নতম সীমা বা পরিমাণ। যার কম বা নিচে হলে একজন ব্যক্তির মালের উপর যাকাত ফরয হয় না। ফলে নিসাবের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে একজন মুসলিম প্রতি চান্দ্র বছরের প্রথমে ও শেষে তাঁর ধন-সম্পদের হিসাব করে মোট সম্পদ থেকে নিজের, স্ত্রীর, ছেলে-মেয়ে এবং অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদের দায়-দেনা বাদ দেয়। এভাবে হিসাব করে যে ব্যালেন্স পাওয়া যায় তা যদি ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপা বা ৭.৫ তোলা (ভরি) সোনার বাজার মূল্যের সমতুল্য হয় তাহলে সেই পরিমাণকে ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় নিসাব বলে। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই একজন মুসলিমকে যাকাত আদায় করতে হয়, তাই এখানে বিভিন্ন যাকাত সামগ্রীর নাম ও এগুলোর নিসাব পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

০১. শুধু স্বর্ণের নিসাব : সাড়ে সাত ভরি (তোলা) স্বর্ণ বা স্বর্ণের তৈরি অলংকার।

০২. শুধু রূপার নিসাব : সাড়ে বায়ান্ন ভরি (তোলা) রূপা বা রূপার তৈরি অলংকার।

০৩. স্বর্ণ ও রূপার একত্রে নিসাব : স্বর্ণ ও রূপা উভয় জিনিসই যদি কারও নিকট থাকে এবং এর কোনটাই নিসাব পরিমাণ নাও হয়; তবে উভয়টির মূল্য হিসেব করে দেখতে হবে। মূল্য যদি একত্রে রূপার নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, অর্থাৎ ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়ে যায়, তবেই যাকাত আদায় করতে হবে।

০৪. হাতে নগদ বা ব্যাংকে মজুদ অর্থের নিসাব : ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপার মূল্যের সমান।

০৫. ব্যবসায়ী পণ্যের নিসাব : কোন জিনিস বা পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে রাখা হলেই তাকে ব্যবসায়ী পণ্য মনে করা হবে। এক্ষেত্রে ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান মূল্যমান সম্পন্ন ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত দিতে হবে। বছরান্তে তখনকার বাজার দর হিসেবে মূল্য ধরতে হবে। খরিদ মূল্য ধরলে তা শুদ্ধ হবে না।

০৬. গরু ও মহিষের নিসাব হলো ৩০টি। এর কমে যাকাত নেই।

০৭. উটের নিসাব ৫টি।

০৮. ছাগল ও ভেড়ার নিসাব ৪০টি।

০৯. খনির উৎপাদন যে কোন পরিমাণ।

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে

০১. সোনা-রূপাঃ সোনার তৈরী অলংকার সাড়ে সাত তোলা (ভরি) আর রূপার তৈরী অলংকার সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) পরিমাণ (খাত ছাড়া) মজুরীসহ মোট মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

০১.১ সোনা বা রূপার অলংকার, বাসন, পাত্র ও কারুকার্য খচিত মোহর ইত্যাদি সবকিছুর উপরই যাকাত দিতে হবে। তবে নিসাব পরিমাণ হতে কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

০১.২ যদি কারোর নিকট সোনা বা রূপার তৈরী অলংকার কোনটিই নিসাব পরিমাণ না থাকে বরং কিছু সোনার অলংকার আর কিছু রূপার অলংকার থাকে এক্ষেত্রে যদি উভয়টির মূল্য এক সাথে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার মূল্যের সমান (বাজারে প্রচলিত দাম অনুসারে) হয়ে যায়; তবে যাকাত ফরয হবে। আর যদি সোনা ও রূপা উভয় অলংকারই পূর্ণমাত্রায় থাকে তাহলে মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন নেই বরং সোনা ও রূপা প্রত্যেকটির যাকাত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে।

০১.৩ যদি কারোর নিকট সাড়ে সাত তোলা (ভরি) সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপা থাকে; অতঃপর বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই আরো ৫/৬ তোলা (ভরি) সোনা এবং ১০/১৫ তোলা (ভরি) রূপার অলংকার কেনা হল বা উপহার হিসেবে পাওয়া গেল; তো এক্ষেত্রেও এটাই মনে করতে হবে যে, ঐ পুরো সোনা বা রূপার বৎসরই অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ যাকাত নির্ধারণ করার সময় পুরো সোনা বা রূপার উপরই যাকাত নির্ধারণ করা ফরয। কেউ যদি মনে করে পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত সোনা বা রূপার সময়তো এক বছর অতিক্রম করে নাই এক্ষেত্রে যাকাত দেব কেন তাহলে সে নির্ঘাৎ পাপগ্রস্ত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন পরিবারে পুরো এক বছর সময়কাল ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা বা সমমূল্যের সোনা বা রূপার অলংকার আছে। এদিকে বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র ৫/৬ দিন পূর্বে ঐ পরিবারে ৮০,০০০ (আশি হাজার) টাকা বা সমমূল্যের সোনা বা রূপার অলংকার ক্রয় করা বা উপহার

হিসেবে আসল তাহলে সম্পদের মালিককে পুরো ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উপরই ২,৫০০ (আড়াই হাজার) টাকা যাকাত দিতে হবে।

০২. নগদ অর্থঃ হাতে নগদ অর্থ এবং ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত অর্থ যখন সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার বাজার মূল্যের সমপরিমাণ পূর্ণ বছর ধরে জমা থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

০২.১ বাংলাদেশে ২০ জানুয়ারি ২০০৮ বাজার দর অনুসারে সোনার তোলা (ভরি) ২৩,৮০০ টাকা আর রূপার বাজার দর ৫৫০/- টাকা। এক্ষেত্রে কারোর নিকট যদি বৎসরান্তে এক তোলা (ভরি) সোনা আর নগদ ৫,০৭৫ টাকা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

কেননা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার মূল্য ২৮,৮৭৫ টাকা। এখানে এক তোলা সোনার বাজার দর ২৩,৮০০ টাকা আর নগদ ৫,০৭৫ মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হওয়ায় অবশ্যই ঐ মালিককে যাকাত আদায় করতে হবে।

০২.২ বাংলাদেশে বর্তমান বাজার দর অনুসারে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার মূল্য ২৮,৮৭৫ টাকা হওয়ায় এ পরিমাণ নগদ অর্থ বছর শেষে কারোর হাতে জমা থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে লাভ বা বিদেশে কর্মরত সন্তান বা ভাই, স্বামী যদি পূর্ববর্তী ২৮,৮৭৫ টাকার যাকাত বৎসর পূর্ণ হওয়ার কয়েক দিন পূর্বেও টাকা পাঠায় তা যে কোন পরিমাণই হোক না কেন তা সহ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এখানে এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, এ টাকা তো পূর্ণ এক বছর আমার হাতে জমা নেই, কেন যাকাত দেব। বরং তাকে মনে রাখতে হবে সে আগে থেকেই ২৮,৮৭৫ টাকা পূর্ণ বছরে ধরে থাকার কারণে যাকাত দাতাদের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং এখন অতিরিক্ত আরও যে পরিমাণ টাকা বিদেশ থেকে তার হাতে আসল এতে তো সে আরো বেশি সম্পদশালী হলো। এইজন্য তাকে সব টাকার উপরই যাকাত দিতে হবে।

মূলকথা হলো বছরের মাঝে সম্পদ বা নগদ টাকা বাড়া-কমার দ্বারা যাকাতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। বরং বছর শেষে যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকবে ঐ পূর্ণ সম্পদের উপরই যাকাত হবে।

০৩. সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ডের যাকাতঃ সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড ইত্যাদির বিনিময় মূল্যও নগদ অর্থের ন্যায় বলে এগুলোর উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

০৪. ডিপোজিট স্কিম বা দীর্ঘস্থায়ী জমাঃ বিভিন্ন সুদী ব্যাংকে ডিপোজিট স্কিম নামে স্থায়ী বা মেয়াদী হিসাবে ১০ বছর ধরে যে পরিমাণ টাকা জমা করা হয়

তার উপর অর্জিত সুদ দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করার পর মূল টাকার উপর যাকাত দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ১০ বছর মেয়াদে প্রতি মাসে ১,০০০/২,০০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা করে তাহলে ঐ ২৮,৮৭৫ টাকা অর্থাৎ ২৯,০০০ টাকা জমা হয়ে গেলেই সে নিসাবের মালিক হবে। তখন থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এখানে ১০ বছর মেয়াদ শেষে ১,০০,০০০ টাকা হাতে আসা জরুরী নয়। বরং এ জাতীয় অর্থ মালিকের দখলে আছে বলে গণ্য হবে।

যদি কেউ ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকে ৫ বা ১০ বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করে তাহলে প্রতি বছর মূল টাকার যাকাত দিয়ে যেতে হবে। মেয়াদ পূর্তি হওয়ার পর লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হিসাব শেষে যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পাবে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

০৫. যৌথ মালিকানাধীন মালের যাকাতঃ কোন মালের একাধিক মালিক থাকলে এবং তাদের প্রত্যেকের অংশ পৃথকভাবে চিহ্নিত বা বণ্টিত না থাকলে এই মালকে যৌথ মালিকানাধীন মাল বলে। যৌথ মালিকানাধীন মালের যাকাতের ক্ষেত্রে একক মালিকানাধীন মালের যাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে (বাদাই ২ : ২৮)। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, মালিকগণের যাকাত ফরয হবার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকলে (অর্থাৎ সবাই বালিগ ও মুসলিম হলে) তাদের যৌথ সম্পত্তির যাকাত যৌথভাবে আদায় করা যাবে। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, যাকাত দেবার ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একীভূত এবং একীভূত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড শেয়ার হোল্ডারদের যৌথ সম্পত্তি। এই ফান্ডের উপর যাকাত আরোপে তিনটি বাধা রয়েছে। যেমন: শেয়ার হোল্ডারদের ভেতর অমুসলিম থাকতে পারে; নাবালেগ ও পাগল থাকতে পারে, থাকতে পারে এমন লোকও যার উপর যাকাত ফরয নয়। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে এবং পাকিস্তানে সরকারীভাবে রিজার্ভ ফান্ড থেকে যাকাত উসূল করা হচ্ছে। পাকিস্তানের যাকাত অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, যাদের উপর যাকাত ফরয নয় তাদের অংশ দান হিসেবে গণ্য হবে। ফকীহদের মতামত এ ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে কাজ করেছে এবং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মত ছিল এর ভিত্তি।

০৬. তৈজসপত্র, অলংকার, বাড়ি-ঘরঃ সংসারের কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, বিছানাপত্র, পোশাক-আশাক ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে অলংকারপত্রের যাকাত দিতে হবে। মূল্যবান পাথর যেমন হীরক, মণিমুক্তা ইত্যাদির তৈরি অলংকারের উপর

যাকাত ধার্য হবে না। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা ও যানবাহনের উপরও যাকাত ধার্য হবে না। তবে এগুলো ভাড়ায় খাটানো হলে এর অর্জিত আয় মালিকের অন্য আয়ের সাথে যুক্ত হবে এবং যথানিয়মে এর উপর যাকাত ধার্য হবে।

(ইসলামের যাকাত বিধান, ১ : ৫৪২)

০৭. বন্ধকী মালের যাকাতঃ বন্ধকী মাল বন্ধকমুক্ত হয়ে মালিকের দখলে ফিরে আসার পর এর উপর যাকাত ফরয হবে। (যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান, ই.ফা.প. জুলাই-সেপ্টেম্বর, ৫৪ পৃ.)

০৮. ঋণ ও যাকাতঃ ঋণমুক্ত হওয়া যাকাত ফরয হবার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। ঋণের অংক বিয়োগ করার পর নিসাব পরিমাণ মাল না থাকলে যাকাত ফরয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, কোন ব্যক্তির গৃহীত ঋণ নিসাব পরিমাণ হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। প্রদত্ত ঋণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাবার পর এর যাকাত দিতে হবে। (আল মুহাল্লা, ২য় খণ্ড, ১০১)

যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই, কখনো সে ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে অতীতের তো নয়ই– এমনকি ফেরত পাবার বছরেরও যাকাত দিতে হবে না বরং পরবর্তী বছর থেকে তার যাকাত দিতে হবে (ইসলামের যাকাত বিধান)। ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ের জমি, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি ও পণ্য ক্রয় করা হলে কেবল পণ্য ক্রয় বাবদ যতটুকু ঋণ খরচ হয়েছে তা থেকে ততটুকু বিয়োগ করার পর যাকাত ধার্য হবে।

০৯. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতঃ ব্যবসার নিয়াতে উৎপাদিত বা ক্রীত পণ্য দ্বারা বাস্তবে ব্যবসায় কার্য সম্পাদিত হলে ঐ পণ্যকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে। অতএব ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়ের পর তা দিয়ে ব্যবসা করার নিয়াত করলেই তা ব্যবসায়িক পণ্য হবে না, যতক্ষণ না এর সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম যুক্ত হয়। (আল-বাদাই, ২ : ১২)

ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত ফরয, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। আল্লাহ পাক বলেন :

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"

(সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন : "তোমরা তোমাদের চেষ্টা-সাধনায় যা উপার্জন কর– তা ব্যবসা হোক, শিল্প হোক, স্বর্ণ-রৌপ্যভিত্তিক কারবার হোক, তা থেকে যাকাত দাও। আবু বাকর জাসসাস ও ইবনুল আরাবীর মতে, তোমরা যা উপার্জন কর তা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন বোঝানো হয়েছে (ইসলামের যাকাত বিধান, ১ : ৩৮৪–৫)। হাদীস দ্বারাও তা সমর্থিত।

জমহুর ফকীহদের মতে, যাকাত ফরয হওয়াকালে প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিরূপিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যে পদ্ধতিতে মূল্য নিরূপিত হলে গরীব-দুঃখীরা অধিক লাভবান হবে সেই অনুযায়ী মূল্য ধার্য করা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বছর শেষে হিসাব করার দিনের বাজার মূল্যের হিসাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে হবে (বাদাই, ২ : ২১)। ব্যবসায়িক পণ্যের হিসাব স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য হলে তার প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়ের কেবল আবর্তনশীল মূলধনের যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যবসায়ের স্থাবর সম্পত্তি, যেমন দালান-কোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। পণ্যদ্রব্য রাখা বা পরিমাপের পাত্রের উপরও যাকাত হবে না। (ইসলাম কা কানূন মাহাসিন, পৃ. ৯৬–৭)। মসজিদ-মাদরাসা বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। যেসব মালের উপর সাধারণত যাকাত ধার্য হয় না সেসব মাল ব্যবসায়িক পণ্য হলে তার উপর যাকাত দিতে হবে। যেমন পাথর, হিরক, মণি-মুক্তা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, কাঠ, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি। যাকাতের হিসাবকালে মোট সম্পত্তি থেকে ঋণের মতই স্ত্রীর দেনমোহর ও খোরপোষ বাবদ প্রাপ্য এবং সরকারকে দেয় বকেয়া খাজনা বাদ দিতে হবে। (আল-বাদাই, ২ : ৬–৭)

১০. খনিজ সম্পদঃ খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই। খনি যদি ব্যক্তি মালিকানায় থাকে সম্পদ উত্তোলনের পরই হিসাব করে এর যাকাত দিতে হবে। তবে খনি সরকারী মালিকানায় থাকলে এর যাকাত দিতে হবে না। খনিজ সম্পদে যাকাতের হার হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগ। খনিজ সম্পদের বেলায় এক বছর অতিবাহিত হবার শর্ত নেই। কৃষি ফসলের ন্যায় যখন সম্পদ তোলা হবে তখনই ২০% ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

১১. গরু-মহিষঃ (ক) গরুর নিসাব ত্রিশটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য হবে–

০১. ৩০টি গরুর যাকাত একটি তাবীআহ (এক বছর বয়সের ১টি এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর);

০২. ৪০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ (পূর্ণ দু' বছরের একটি বাছুর);
০৩. ৬০টি গরুর যাকাত দুইটি তাবীআহ;
০৪. ৭০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবীআহ;
০৫. ৮০টি গরুর যাকাত দুইটি মুসিন্নাহ;
০৬. ৯০টি গরুর যাকাত তিনটি তাবীআহ;
০৭. ১০০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ ও দুইটি তাবীআহ;
০৮. ১১০টি গরুর যাকাত দুইটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবীআহ;
০৯. ১২০টি গরুর যাকাত তিনটি মুসিন্নাহ অথবা চারটি তাবীআহ;
১০. গরুর সংখ্যা ১২০-এর অধিক হলে (১) হতে (৯)-এ বর্ণিত নিয়মে যাকাত প্রদেয় হবে।

(খ) মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে।

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব সংখ্যক গরু বা মহিষ না থাকলে কিন্তু গরু ও মহিষের সমন্বয়ে নিসাব পূর্ণ হলে ০১ হতে ১০-এ বর্ণিত নিয়মে যাকাত প্রদেয় হবে।

১২. ছাগল-ভেড়াঃ (ক) ছাগল-ভেড়ার নিসাব চল্লিশটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য হবে।
০১. ৪০টি হতে ১২০টি ছাগলের যাকাত একটি বকরী;
০২. ১২১টি হতে ২০০টি ছাগলের যাকাত দুইটি বকরী;
০৩. ২০১টি হতে ৩৯৯টি ছাগলের যাকাত তিনটি বকরী;
০৪. ৪০০টি হতে ৪৯৯টি ছাগলের যাকাত চারটি বকরী;
০৫. ৫০০টি হতে ৫৯৯টি ছাগলের যাকাত পাঁচটি বকরী;
০৬. অতঃপর প্রতি ১০০টি ছাগলের যাকাত একটি বকরী;

(খ) ভেড়ার যাকাত ছাগলের যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে এবং যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়াকে একই শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হবে।

১৩. উটঃ উটের নিম্নতম নিসাব পাঁচটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য হবে–
০১. ৫ হতে ৯টি উটের যাকাত ১টি বকরী;
০২. ১০ হতে ১৪টি উটের যাকাত ২টি বকরী;
০৩. ১৫ হতে ১৯টি উটের যাকাত ৩টি বকরী;
০৪. ২০ হতে ২৪টি উটের যাকাত ৪টি বকরী;

০৫. ২৫ হতে ৩৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে মাখাদ (পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৬. ৩৬ হতে ৪৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে লাবূন (পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৭. ৪৬ হতে ৬০টি উটের যাকাত একটি হিক্কাহ (তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৮. ৬১ হতে ৭৫টি উটের যাকাত একটি জাযাআহ (চার বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৯. ৭৬ হতে ৯০টি উটের যাকাত দুইটি বিনতে লাবূন;

১০. ৯১ হতে ১২০টি উটের যাকাত দুইটি হিক্কাহ;

১১. উটের সংখ্যা ১২০টির অধিক হলে প্রতি ৪০টির জন্য একটি বিনতে লাবূন অথবা প্রতি ৫০টির জন্য একটি হিক্কাহ।

১৪. ঘোড়াঃ হযরত উমার (রা.) ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর আগে ঘোড়ার উপর যাকাত ছিল না। ঘোড়া যদি যানবাহন, বোঝা বহন বা জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা না হয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হলে প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার বেশি হলে, তার উপর শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

১৫. লব্ধ গুপ্তধনঃ এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, "ওয়া ফির রিকাযিল খুমুস" অর্থাৎ লব্ধ গুপ্তধন থেকে শতকরা ২০ ভাগ যাকাত পরিশোধ করতে হবে। খনিজ সম্পদের ন্যায় গুপ্তধনেরও কোন নিসাব নেই এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই।

যাকাতের সম-সাময়িক মাসায়েল

০১. শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতির যাকাত : ১৯৬২ সালে দামেস্কে আরব রাজাদের উপস্থিতিতে সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হয়। উক্ত রিপোর্ট প্রণেতাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগের প্রধান ছিলেন। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী আধুনিক বিশ্বে আরো কয়েক প্রকার বস্তুর উপর যাকাত আদায় করার বিষয়ে সবাই একমত হন। সেগুলোর একটি হলো শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতি। তাঁদের মতে যন্ত্রপাতি উৎপাদনশীল হলে তার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। কারণ যন্ত্রপাতির মালিক তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে পারে বিধায় যাকাত প্রদান করা ফরয।

এখানে যন্ত্রপাতি বলতে হাতুড়ি বা লাঙ্গলের কথা বলা হয়নি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল না বলে এর উপর যাকাতের বিধানও প্রযোজ্য হয়নি। কিন্তু বর্তমান যুগে ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে চিন্তা করলে শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতির উপর অবশ্যই যাকাত হবে। তাছাড়া একথা তো আমরা সকলেই জানি, আধুনিক যন্ত্রপাতি বহুলাংশেই স্বয়ংক্রিয় এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয় বিবেচনা করেই দামেস্কের এ বৈঠকে সবাই আজকের শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৫% হারে যাকাত প্রদানের জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করেন।

০২. শিল্প-কারখানার উৎপাদন উপকরণের যাকাত : বড় বড় উৎপাদনশীল শিল্প কারখানা রয়েছে যেগুলোতে উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত পর্বে বিক্রির জন্য প্রস্তুত হতে কয়েক দিন সময় লাগে। এবার প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রতি বছর যে তারিখে তাঁর সহায়-সম্পত্তির যাকাত হিসাব করেন ঠিক ঐ তারিখে তাঁর শিল্প-কারখানায় যে সকল মাল প্রস্তুত আছে, যেগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে, এখন হয়তো চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত শেষ হয়নি, পণ্য প্রস্তুত করার জন্য যা যা মজুদ আছে যাকে কাঁচামাল বলা হয় ইত্যাদি সবকিছুর ঐ তারিখে মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

মোটকথা নগদ টাকা, যার মধ্যে ব্যাংক-ব্যালেন্স, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রো-মেন্টস, বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত তৈরি মাল, কাঁচামাল, তৈরির পথে অবস্থানরত মাল সবই একত্রে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

০৩. বাড়ি ভাড়া ও ফ্লাট বিক্রির ব্যবসা : আজকাল শহর বা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় অনেকে নিজেরা বাড়িতে বসবাসের পরও ভাড়া প্রদান করে থাকে। এ বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ যদি নিসাবের বেশি হয় তাহলে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় অনেকে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক বা অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির ভবন নির্মাণ করে থাকে। এতে সুবিধা হলো বাড়ি নির্মাণে ব্যাংক ঋণ থাকলে সরকারী কর কম ধার্য হবে। এরপর বাড়ি ভাড়ার আয় থেকে ব্যাংক লোনের টাকা বাদ দিয়ে বছর শেষে আরও ঘাটতি থাকায় বলে আমি যাকাত দিব কিভাবে? আমার তো ব্যাংক ঋণ আছে। আমিতো ঋণী। না পাঠক! যাকাত দরিদ্রের হক, আল্লাহর হুকুম। এ হক আদায়ে আর আল্লাহর হুকুম পালনে এমন ছল-চাতুরী বা চাতুর্যপূর্ণ আচরণ করা ঠিক হবে না। কারণ মানুষ না জানলেও আল্লাহ তো সব জানেন এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। যাকাত আদায়কারী বা মানুষকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাহকে

ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় যখন নিসাব পরিমাণ হবে তখন তার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

অন্য দিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাড়ি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো না। তখন বাসস্থান ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান মাত্র। মক্কা-মদীনার পাশে আজকাল হাজীদের বাড়ি ভাড়া নেয়ার মত ঘটনা যদি তখন ঘটত তাহলে অবশ্য তখনই বাড়ি ভাড়ার মাধ্যমে আয়ের উপর যাকাত আদায় করা হতো। তখনকার সময়ে এমন বাড়ি ভাড়ার ঘটনা ছিল না বলে বাড়ির উপর যাকাত ছিল না। একই সাথে বাড়িতে দালান-কোঠা, গোডাউন, গাড়ি, গ্যারেজ ভাড়া দেয়ার রেওয়াজও তখন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাড়িতে ভবন নির্মাণ, দোকান, গোডাউন, গ্যারেজ লাভজনক বিনিয়োগে রূপ নিয়েছে বলেই এগুলোর উপর যাকাত আরোপ করা উচিত।

এমনকি আধুনিক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শালের মতে, জমির যেরূপ খাজনা দিতে হয় তদ্রূপ বাড়ি নির্মাণেও খাজনা দিতে হয়। এই দৃষ্টিতে বাড়ি ভাড়ার অবশ্যই যাকাত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এমনকি একটি জমিতে চাষাবাদ করলে যে ফসল হয় তার চেয়ে আজকাল এক কাঠা জমিতে বাড়ির ভবন নির্মাণ করলে বেশি মুনাফা হয়। সুতরাং বাড়ি নির্মাণ জমি চাষের তুলনায় বেশি লাভজনক বিধায় এর উপর ৫% হারে যাকাত প্রদান করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। এক্ষেত্রে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরের বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে যাকাত বাধ্যগতভাবে আদায় করা উচিত।

পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা বা যৌথভাবে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তির মালিকানাধীন জমিতে অত্যাধুনিক সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অত্যাধুনিক অফিস ভাড়া, বসবাসের উপযোগী ফ্ল্যাট ভাড়া ও বিক্রয় সহ গ্রাউন্ড ফ্লোর, আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে সুসজ্জিতভাবে গ্যারেজ ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে। এ সকল ভবনগুলো অত্যন্ত আধুনিক ও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ অনেক উঁচু উঁচু ভবন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এ ধরনের ব্যবসা খুব জমজমাট এবং সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে। এতে প্রচুর লাভ। সুতরাং এতে যাকাত ধার্য করা আবশ্যক।

০৪. গাড়ি : আগের দিনে নিজেদের ব্যবহার উপযোগী বা চলাচল উপযোগী গাড়ীর উপর যাকাত ধার্য হওয়ার বিধান ছিল না। কিন্তু আজকাল এক শ্রেণীর সম্পদশালী মানুষ আছে যাদের গাড়ি কয়েকটি অর্থাৎ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের

জন্য আত্মীয়দের সাথে খাপ খাইয়ে চলাফেরা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে এক ধরনের হাই-ফাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত গাড়ি সব সময় গ্যারেজে রেখে দেয়া; বছর বছর বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি ছয়-নয় মাস পর-পর গাড়ির মডেল পরিবর্তন করা; কোটি টাকা দামের গাড়ি ব্যবহারে আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি সবগুলো নমুনা নিত্য ব্যবহার্য গাড়ির ধরন ব্যক্ত করে না। বরং সবগুলো ধরন অপচয় বা বেশি সম্পদশালী হওয়ার সুবাদে নিজেদের উচ্চ আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে করা হয়ে থাকে– যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। যাকাত আদায়ের বিধান এমনটির উপরেও আসতে পারে। অবশ্য যদি এতগুলো গাড়ি বৈধ অর্থে কেনা না হয় তাহলে অবৈধ অর্থের উপর আবার যাকাত ধার্য হবে না। কারণ যারা আল্লাহর বিধান লংঘন করে মানুষের হক হরণের মাধ্যমে গাড়ি কিনে তারা আর আল্লাহর আদেশ যাকাতকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে কী করে!

অন্যদিকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের দ্রুত ছুটে চলার তাকিদে যানবাহন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হওয়ায় ট্যাক্সি ক্যাবসহ সিএনজি গাড়ি ভাড়া বা গাড়ি চালিয়ে আজকাল প্রচুর অর্থ আয় করা যায়। ফলে গাড়ি আজকাল ব্যবসার পণ্য বা সম্পদ হিসেবে পরিচিত। তাই গাড়ি যদি একান্তই নিজেদের চলাচলের জন্য না হয়ে ভাড়ার জন্য হয় তবে অবশ্যই ভাড়া থেকে যে আয় হয় তা নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত প্রদান করা আবশ্যক।

০৫. সরকারী কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাকাত : সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনশীল কল-কারখানা যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন অংশীদারীত্ব ছাড়া একক সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এতে যাকাত ফরয হবে না। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান ৫১ ভাগ সরকারী মালিকানা আর বাকী ৪৯ ভাগ ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয় এতে শুধু ব্যক্তি মালিকদের ৪৯ ভাগের উপর যাকাত ফরয হবে। সরকারী ৫১ ভাগের উপর যাকাত ফরয হবে না। এখানে বলে রাখা ভাল, ব্যক্তি মালিকগণ তাদের অংশের যাকাত একত্রে আদায় করতে পারেন অথবা নিজ নিজ অংশের যাকাত পৃথকভাবেও আদায় করতে পারেন।

অন্যদিকে সরকারের মালিকানা নেই এমন প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানী, একক বা যৌথভাবে অনেক মালিকের মালিকানায় পরিচালিত হলেও যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক হবে। এমন ক্ষেত্রে এ কোম্পানীর মালিকেরাও যৌথভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে যার যার যাকাত আদায় করতে পারবে।

০৬. শেয়ারের ক্ষেত্রে যাকাত : আধুনিক অর্থনীতিতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় একটি সুপরিচিত নাম। শেয়ার হলো পাবলিক ও প্রাইভেট লিঃ

কোম্পানীর মূলধনের বিভিন্ন অংশের উপর মালিকানা অধিকার। একটি প্রতিষ্ঠানের মোট অনুমোদিত মূলধনকে মোট শেয়ার দ্বারা ভাগ করে শেয়ারের একক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে এ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ বা চট্টগ্রাম শেয়ার বাজার।

বড় বড় ব্যাংক, শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের শেয়ার বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়ার পর ক্রেতা সাধারণ দু'টি উদ্দেশ্যে ঐ শেয়ার ক্রয় করে থাকে :

ক. প্রাথমিকভাবে শেয়ার ক্রয় করে আবার তা শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করবে এই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তাদের ব্যবসা হলো শেয়ারগুলো নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেউ কেউ এভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকেই ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

খ. দেশে প্রতিষ্ঠিত স্বনাম ধন্য বড়-বড় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার লক্ষ্যে কেউ-কেউ শেয়ার ক্রয় করে থাকে। বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নয় বরং মূল প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হওয়া তাদের উদ্দেশ্য।

উল্লেখিত এ দু'টি ক্ষেত্রের প্রথমটিতে যে সকল ক্রেতা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে তাদের ব্যবসারূপে গ্রহণ করে এবং শুধু বিক্রয়ের জন্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকে, শেয়ারের মূল্যই তাদের ব্যবসায়ী সম্পদ তাদের ক্ষেত্রে বছরান্তে শেয়ার বিক্রয় করে যে লাভ বা মুনাফা হলো তা সহ হিসাব করে তার উপর যাকাত আদায় ফরয হবে। আর যারা মূল প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার জন্যে শেয়ার ক্রয় করে তাদের যাকাত ধার্য হবে মূল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক হিসাব করার পর। অর্থাৎ মূল প্রতিষ্ঠানের কারখানা, মেশিনারী, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ইত্যাদির মূল্য বাদ দিয়ে নগদ সম্পদ ও লাভের অংশ হিসাব করে নিজেদের শেয়ার অনুপাতে যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় সে পরিমাণ সম্পদে যথা নিয়মে যাকাত ফরয হবে। তবে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দালান কোঠার উপর যাকাত ফরয হবে না।

০৭. বন্ডের ক্ষেত্রে যাকাত : ব্যাংক, ডাক বিভাগ, বিভিন্ন কোম্পানী বা সরকার প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি বা দলীল পত্রই বন্ড নামে পরিচিত। এ বন্ড ধারক নির্দিষ্ট তারিখ শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়ার অধিকারী হয়।

তবে বাংলাদেশে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থনীতি নির্ভর ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড এবং অনৈসলামিক বীমা কোম্পানীর শেয়ার বাবদ প্রাপ্ত লাভ সুদ হিসেবে গণ্য বিধায় সরাসরি হারাম ও অবৈধ। আর তাই এ

লাভের অংশ হারাম ও অবৈধ হওয়ার কারণে এর পুরোটাই সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দরিদ্র ফকীর-মিসকীনদের দান করে অথবা জনহিতকর কাজে ব্যয় করে দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

অন্যদিকে এ সকল বন্ডের ক্রয়কৃত মূল্য তথা আসল ও মূলধনের উপর যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে।

০৮. হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে যাকাত : পোলট্রি ফার্মে মুরগীর ঘর, মৎস্য চাষে মাছের পুকুর এবং এতদসংশ্লিষ্ট সাজ-সরঞ্জামে যাকাত নেই। মুরগী কিংবা মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করার সময় যদি সেগুলোকে বিক্রি করার নিয়াত থাকে তাহলে সেগুলোর বিক্রয়জনিত মূল্যের উপর বছরান্তে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। আর যদি ওগুলোকে বিক্রি করা না হয় এবং ওগুলোর ডিম ও বাচ্চা বিক্রির নিয়াত না থাকে তবে সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং আয়ের উপর বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

মাছ কিংবা মাছের পোনা ক্রয় করে পুকুরে ছাড়লে এগুলো বিক্রি করার নিয়াত থাকলে এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। আর সেগুলোর ডিম বা পোনা বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের নিয়াত না থাকলে সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। আয়ের উপর বছর শেষে নিয়মানুযায়ী যাকাত ফরয হবে।

০৯. বাড়ি-ঘরের আসবাবপত্রের যাকাত : বাড়ি-ঘরে সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, বিছানাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার খচিত জিনিস ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে অলংকারের যাকাত আদায় করতে হবে। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুয যাকাত)

মূল্যবান পাথর যেমন– হীরক, মণিমুক্তা ইত্যাদির তৈরি অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হবে না– এ বিষয়ে সকল মাযহাবের ফকীহগণ একমত।

(মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ১৮৭)

তাছাড়া আজকাল বহুল ব্যবহৃত ফ্রিজ, এসি ইত্যাদিও নিত্য প্রয়োজনীয় বলে যাদের সামর্থ আছে তারা ক্রয় করে থাকে। ফলে একান্ত প্রয়োজন পূরণে নিত্য ব্যবহার্য এ পণ্যের জন্য যাকাত দিতে হবে না।

এবার আরও কয়েকটি পণ্য যা নিত্য ব্যবহার্য বা জীবনের একান্ত প্রয়োজন বলে অনেকেই মানতে নারাজ। সেগুলো হলো রেডিও, টেপ, ভিসিডি, ডিভিডি, টেলিভিশন। এগুলো বিনোদনের মাধ্যম। সময় ও মন কেড়ে অন্য ভুবনে নিয়ে যথাযথ কাজে গাফেল করার যথার্থ মাধ্যম।

ইসলাম প্রিয় অত্যন্ত সচেতন কারো-কারো বাসায় এগুলোর অনুপস্থিতিও দেখা যায়।

এমন যেসব দ্রব্য যা নিত্য ব্যবহার্য নয় বা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক আসবাবপত্র নয় এগুলোর মূল্যসহ হিসাব করে বছরান্তে যাকাত প্রদান করতে হবে বলে এ যুগের নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানীও একমত।

১০. পেনশনের টাকার যাকাত : পেনশনের টাকা হাতে আসার পর থেকে প্রতি বছর এ টাকার জন্য যাকাত দিতে হবে। যতদিন সরকারের তহবিলে ছিল তত দিনের জন্য কোন যাকাত দিতে হবে না। চাকুরীজীবীরা সংসারে কিংবা চাকুরী প্রদানকারী সংস্থা বা ব্যক্তির নিজ থেকে চাকুরী বাবদ যত ধরনের আর্থিক সুবিধা পায় সেগুলো সবই তার জন্য হালাল। ফলে এর পুরো টাকার উপরই ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

১১. প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত : সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। তাই উভয়ের বিধি-বিধানেও পার্থক্য রয়েছে। সরকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে সরকার হলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে চাকরী বিধি অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ এবং তার কর্তৃত্ব থাকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের (সরকারের) হাতে। এর উপর কর্মচারীদের কোন প্রকার নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ অর্থ সরকারের কর্মচারীদের এক প্রকার ঋণ। এতে কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও মালিকানা না থাকায় তাতে যাকাত ফরয হবে না। এমনকি প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ হাতে আসার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং ভবিষ্যতে নিসাবের উপর বছর পূর্ণ হলে যাকাত ফরয হবে। কারণ ফিকহের ভাষায় এটি একটি দুর্বল ঋণ।

অন্যদিকে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ সরকারী কর্তৃত্বে থাকাকালে তা দিয়ে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে অংশগ্রহণ করে এবং এই সূত্রে বীমা কোম্পানী ঐ ফান্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাহলে বীমা কোম্পানী হবে তার উকিল। উকিলের কর্তৃত্ব গ্রহণ মূলত: ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কর্তৃত্ব গ্রহণ বিধায় ধরে নিতে হবে যে, কর্মচারীই ঐ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ঐ অর্থ নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে ঐ প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর যাকাত ফরয হবে।

আবার কেউ কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে এককালীন টাকা উঠিয়ে এনে ব্যবসায় খাটিয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রেও ঐ ব্যবসার আয় বছরান্তে নিসাব পরিমাণ হলে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

এবার যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড একটি পৃথক বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়; আর সে বোর্ডে কর্মচারীদের প্রতিনিধি থাকে। এই বোর্ড যেহেতু কর্মচারীদের উকিল বা প্রতিনিধি সেহেতু বোর্ড কর্তৃক ঐ অর্থ গ্রহণ করা মূলত: কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করা। সুতরাং এ রকম প্রভিডেন্ট ফান্ডে যথানিয়মে বছরান্তে যাকাত আদায় করতে হবে।

১২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিক্রির জন্য যে পণ্য রাখা হয় তার যাকাত : ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা দোকানে যে পণ্য বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে বা ডেকোরেট করা আছে ঐ পুরো পণ্যের উপর যাকাত দেয়া ফরয। এবার প্রশ্ন আসতে পারে এ সকল পণ্যের যাকাত নির্ধারণে কোনটি ধরা হবে? খুচরা বিক্রির মূল্য; নাকি পাইকারী মূল্য।

এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্যের যাকাত হিসাব করার সময় যে সকল পণ্য বর্তমান থাকে সেগুলোর পাইকারী বিক্রয় মূল্য ধরে হিসাব করে তার মোট মূল্যের উপর ২.৫% হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

১৩. ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স (বীমা)-এ জমাকৃত অর্থের যাকাত : ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্ট হলো ব্যবসায়ী কোম্পানী। সাধারণত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে এগুলো গঠিত হয়। শুধু সরকারী উদ্যোগে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশীদারীত্বে এগুলো পরিচালিত হয়। যে সকল ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স শুধু সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোতে যাকাত ফরয হবে না। কারণ সরকার কোন ব্যক্তি সত্তা নয়। শুধু বেসরকারী অংশীদারিত্বে গঠিত ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে অংশীদারদের অংশ অনুপাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। তবে ইচ্ছা করলে সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে যাকাত আদায় করার এখতিয়ার আছে।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স-এ সরকারী অংশে যাকাত ফরয হবে না। শুধু বেসরকারী অংশীদারদের অংশ অনুপাতে তাদের অংশে যাকাত ফরয হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)

ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স যদি সুদভিত্তিক হয় তবে সেগুলোর লেনদেন ও আয়-উপার্জন হারাম। হারাম মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাকাতও ফরয হয় না। বরং সম্পূর্ণ মাল সাদাকা করে দেয়াই আবশ্যক। বিনিয়োগকৃত হালাল পুঁজিতে যাকাত ফরয হবে। হালাল ও হারাম মাল মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার পর উভয়টিকে পৃথক করার কোন অবকাশ না থাকলে তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যাকাত ফরয হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

১৪. হজ্জ, বিবাহ-শাদী, পড়ালেখার জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত : হজ্জ, বিয়ে-শাদী, পড়ালেখা বা যে কোন উদ্দেশ্যে কেউ তার অর্থ-সম্পদ যে কোন স্থানে স্বনামে বেনামে জমা রাখলে উক্ত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে এর উপর যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে এ মালের যাকাত আদায় করতে হবে।

১৫. বেনামী সম্পদের যাকাত : রাষ্ট্রীয় কর থেকে বাঁচার জন্যে কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অন্যের নামে সম্পদ ক্রয় কিংবা জমা রাখা হলেও তাতে মূল মালিকের মালিকানা বাতিল হয় না। সুতরাং এই বেনামী সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তার উপরেও যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে তা আদায় করতে হবে।

১৬. সিকিউরিটি মানি বা জামানতের টাকার উপর যাকাত : সিকিউরিটি মানি বা জামানতের টাকা জমাকৃত ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নিকট মালিকের ঋণরূপে গণ্য হবে। তাই মালিকের কাছে ফেরত আসার আগেও প্রতি বছর যথানিয়মে তাতে যাকাত ফরয হবে। অবশ্য মালিকের হাতে আসার পূর্বে যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়। বরং হস্তগত হওয়ার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। যদি হস্তগত হওয়ার পূর্বে অন্য খাত থেকে উক্ত যাকাত আদায় করে দেয় তবে তা আদায় হবে। যদি ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তাহলে এ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

১৭. হারাম উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদের যাকাত : চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, জুয়া, দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদে মূলত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না বিধায় ঐ মালে যাকাত ফরয হয় না। বরং ঐ মাল তার প্রকৃত মালিকের নিকট অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। যদি মালিক বা তার ওয়ারিশদের সন্ধান পাওয়া না যায় তবে উক্ত মাল সাদাকা করে দিতে হবে। কিন্তু এতে সাওয়াবের নিয়াত করা যাবে না।

হারাম মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না, কারণ তার সবটাই সাদাকা করে দেওয়া ফরয। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

কিন্তু হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ যদি ব্যক্তির হালাল সম্পদের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে হারাম মালে সেই ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাতে যাকাত ফরয হবে এবং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। আর যদি পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে হারাম মাল পৃথক করার পর হালাল মাল নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে যে সকল সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

০১. জমি।

০২. মিল-ফ্যাক্টরি, ওয়্যার হাউজ ও গুদাম ইত্যাদি।

০৩. দোকান।

০৪. বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি।

০৫. এক বছরের কম সময়ের গবাদি পশু।

০৬. ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক।

০৭. বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী।

০৮. গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্ট্যাম্প।

০৯. অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

১০. গৃহপালিত সকল প্রকার মোরগ-মুরগী ও পাখি।

১১. কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী।

১২. চলাচলের জন্তু ও গাড়ি।

১৩. যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম।

১৪. যাকাত বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরের মধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ।

১৫. দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত।

১৬. সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য সম্পদ।

উপরন্তু মূল্যবান সুগন্ধি, মণিমুক্তা, লৌহবর্ম, প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে আহরিত দ্রব্য সামগ্রীর উপর যাকাত নেই। যে সমস্ত পশু বহন ও বাহন ভাড়ায় খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হয় না। যেমন পুরাতন ঢাকায় চালিত ঘোড়ার গাড়ির যাকাত নেই।

যাকাত প্রদানের তারিখ

যাকাত প্রদানের জন্য শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন তারিখ নির্ধারিত নেই। এমন কোন সময়ও নির্ধারিত নেই যে, সে তারিখ বা সময়েই যাকাত আদায় করতে হবে। তবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাতের আসল তারিখ হচ্ছে, যে তারিখ বা দিনে

মানুষ প্রথমবার সাহেবে নিসাব হবে সে তারিখ থেকে গণনা শুরু করে পরবর্তী বছরের ঐ তারিখে পূর্ণ বৎসর ধরে যাকাত পরিশোধ করে দেয়া।

এখানে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা যায় এভাবে– মনে করুন, কোন ব্যক্তি রামাদান মাসে তার সমুদয় সম্পদ হিসাব করে দেখল তার কাছে যাকাত দেয়ার মত সম্পদ গচ্ছিত আছে, তাহলে সে যাকাত পরিশোধ করবে মাহে রামাদানের দ্বিতীয় দশ দিনের মধ্যে। এখন ভবিষ্যতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যদি তাকে সম্পদ দেন তাহলে তার যাকাত হিসাব করে ঠিক সে বছরগুলোতেও রামাদানের দ্বিতীয় দশ দিনের (বরকতের) মধ্যে পরিশোধ করে দেয়া উত্তম হবে। এছাড়া অন্য কোন তারিখ বা মাসকে প্রতি বছরই পর্যায়ক্রমে যাকাত প্রদানের দিন ধার্য করা ঠিক হবে না।

কেননা আজকাল অনেকেই যাকাতের হিসাব-নিকাশের জন্য ইংরেজি তারিখ বা সৌরবর্ষের তারিখকে নির্ধারণ করে থাকে। অথচ ইংরেজি বর্ষ বা সৌর বর্ষের সাথে চন্দ্র বর্ষের বা হিজরী বর্ষের তারিখ গণনায় ১১ দিনের তারতম্য রয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজি বর্ষ বা সৌর বর্ষ বা সূর্য বর্ষ গণনা করা হয় ৩৬৫ দিনে আর চন্দ্র বর্ষ বা হিজরী বর্ষ গণনা করা হয় ৩৫৪ দিনে। সুতরাং কেউ যদি যাকাতের অর্থ হিসাব করতে এক মাহে রামাদান থেকে আরেক মাহে রামাদান ধরে তাহলে তা চন্দ্র বর্ষের হিসাব অনুযায়ী সঠিক। কারণ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করেই বিশ্বের সকল দেশে মুসলিমগণ রামাদান মাসে সিয়াম পালন শুরু করে। এখন প্রতি বছর ঘুরে আসা অর্থাৎ ইংরেজী বর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখি সিয়াম ১১ দিন এগিয়ে আসে। গত বছর ঠিক যে মাসে যে তারিখে শুরু হয়েছিল এবার ঠিক সে মাসের সেই তারিখে শুরু হয়নি তার আগে শুরু হয়েছে।

অবশ্য যদি কেউ ইংরেজি বছর ধরে যাকাত হিসাব করতে চায় তাহলে তাকে ইংরেজি ও হিজরী বর্ষের ব্যবধান ১১ দিনের জন্য ৩% অতিরিক্ত টাকা হিসাব করে দিতে হবে। হিসাবটি হবে এমন– মনে করুন, কারোর ইংরেজি বর্ষ অনুযায়ী যাকাত হলো– ১,০০,০০০/- টাকা। এবার হিসাব শুদ্ধ তথা হিজরী সাল অনুসারে অতিরিক্ত ১১ দিনের জন্য ঐ ১,০০,০০০/- টাকার উপর আরো ৩% হিসাব করে ৩,০০০/- টাকা যোগ করে ১,০৩,০০০/- টাকা যাকাত প্রদান করলেই তা শুদ্ধ হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
উশর কী

গরীব মুসলিমদের সাহায্যার্থে ইসলামী শরীয়াত জমির উৎপাদিত ফসল ও বাগানে উৎপাদিত ফল-ফলাদির উপর যে দেয় ধার্য করেছে তার নাম উশর।

বস্তুত আরবি আশারা (عشرة) শব্দ হতে উশর (عشر) শব্দের উৎপত্তি। আশারা অর্থ দশ এবং উশর অর্থ এক দশমাংশ। জমিতে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হয়। তাই ফসলের যাকাতকে 'উশর' নামকরণ করা হয়েছে। নগদ অর্থ, সোনা-রূপা, গবাদি পশু ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত প্রদান যেমন বাধ্যতামূলক, জমি হতে উৎপাদিত ফসলের উশর প্রদানও তদ্রূপ ফরয।

উশর ফরয হওয়ার শর্ত

জমিতে উৎপাদিত শস্যের উপর উশর (যাকাত) ফরয হওয়ার শর্ত চারটি:

০১. মুসলিম হওয়া, কাফির বা অন্য মতাবলম্বীদের উপর উশর ফরয হয় না।

০২. ভূমি উশরী হওয়া।

০৩. ভূমিতে উৎপাদিত ফসল হওয়া।

০৪. উৎপাদিত ফসল এমন হতে হবে যা এ জাতীয় ভূমি হতে সচরাচর উৎপাদন করা হয় এবং যা দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে থাকে। উশর ফরয হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া এবং নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া শর্ত নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস সানায়ে ১ম খণ্ড)

যে সকল ভূমির ফসল বৃষ্টি বা বর্ষার পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয় পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চন করে নয় সেসব ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ আদায় করা ফরয। অর্থাৎ দশ মণ শস্য উৎপাদিত হলে এক মণ হবে উশর। আর যে সব ভূমির ফসল পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদন করতে হয় সেসব ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা ফরয। অর্থাৎ বিশ মণ শস্য উৎপাদন হলে এর বিশ ভাগের এক ভাগ এক মণ দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন :

عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন ঃ যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ফরয হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ফরয হবে।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৮৭)

উশর ফরয হওয়ার কুরআন ভিত্তিক দলিল

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى حميد

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যে মাল তোমরা কামাই করেছ এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি তা থেকে যা ভালো তা আল্লাহর পথে খরচ কর। তাঁর পথে দেওয়ার জন্য খারাপের চেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না। অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাকে দেয় তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হবে না। অবশ্য তোমরা যদি নেবার সময় লক্ষ্য না কর তাহলে আলাদা কথা। তোমাদের জানা উচিত, কারো কাছে আল্লাহর কোন ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।"

(সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

উল্লেখিত আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বক্তব্য হচ্ছে : ঈমানদার লোকদের উপার্জন অবশ্যই পবিত্র এবং হালাল হতে হবে। সে উপার্জন দু' প্রকার :

এক. দৈহিক শ্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে। দুই. আল্লাহ জমির ফসল হিসেবে যা কিছু দান করেন। জমির ফসল লাভেও মানুষের শ্রম অপরিহার্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা নিছক শ্রম নিয়োগ করেই

লাভ করা যায় না। এমনও হতে পারে যে, মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে জমিতে বীজ বপন করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীজ থেকে চারা গাছ উৎপন্ন হলো না, ফসল ফলল না অথবা ফসল ফলল কিন্তু তা পোকায় খেয়ে ফেলল বা বন্যা, খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং বীজ দীর্ণ করে অংকুরোদগম হওয়া ও ফসল ধরা, ভালভাবে এ ফসল পরিপক্ক হওয়া এসব একান্তভাবে আল্লাহর কুদরত ও মেহেরবাণী। সেজন্য এ আয়াতে জমির ফসলকে বিশেষভাবে আল্লাহর উৎপাদন বলা হয়েছে। এ দু' প্রকারের উৎপাদন থেকেই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে।

এ আয়াতের প্রথম অংশের দ্বারাই মানুষের যাবতীয় উপার্জনের উপর যাকাত ফরয প্রমাণিত হয়েছে। গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু ও নগদ সম্পদের ন্যায় ভূসম্পত্তির ফসল ও পণ্যদ্রব্যের উপরও যাকাত ফরয। আর আয়াতের 'তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু উৎপাদন করেছি'– এ অংশ থেকে জমির ফসলের জন্য যাকাত বা উশর দেয়া ফরয প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ উশর দিতে হবে এবং উশর বাবদ মন্দ ও নিকৃষ্ট ফসল দেয়া যাবে না।

واية لهم الارض الميتة احيينها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون - وجعلنا فيها جنت من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون - لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون - سبحن الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون

"এই লোকদের জন্য নিষ্প্রাণ জমিন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা একে জীবন দান করেছি, এ হতে ফসল বের করেছি যা তারা খেয়ে থাকে। আমরা এতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছি, এর মধ্য হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি। যেন তারা এর ফল খেতে পারে। এই সবকিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়। তা হলে এরা কেন শোকর আদায় করে না?

পবিত্র মহান সেই সত্তা! যিনি সবকিছু জোড়া জোড়া পয়দা করেছেন, তা জমিনের উদ্ভিদই হউক অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি (অর্থাৎ মানুষ জাতি) হউক কিংবা সেইসব জিনিস যাহা তারা জানেও না।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৩–৩৬)

والارض مددنها والقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل شيء موزون - وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزقين - وان من شيىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم

"আমরা জমিনকে বিস্তৃত করেছি, এতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, এতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথভাবে মাপ-জোপ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি এবং এতে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যও, আর সেই অসংখ্য মাখলুকের জন্যও, যাদের রিযকদাতা তোমরা নও। কোন জিনিসই এমন নেই যার অফুরন্ত ভাণ্ডার আমাদের নিকট বর্তমান নেই। আর যে জিনিসকেই আমরা নাযিল করি, এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি।" (সূরা আল-হিজর : ১৯-২১)

وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

"আর তিনিই এ জমিনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন; এতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে রেখেছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকমের ফল-ফলাদির জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে প্রবর্তিত করেছেন। এই সমস্ত জিনিসেই বহু ও বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে।" (সূরা আর-রাদ : ৩-৪)

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উশর প্রদানের আদেশ দিয়ে অন্যত্র আরো বলেন :

وهو الذى انشأ جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

"তিনিই আল্লাহ, যিনি নানা প্রকারের লতা, গুল্ম, যা ঝাঁকা দিয়ে উচুতে তুলে রাখা হয় এবং যার জন্য তা করতে হয় না, যা নিজ কান্ডের উপর দাঁড়ায়, এইরূপ

বৃক্ষরাজি সম্পন্ন বাগান রচনা করেছেন; যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়; যিনি যাইতুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন– যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সদৃশ হলেও বিভিন্ন স্বাদ সম্পন্ন। তোমরা এ সবের ফল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ কর যখন তা থেকে ফল ও ফসল আসে। আর তা কাটাই-মাড়াই করার দিন তার উপর ধার্য আল্লাহর হক দিয়ে দাও। তোমরা অবশ্যই অপচয় করবে না; কেননা আল্লাহ্ অপচয়কারীদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনআম : ১৪১)

এখানে "আর তা কাটাই-মাড়াই করার দিন তার উপর ধার্য আল্লাহর হক দিয়ে দাও" এ আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে যে, জমির ফসল উৎপাদন ও আহরণ করার সময় এর একটা নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর হক হিসেবে আদায় করা ফরয এবং কাটার ও আহরণের সময়ই এ হক আদায় করা ফরয হয়ে যায়। এরই নাম উশর।

হযরত ইবনুল আব্বাস (রা.), ইবনে জরীর তাবারী, আল্লামা জামাখশারী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবনে কাসীর, আল্লামা আবু বকর জাসসাস, ইমাম সুয়ূতী, আল্লামা মাহমূদ আলুসী প্রমুখ বিখ্যাত তাফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেছেন।

উশরের হাদীসভিত্তিক দলিল

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীসেও কৃষিজ ফসল ও ফলের উৎপাদনের নিসাব পূর্ণ হলে উশর ফরয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন :

فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر

"বন্যা ও বৃষ্টির পানিতে যে জমিন সিঞ্চিত হয় তাতে উশর ধার্য হবে। যে জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর ধার্য হবে।"

(জামে আত্-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৫৯৩)

অন্য হাদীসে আছে–

عن ابى سعيد قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

"আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার (সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ভরি) কমে রূপার যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের) যাকাত নেই।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩১৪)

উশরের নিসাব

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে ফসল কাটার পরই যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত পরিশোধ করা ফরয। এক্ষেত্রে ফসল এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই। এ কারণে একই জমিতে বছরে যদি কয়েকবার ফসল উৎপাদিত হয় তবে প্রতিবারই আলাদা আলাদাভাবে সেই ফসলের উশর বা অর্ধ উশর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর ফসলের নিসাব পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত (উশর বা অর্ধ উশর) দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আউশ মওসুমে ধান যদি ২০ মণ হয় তাহলে এর উশর দিতে হবে না; কিন্তু আমন মৌসুমে যদি ৩০ মণ হয় তাহলে তার উশর ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। অনুরূপভাবে কলাই যদি ২৬ মনের কম হয় তাহলে এর উশর দিতে হবে না। এমনিভাবে পাট, সরিষা, মধু ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকার ফসলের নিসাব পৃথকভাবে ধরতে হবে।

উশর বা অর্ধ উশর যেহেতু প্রত্যেক ফসল তোলার সময়ই দিতে হয়, সেহেতু উশর বা অর্ধ উশরের ক্ষেত্রে ঋণমুক্ত হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়; বরং উশর আগে দিতে হবে এরপর ঋণ পরিশোধের প্রশ্ন। উশরের ক্ষেত্রে জমির মালিক হওয়ার শর্তও নেই; কেবল উৎপাদিত ফসলের মালিক হলেই উশর বা অর্ধ উশর পরিশোধ করতে হবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। যদি কোন মুসলিম জমি ইজারা বা ভাড়া বা লীজ নিয়ে অথবা ভাগাভাগির ভিত্তিতে জমি আবাদ করে, কিংবা যদি ওয়াকফের জমিতে ফসল উৎপাদন করে, আর যদি তার প্রাপ্ত ফসল নিসাব পরিমাণ হয় তাহলেই তাকে উক্ত ফসলের উশর বা অর্ধ উশর পরিশোধ করতে হবে।

কৃষি ফসলের নিসাব সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে :

عن ابى سعيد قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের মধ্যে) কোন যাকাত নেই।

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩১৪)

حدثنا هارون بن سعيد المصرى ابو جعفر ثنا ابن وهب اخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى نصف العشر

সালিম (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত জমিনের ফসলের উশর (এক দশমাংশ) এবং পানি সেচ দ্বারা সিক্ত জমিনে উৎপন্ন ফসলে অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৮১৭)

উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী পাঁচ উকিয়া হল তৎকালীন দু'শ দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান। আর পাঁচ ওয়াসাক আমাদের দেশীয় পরিমাণে কত মণ বা কেজি হবে সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। তবে এ সম্পর্কে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে, পাঁচ ওয়াসাক = ৯৪৮ কেজি বা কিলোগ্রাম। সুতরাং আমাদের দেশীয় ওজনে এটাই ফসলের নিসাব হতে পারে। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে, পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হবে।

কৃষিজ ফল ও ফসলের উশর

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে, উশরী জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসল যথা ধান, গম, যব, পাট, সরিষা, কলাই, বুট, বীজ, সুপারী, নারিকেল, ইক্ষু, খেজুর, আম, কলা, পেয়ারা, লিচু, কাঠাল, আনারস ইত্যাদির উপর উশর ফরয। আর এটাই হলো জমিনের যাকাত। এমনিভাবে পাহাড়ী গাছের ফল-ফলাদির উপরও উশর ফরয। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম নিজের বাড়ি বা বাড়ির আঙ্গিনা বা কোন কবরস্থানকে বাগান বানালে ঐ বাগান যদি উশরী পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তবে বাগানের ফল-ফলাদির উপর উশর ফরয হবে। বাড়িতে উৎপাদিত ফল-ফলাদির উপর উশর ফরয হয় না।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড)

উশরী জমির ফসল যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কারণবশত নষ্ট হয়ে যায় তবে উশর মাফ হয়ে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড)

মধুর উশর

উশরী জমি থেকে মধু সংগ্রহ করা হলে তাতে উশর ফরয হবে।
(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া ২য় খণ্ড)

হাদীসে আছে :

حدثنا احمد بن ابى شعيب الحرانى نا موسى بن اعين عن عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء هلال احد بنى متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غيث ياكله من شاء

"আহমদ ইবনে আবু শুআইব (রা.) আমর ইবন শুআইব (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআনের সদস্য হিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট সালবা নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন খালীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবনে ওয়াহাব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমার (রা.) তাঁকে লিখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ(সা.)কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালবা

উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬০০)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে মধুতে উশর আদায় করার জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। কম-বেশী যাই হোক উশরী জমি হতে তা সংগ্রহ করা হলে তাতে উশর ফরয হবে। (আল-হিদায়া ২য় খণ্ড)

শাক-সব্জির উশর

উশরী জমি থেকে উৎপাদিত শস্য যথা শাক-সব্জি, তরি-তরকারী ইত্যাদির উপর উশর ফরয। বৃষ্টি বা কুদরতী পানি দ্বারা শাক-সব্জি আবাদ হলে এক দশমাংশ (উশর) আদায় করতে হবে। আর বালতি-ডোল, কলসি, পাম্প ইত্যাদি দ্বারা পানি সেচ করে আবাদ করা হলে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফ) উশর আদায় করতে হবে।

অন্যদিকে আখরোট এবং বাদামের উপরও উশর ফরয হবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড)

ইজারা দেয়া জমির ফসলের উশর

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উশরী জমি ইজারা (ভাড়া) দেয়া হয় তবে ঐ জমির উৎপাদিত ফসলের উপর উশর ফরয হবে এবং ইজারাদাতা মালিক তা আদায় করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে ইজারা গ্রহণকারীর উপর তা আদায় করা ফরয হবে। আর যদি ফসল কাটার পূর্বেই ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে ইজারা দাতার উপর উশর ফরয হবে না এবং যদি ফসল ফলার পর তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইজারাদাতা ব্যক্তিকে উশর আদায় করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কোন অবস্থাতেই উশর ফরয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

ওয়াকফকৃত জমির ফসলের উশর

ওয়াকফকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের উপরও উশর ফরয। কেননা উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং উৎপাদিত ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। কারণ উশর ফসলের উপর ফরয হয় জমির উপর নয়।

(বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)

ভাগচাষ, আরিয়াহ ও অবৈধ দখলী জমির উশর

ভাগচাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও ফসলের মালিক তথা ভাগচাষী উৎপাদিত ফসল ভাগ করে নেয়ার পর নিজ নিজ অংশ মুতাবিক উশর প্রদান করবে।

আরিয়াহ মানে ধার। ধার নিয়ে কেউ যদি কারোর জমিতে ফসল উৎপাদন করে তাহলে সে উৎপাদিত ফসলের উপর আরিয়াহ গ্রহীতা উশর প্রদান করবে।

কোন ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে কোন জমি দখল করে, সেটা হতে পারে জোর-জবরদস্তি বা এমনিতেই দখল করা যা অবৈধ বলে গণ্য, এমন জমিতে যদি চাষাবাদ করে তাহলে যে ফসল উৎপাদন হবে তার উপর উশর প্রদান করতে হবে।

যৌথ মালিকানাভুক্ত জমির উশর

ইজমালী জমি বা যৌথ মালিকানাভুক্ত কোন জমিতে যদি শস্য চাষাবাদ করা হয় তাহলে সে জমিতে উৎপাদিত শস্য শরীকগণের মধ্যে বণ্টন করার পর প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ নিসাব সমপরিমাণ হলে উশর প্রদান করতে হবে।

আবার কোন ব্যক্তির বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাঠে জমি থাকলে এবং ওগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকেও উশর প্রদান করতে হবে।

যেসব শস্যে উশর নেই

যাকাত মুক্ত সম্পদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহনের জন্য পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফসলমূহ যা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্পদিনে বিনষ্ট হয়ে যায়; যথা আম, পেঁপে, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ও লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই।" (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে আত-তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত)

অন্যদিকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশ ব্যতীত অন্য সমস্ত শস্যাদি, তরি-তরকারি ও ফলসমূহের যাকাত প্রদান করতে হয়। যাহোক, আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে যে সকল শস্যকে উশর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে:

০১. ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য।

০২. বপণ করার জন্য সংরক্ষিত বীজ।

উশর বাধ্যতামূলক হওয়ার পর রহিত হওয়ার বিধান

কোন ব্যক্তি বা কৃষকের উপর উশর প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ার পর নিম্নোক্ত যে কোন কারণে তা রহিত হতে পারে। যেমন:

০১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণে জমির ফসল নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেলে।

০২. উশর দাতা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে।

০৩. উশর দাতা ফসল নষ্ট বা ধ্বংস করে ফেলার পর উশর প্রদানের অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলে তার উপর উশর রহিত হয়ে যায়।

উশরী জমির পরিচিতি

উশরী জমিতে কৃষকগণ যে শস্য চাষ করে তার থেকেই উশর দেয়া ফরয। আর তাই উশরী জমির পরিচয় আমাদের জানা উচিত। উশরী জমির পরিচয় হলো:

০১. কোন এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মালিকানাধীন জমি উশরী হবে।

০২. মুসলিম যোদ্ধাগণ কোন অমুসলিম এলাকা দখল করার পর সরকার তা মুসলিমগণের মধ্যে বণ্টন করলে উক্ত জমি উশরী হবে।

০৩. কোন মুসলিম ব্যক্তি সরকারের অনুমতি নিয়ে অনাবাদী জমি আবাদ করলে এবং তা উশরী ভূমির নিকটতর হলে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

০৪. মুসলিম ব্যক্তি তার বসতবাড়িকে কৃষি জমিতে পরিণত করলে এবং তা উশরী পানি দ্বারা চাষাবাদ করলে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

০৫. খারাজী জমি উশরী পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হলে তা উশরী জমি হিসাবে গণ্য হবে।

০৬. উশরী জমি বংশ পরম্পরায় উশরীই গণ্য হবে।

০৭. কোন মুসলিম ব্যক্তি ক্রয়সূত্রে জমির মালিক হলে তা উশরী গণ্য হবে।

০৮. কোন মুসলিম ব্যক্তির যে জমি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না যে, পূর্বে তা খারাজী জমি ছিল না উশরী জমি ছিল, সে ক্ষেত্রে উক্ত জমি উশরী গণ্য হবে।

বাংলাদেশের জমি কী উশরী

একটি দেশের জমি উশরী না খারাজী তা পর্যালোচনা করার যে শর্তসমূহ রয়েছে তার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জমিতে শরয়ী খারাজ নেই,

কোনদিন ছিল কিনা তাও বলা যায় না। তাই এদেশে মুসলিমদের কোন জমি এখন খারাজী বলে প্রমাণিত হয় না। আর খারাজী প্রমাণিত না হলে তা উশরী বলেই গণ্য হবে এবং উশর দিতে হবে। মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত ও অধিকৃত জমি একবার উশরী বলে গণ্য হলে তা তাদের দখলে থাকা পর্যন্ত উশরীই থাকে। সরকার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য হয় না। কারণ উশর কোন রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক ধার্য কর নয়। যাকাত ও উশরকে মহান আল্লাহ ইবাদাত হিসেবে ফরয করেছেন। তাই কোন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর আদায় করা হলে যাকাত ও উশর কোনটাই আদায় হয় না, বরং উভয়ই ফরয হিসেবে বলবৎ থাকে।

এই মৌলিক নীতিমালার আলোকে এবার বাংলাদেশের মুসলিমদের জমি-জমা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা একটা স্বত:সিদ্ধ ব্যাপার যে, মুসলিমগণ এদেশকে জয় করেছিলেন এবং মুসলিম বাদশাহগণ এ দেশের জমি মুসলিমদেরকে দান করেন। এ ছাড়া মুসলিমগণ এদেশের বহু অনাবাদী জমি চাষাবাদ করেছেন।

আবার মুসলিম অভিযানকালে বহু এলাকার অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেসব জমিকে উশরী বলে অবশ্যই গণ্য করা উচিত। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমগণ বাংলা বিজয় করেন। সুতরাং ১২০৩ থেকে এ পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ধারাকে নিম্নরূপ কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়– ১২০৩ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত দিল্লীর মুসলিম বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদারদের শাসন ১৩৭ বছর; ১৩৪০–১৫৭৬ পর্যন্ত স্বাধীন মুসলিম সুলতানগণের শাসন ২৩৬ বছর; ১৫৭৬ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত দিল্লীর মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৮১ বছর; ১৭৫৭–১৯৪৭ পর্যন্ত বৃটিশ শাসন ছিল ১৯০ বছর; ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান আমল; ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ আমল।

বাংলাদেশ ১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ছিল মুসলিম শাসকদের অধীনে। প্রায় ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ হতে এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এ আলোকেই বিচার করতে হবে বাংলাদেশের ভূমি উশরী নাকি খারাজী।

ক. বাংলাদেশ মুসলিমদের জয়ের পূর্বে বা পরে এদেশের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মালিকানাধীন জমি উশরী।

খ. যুদ্ধে জয়ের পর মুসলিম শাসকগণ বিজিত এলাকার যেসব জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করেছেন ওসব জমি উশরী।

গ. ওয়াকফকৃত জমি এবং মুসলিম সরকার আলিম-উলামা ও পীর-আউলিয়াকে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমতের জন্য যেসব জমি দান করেছেন সেসব জমি উশরী।

ঘ. মুসলিম সরকার এদেশে কোন জমিকে ইসলামের বিধান মুতাবিক খারাজী বলে ঘোষণা করেছেন কিনা, করলে তা কোন্ কোন্ এলাকার জমি তার কোন প্রমাণ নেই। অতএব বর্তমানে পৈত্রিক সূত্রে যেসব জমি মুসলিমদের মালিকানাধীন আছে সেসব জমি উশরী। যেসব জমি কোন অমুসলিম থেকে কোন মুসলিম খরিদ সূত্রে বা অন্য কোন বৈধ উপায়ে মালিক হয়েছেন, কেবল সেসব জমি খারাজীরূপে গণ্য হবে। তবে মধ্যস্বত্ব ভোগী জমিদার, তালুকদার থেকে নেয়া বা পাওয়া জমির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

ঙ. এদেশের সব জমি বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ারও কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য পরাজিত রাজা ও তার সামন্তদের ব্যক্তিগত জমিগুলো কোথাও কোথাও মুসলিম সরকারের কব্জায় রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছ. বিজিত এলাকার জমির সাবেক মালিকদের মালিকানা পূর্বের ন্যায় বহাল রেখে সমস্ত জমির উপর মুসলিম সরকার খারাজ আরোপ করেছেন। কোন মুসলিম শাসক এদেশের জমির মালিকদের তাদের জমির মালিকানা ভোগ দখল, হস্তান্তর বা বেচাকেনা থেকে বেদখল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তাই বাংলাদেশের জমির অবস্থা বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের জমির অনুরূপ। (অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৪০-৪১)

সুতরাং বাংলাদেশের জমি ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী উশরী। কেননা এদেশের জমির পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া যায়। যেমন–

০১. মুসলিম বাদশাহর সময় থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি।

০২. বাদশাহী আমলের ওয়াকফকৃত জমি।

০৩. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি, কিন্তু তা বাদশাহী আমল থেকে নয় এবং কিভাবে অধিকারে এসেছে তা জানা যায় না।

০৪. যেসব জমি মুসলিমগণ খরিদ করেছেন অথবা দান কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে পেয়েছেন। আর যারা বিক্রি বা দান করেছেন কিংবা অসিয়ত করেছেন তারাও মুসলিমদের কাছ থেকেই হাসিল করেছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

০৫. এমন জমি যা মুসলিমদের কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে এবং উপরের দিকে খোঁজ করে জানা যায় না যে, মুসলিমদের বাদশাহর পক্ষ থেকে তা দেয়া হয়েছে।

০৬. এমন জমি যা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের মালিকানায় আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত অবস্থা জানা যায় না যে, লোকেরা কিভাবে এ জমি হাসিল করেছে।

০৭. এমন জমি যা ইংরেজ সরকার কোন মুসলিমকে দিয়েছে কিন্তু তা প্রথমে কার ছিল তা জানা যায় না।

০৮. এমন সব অনাবাদী জমি যা মুসলিমগণ আবাদ করেছেন এবং তা কারও দখলে ছিল না।

০৯. মুসলিমগণ নিজেদের বাসস্থানের যেসব জমি আবাদ করেছেন। (সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলী, উশর, পৃ. ০৭)

তাই উল্লেখিত আলোচনা-পর্যালোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদেশে মুসলিমদের কোন জমি সাধারণত খারাজী হওয়ার সম্ভাবনা কম। বস্তুত আজ থেকে প্রায় আটশত বছর পূর্বে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী প্রায় বিনা যুদ্ধে এদেশ দখল করে নেন।

তখন এদেশের বহু অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়। এ দীর্ঘ পরিক্রমায় এদেশে বহু বিপ্লব ও পরিবর্তন, উত্থান-পতন ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময়ে এদেশের জমি সম্পর্কে আইন-কানুন জারী হয়েছে।

এখন দেশের প্রত্যেকটি জমি সম্পর্কে সেই সময়কার সঠিক অবস্থা এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের জমি সম্পর্কে সাধারণ অবস্থার আলোকেই আলিমগণ নিজেদের মতামত পেশ করেছেন। যেমন–

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র.) বলেছেন, "যে সব জমি সম্পর্কে এরূপ যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায় না যে, প্রথমে এসব জমির মালিক ছিল অমুসলিমগণ, পরে তাদের থেকে খরিদ বা অন্য কোন সূত্রে মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে, সেসব জমিকে ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী বর্তমানে জমি যে অবস্থায় আছে তারই আলোকে প্রথম থেকেই মুসলিমদের মালিকানা ধরে উশরী বলা যাবে।

তিনি আরও বলেছেন– "ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন মুসলিমদের মধ্যে বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব জমির মালিকানা চলে আসছে এবং কোনো অমুসলিম মালিক থেকে তা খরিদ করার কোনরূপ তথ্য ও দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই, ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী বর্তমান মালিকানার কী অবস্থা সে মুতাবিক সেসব জমির প্রথম মালিক মুসলিমদেরকেই মনে করতে হবে।

যদিও সে অঞ্চলের সাধারণ জমিসমূহের উপর প্রথম বিজয়কালে সাবেক মালিক অমুসলিমদের মালিকানা বহাল রাখা হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধ আছে। কেবল একমাত্র এ কারণে বর্তমান কোন মুসলিমদের মালিকানাধীন জমির মালিকানাকে সন্দেহযুক্ত বলা যেতে পারে না।

(মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, পৃ. ১৭৭–৭৮)

অবশ্য এর সম্ভাব্য কারণ অনেক। এসব কারণের মধ্যে এটাও হতে পারে যে ভূখণ্ডটি অনাবাদী, পতিত ও লাওয়ারিশ ছিল, তাই তা বাইতুল মাল অর্থাৎ

সরকারের খাস জমির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরে বাইতুল মালের তরফ থেকে জায়গীরদারী হিসাবে কিংবা সমমূল্যে বিক্রির মাধ্যমে কোন মুসলিমই হয়ত এ জমির প্রথম মালিক হয়ে গিয়েছে। (অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পৃ. ৪৩)

এছাড়া ইসলামী বিজয়ের পর সরকারের অনুমোদনক্রমে যেসব জনপদ ও শহর গড়ে উঠে সেসব স্থানের ভূমির মালিক অনাবাদী জমি আবাদ নীতি অনুযায়ী মুসলিমরাই ছিল। প্রাকৃতিক নদ-নদী পানি দ্বারা এসব জমি সেচ কাজ হয়ে থাকলে ইমাম আবু হানীফার (র.) মতে, এগুলো উশরী জমিরূপে গণ্য হবে।

(মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, পৃ. ১৭৮)

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেছেন- বর্তমানে যেসব ভূমি মুসলিমদের থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় মুসলিমদের নিকট হস্তান্তর হয়েছে, এসব ভূমির সবই উশরী ভূমি হবে। মাঝপথে যদি কোন অমুসলিম এ ভূমির মালিক হয়ে থাকে তবে তা উশরী ভূমি হচ্ছে না। আর যেসব ভূমির অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানার উপায় নেই এবং বর্তমানে তা মুসলিমদের কাছেই রয়েছে অবস্থার তাকিদে বুঝতে হবে যে, মুসলিমদের কাছ থেকেই তা লাভ হয়েছে। এ ভূমিও উশরী ভূমির অন্তর্ভুক্ত হবে। (এমদাদুল ফাতওয়া, ১ম পরিশিষ্ট, পৃ. ৫০)

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আলী বলেছেন- মুসলিমদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উশরী গণ্য করাই ঠিক। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে একথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, তা প্রথমে উশরী কী খারাজী ছিল, সে জমি উশরী গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। (সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আলী, উশর, পৃ. ১১)

উপরোক্ত যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের জমির উপর কোনরূপ শরয়ী খারাজ বর্তমানে নেই এবং কোনদিন ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানাও যায়না। কাজেই এদিক থেকেও এদেশে মুসলিমদের কোন জমি এখন খারাজী বলে প্রমাণিত হয় না। আর খারাজী বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জমি উশরী বলে পরিগণিত থাকবে এবং উশরও দিতে হবে।

উশরী পানি

উশরের পরিমাণ যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত পানি ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থব্যয়ে মানুষ দ্বারা পানি সিঞ্চন করার উপর নির্ভর করে তাই যথাযথভাবে উশর প্রদানের লক্ষ্যে উশরী পানি সম্পর্কে কৃষকের জানা প্রয়োজন।

উশরী পানি বলতে বুঝায়, উশরী জমিতে সঞ্চিত বৃষ্টির পানি, উশরী জমিতে অবস্থিত কূপ ও পুকুরের পানি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন খাল-বিল, নদ-নদী ও সমুদ্রের পানিকে উশরী পানি বলে।

এসবের পানি দিয়ে যখন জমিতে শস্য চাষ করা হবে তখন জমিতে উৎপাদিত ফসল নিসাব পরিমাণ হলে তার এক দশমাংশ পরিমাণ ফসল (উশর) হিসেবে কুরআনুল কারীমের সূরা তাওবার ৬০তম আয়াতে বর্ণিত ৮টি খাতের লোকজনদেরকে প্রদান করতে হবে। নতুবা সে কৃষক আল্লাহর আদালতে গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে, আর দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত সরকার থাকলে দেশীয় আইনেও দণ্ডনীয় অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

অন্যদিকে যদি কৃষক অর্থব্যয়ের মাধ্যমে পানি সিঞ্চন করে শস্য উৎপাদন করে থাকে তাহলে সে জমিতে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ উশর) প্রদান করবে।

উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য

আজকাল কম-বেশি মানুষ যাকাতের সাথে পরিচিত। নিসাব পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে থাকলেই তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

অন্যদিকে উশর হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য কৃষিজ ভূমির শস্যের উপর যে যাকাত– যা অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও উশর ও যাকাত উভয়ই পরিশোধ দীনী কর্তব্য। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে :

০১. উশর ফরয হওয়ার জন্য কোন নিসাব শর্ত নয়। উৎপন্ন শস্য কম হউক বা বেশি হউক তার উশর ফরয। অবশ্য উৎপন্ন শস্য পৌনে দুই সেরের কম হলে উশর ফরয নয় (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)। কিন্তু যাকাত সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপা বা সাড়ে সাত তোলা (ভরি) সোনার মূল্যের সমপরিমাণ সম্পদ না থাকলে ফরয হয় না।

০২. উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়িতে এনে পরিমাপ করার সঙ্গে-সঙ্গেই সে ফসলের উপর উশর দেয়া ফরয হয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এ পার্থক্যের কারণে বছরে বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে উশর ফরয হয়। (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)

০৩. উশর ফরয হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। কিন্তু উশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হয়। (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)

০৪. উশর ফরয হওয়ার জন্য সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (আকেল ও বালিগ হওয়া) শর্ত নয়; নাবালিগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলেও উশর ফরয হয়, কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরয হয় না। (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)

০৫. উশর আদায়ের জন্য আযাদ বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং ক্রীতদাসের উৎপাদিত শস্যের উপরও উশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাতের বেলায় ঠিক এ রকম নয়। (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)

০৬. উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কারো জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল উৎপাদন করে অথবা ওয়াকফকৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে উশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত। (আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ২য় খণ্ড)

খারাজ (খাজনা) কী

খারাজ (خراج) আরবি শব্দ। এর অর্থ জমির উৎপন্ন দ্রব্য। ইসলামী সরকার নির্ধারিত রাজস্বের বিনিময়ে যে জমি কৃষকের নিকট পত্তন দিয়ে থাকেন, সে জমির রাজস্বকে খারাজ বলা হয়। অর্থাৎ খারাজ হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের পক্ষ থেকে কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত অথবা মালিকানা সূত্রে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব। সাধারণত মুসলিম কৃষকদের বেলায় উশর এবং অমুসলিমদের বেলায় খারাজ প্রবর্তন করার নিয়ম। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সরকার কর্তৃক যেসব জমির উপর খারাজ নির্ধারণ করা হবে সেসব জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর উশর দিতে হবে না। আবার যেসব জমিতে উশর নির্ধারিত হয় সেগুলোতে খারাজ দিতে হয় না।

পরিভাষায় মুসলিম শাসক কোন অধিকৃত এলাকার অমুসলিমদেরকে কর আরোপ করত নিজ-নিজ ভূমি ভোগ দখলের অনুমতি প্রদান করলে ঐ করকে খারাজ (খাজনা) বলে। আর ঐ জমিনকে খারাজী জমিন বলে।

অনুরূপভাবে কোন দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর মুসলিম শাসক ঐ দেশের ভূমি যোদ্ধাদেরকে বণ্টন না করে তা সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীদের নিজ নিজ অধিকারে ছেড়ে দিলে ঐ ভূমিও খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

(কাযী খান, ১ম খণ্ড ও জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২য় খণ্ড)

এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময় যে ভূমি কারো মালিকানাধীন ছিল না, আবাদযোগ্যও ছিল না, এরূপ ভূমি যদি মুসলিম শাসকের অনুমতিক্রমে অমুসলিম কোন ব্যক্তি আবাদ করে তবে এ ভূমিও খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

(জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২য় খণ্ড)

আবার কোন দেশ যদি সন্ধি সূত্রে মুসলিম শাসনের অধিকারে আসে এবং সে দেশের বাসিন্দাগণ যদি অমুসলিম রয়ে যায় আর সে দেশের ভূমি যদি খারাজী পানির দ্বারা আবাদ করা হয় তবে সে ভূমিও খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

(ফাতাওয়ায়ে কাযী খান, ১ম খণ্ড)

খারাজী জমির পরিচিতি

কোন ধরনের জমিকে খারাজী জমি হিসাবে গণ্য করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য খারাজী জমির পরিচয় জানা আবশ্যক। মূলত: নিম্নবর্ণিত প্রকৃতির জমিকে খারাজী জমি হিসাবে গণ্য করা হয় :

০১. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কোন এলাকা দখলের পর তথাকার জমি খাজনা প্রদানের শর্তে স্থানীয় অমুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হলে।

০২. কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করলে এবং সেজন্য তাকে জমি প্রদান করা হলে।

০৩. কোন অনাবাদী জমি কোন অমুসলিম নাগরিক সরকারের অনুমতি নিয়ে আবাদযোগ্য করলে।

০৪. কোন এলাকার অমুসলিমগণ মুসলিম সরকারের সাথে খাজনা প্রদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলে উক্ত এলাকার জমি।

০৫. অমুসলিম নাগরিকের নিকট থেকে ক্রয়কৃত মুসলিম ব্যক্তির জমি।

০৬. অমুসলিম নাগরিক কর্তৃক মুসলিম নাগরিকের নিকট থেকে ক্রয়কৃত জমি।

০৭. যে উশরী জমি খারাজী পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হয় সেই জমি।

০৮. মুসলিম ব্যক্তি তার বসত বাড়ীকে কৃষি জমিতে পরিণত করলে এবং তা খারাজী পানি দ্বারা চাষাবাদ করলে সেই জমি খারাজী জমির অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর উশর ধার্য হবে না, খাজনা ধার্য হবে।

খারাজ ও তার শ্রেণী বিভাগ

জমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্রকে প্রদত্ত অর্থ বা মালকে খারাজ বলে।

এখানে দু'টি দিক লক্ষ্যণীয়। একটি হলো জমি ভোগের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ; আরেকটি হলো জমি ব্যবহার তথা শস্য চাষাবাদের জন্য উৎপাদিত শস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে দেয় অর্থ বা মাল।

আর এভাবেই খারাজ দু' প্রকার।

০১. খারাজে ওয়াজীফা বা মুওয়াকাফ।

০২. খারাজে মুকামামা।

জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ অর্থে যে খাজনা ধার্য করা হয় তাকে খারাজে ওয়াজীফা বলে। অন্যদিকে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ হিসাবে নির্ধারণ করা হলে তাকে খারাজে মুকামামা বলে।

খারাজী পানি

খারাজী জমিতে অবস্থিত কূপ, পুকুর ও ঝর্ণার পানিকে খারাজী বলে।

অন্যদিকে যে সকল নহর বা কূপ রাষ্ট্রীয়ভাবে খনন করা হয় অথবা কোন দল নিজেদের শ্রম বা অর্থে খনন করে এবং তা তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে তবে এ সকল পানি খারাজী পানি হিসাবে গণ্য হবে।

খারাজের নিসাব ও তা ব্যয়ের খাত

সরকারী খাজনা দিলেও উশর আদায় করতে হবে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর খারাজ (খাজনা) ধার্য করা জরুরী শর্ত। অমুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমি কর (খারাজ) ধার্য করলে তাতে কোন জমি খারাজী বলে পরিগণিত হয় না। এরূপ করাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে খারাজ বলে গণ্য করা ঠিক নয়।

বাংলাদেশে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা জমির মালিকানার ভিত্তিতে হয়, ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে হয় না। তাই জমির সম্পূর্ণ খাজনা শুধু তার মালিকের কাছ থেকেই মালিকানার ভিত্তিতে আদায় করা হয়। কিন্তু যে চাষী জমির মালিক নয় তার নিকট থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় না। তাছাড়া জমিতে ফসল উৎপন্ন হোক বা না হোক সরকারী খাজনা দিতেই হয়।

কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র বা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিমদের পক্ষ থেকে খারাজী জমিতে উৎপাদিত শস্য থেকে যে খারাজ গ্রহণ করা হয় তার নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ ৯৪৮ কিলোগ্রাম বা কেজি ফসল বা এর সমতুল্য শস্য।

খারাজ থেকে অর্জিত অংশ সরকার দেশের প্রয়োজন মত যে কোন খাতে ব্যয় করতে পারে। এমনকি খারাজী ভূমির উন্নয়নের জন্যও ব্যয় করতে পারে।

আবার সরকার ইচ্ছা করলে খারাজের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে, এমনকি তা মওকুফও করে দিতে পারে।

খারাজ রহিত হওয়া

খারাজ রহিত হতে পারে যে সমস্ত যৌক্তিক কারণে তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

০১. কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা শত্রুবাহিনীর আক্রমণে ফসল নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে।

০২. জমি জলাবদ্ধ থাকায় অথবা জলমগ্ন হওয়ায় অথবা পানির অভাবে ফসল ফলানো সম্ভব না হলে।

০৩. জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অথবা লবণাক্ত হয়ে পড়ার কারণে ফসল উৎপাদিত না হলে।

উল্লেখ্য যে, ফসল উৎপাদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জমি অনাবাদি ফেলে রাখলে খারাজ রহিত হবে না। মালিক স্বেচ্ছায় ফসল ধ্বংস বা নষ্ট করে ফেললে খারাজ রহিত হবে না।

জবর দখলী ইজারা দেয়া জমির খারাজ

জবরদখলী জমি দখলদারের অধীনে থাকা অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত না হলে দখলদারের উপর খারাজ প্রদান বাধ্য করা হবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হলে মালিকের উপর খারাজ প্রদান বাধ্য করা হবে।

অন্যদিকে খারাজী জমি ইজারায় প্রদান করা হলে ইজারাদাতা অর্থাৎ জমির মালিক খারাজের দায় বহন করবে।

উশর ও জমির খাজনার মধ্যে পার্থক্য

উশর ও জমির খাজনা এক কথা নয়। উশর জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্য করা হয়। আর খাজনা জমির মালিকের উপর ধার্য করা হয়। এ অর্থে জমিতে শস্য যদি জমির প্রকৃত মালিক চাষাবাদ না করে তাহলে তাকে উশর দিতে হয় না; খাজনা দিতে হয়। আবার যে জমির প্রকৃত মালিক না হওয়া সত্ত্বেও বর্গা বা অন্য কোন শর্তে ঐ জমিতে শস্য চাষাবাদ করেছে তাকে উশর দিতে হয়; খাজনা দিতে হয় না। সুতরাং দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা বা ভূমি কর পরিশোধ করলে যেমন যাকাত আদায় হয় না তেমনি উশরও আদায় হয় না।

এখানে উশর ও খাজনা প্রসঙ্গে বুঝার সুবিধার্থে কতিপয় পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

০১. উশর জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্য করা হয়। ফলে জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়। খাজনা সরকার জমির মালিকানার ভিত্তিতে শুধু জমির মালিকের পক্ষ থেকেই আদায় করে থাকে। যে জমির মালিক নয়, তার নিকট থেকে খাজনা নেয়া হয় না।

০২. উশর জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকানার দাবীতে ফরয আর খাজনা জমির মালিকানার দাবীতে ফরয। তাই কোন মুসলিম জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন কারণে (বন্যা, খরাসহ অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) জমি থেকে ফসল না পায় তার উপর উশর ফরয হয় না। আবার কোন মুসলিম

চাষী কোন উশরী জমির মালিক না হলেও সে যদি জমি চাষ করে ফসল পায়, তবে সেই ফসলের মালিক হওয়ার কারণে উশর দান করা তার উপর ফরয হয়।

০৩. উশর কোন দেশের মুসলিম চাষীদের উপর ফরয হয়ে থাকে। খাজনা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জমির মালিকদের উপর আরোপ করা হয়ে থাকে।

০৪. উশর আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আর খাজনা দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত।

০৫. কেউ যদি মনে করে উশর দিচ্ছি খাজনা দেব না তাহলে সে যেমন অপরাধী হবে তেমনি খাজনা দিচ্ছি কিন্তু জমির মালিক কর্তৃক জমিতে শস্য চাষাবাদ করা সত্ত্বেও উশর না দিলে সেও অপরাধী হবে।

০৬. উশর দরিদ্র বা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আট শ্রেণীর লোকজনের হক।

খাজনা দরিদ্রের হক নয়, এটি সরকার নির্ধারিত; যা সকলের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত আদায় করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

যাকাত অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনে তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত উসুল ও তার বিলি-বণ্টন ব্যক্তির খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেননি। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সা.) নির্দেশ দিচ্ছেন :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان

صلوتك سكن لهم والله سميع عليم

"ওদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত-তাওবা: ১০৩)

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন :

وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام

الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عبدين

"এবং তাদেরকে করলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদাত করত।"

(সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩)

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৪১)

এ আয়াতগুলো হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর অভিপ্রায় হলো বিশ্বের সকল দেশে রাষ্ট্রই পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যাকাত আদায় করবে এবং তা যাকাতের হকদারদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছেও দেবে।

সুতরাং রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হলো কর বা ট্যাক্স আদায়ের জন্য যেমন সরকারীভাবে পৃথক একটি সংস্থা সারা বছর ধরে কাজ করছে তেমনি যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্যও একটি সংস্থা গঠন করে দেয়া। যদিও বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের যাকাত ফান্ড অর্ডিন্যান্স জারী করার মাধ্যমে একটি যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে কঠোরভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ এটা করা খুব সহজ এবং সরকারের প্রতি বছর অতিরিক্ত অর্থ বাজেটও এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ যাকাতের অর্থ থেকেই তাদের বেতন ভাতা গ্রহণ করার ঘোষণা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই করে দিয়েছেন। আর তাইতো আমরা দেখি রাসূলে কারীম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা.) সময়ে যাকাতের অর্থ, সামগ্রী ও গবাদি পশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যে আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। এরা হলো :

০১. সায়ী– গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক।

০২. কাতিব– যাকাতের হিসাবপত্র লেখার করণিক।

০৩. ক্বাসাম– যাকাত বণ্টনকারী।

০৪. আশির– যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী।

০৫. আরিফ– যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী।

০৬. হাসিব– যাকাতের হিসাব রক্ষক।

০৭. হাফিয– যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক।

০৮. ক্বায়াল– যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী।

প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে যাকাত আদায় ও বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু-সুন্দর বিন্যাস ও এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজকাল এ আধুনিকতার যুগে কর আদায়ের অফিসেও নেই।

আর তাই বলা যায়, যদি পরিকল্পিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাতের অর্থ আদায় করে আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ৮টি খাতে ব্যয় করা হয় তাহলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে ভেদাভেদ ও বৈষম্য কমে যাবে এবং এক সময় যাকাত নেয়ার মত লোকই এই বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে
যাকাতের অর্থ কোথায় দেবেন, কিভাবে দেবেন

যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিধান। দেশের সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানই যাকাতের অর্থ আদায় ও বণ্টনের জন্য দায়িত্বশীল হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম দেশেই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই। আর যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন তারা যথাযথভাবে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয় বণ্টনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। বাংলাদেশে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তাও প্রকৃত অর্থে সরকারের আওতায় যেভাবে কর আদায় করা হয় ঠিক সেভাবে যাকাত আদায়ের জন্য কোন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছেন না। ফলে যাকাতদাতাগণ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ইচ্ছামত যাকাত আদায় করে থাকেন।

কেউবা যাকাত বোর্ডের তহবিলে জমা দিয়ে থাকেন। কেউবা এনজিও'র তহবিলে জমা দিয়ে থাকেন। কেউবা ব্যক্তিগতভাবে নিকটতম প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দিয়ে থাকেন, যা নিতান্তই অপরিকল্পিত অপ্রতুল। তবে আশার কথা হচ্ছে যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহ করে পরিকল্পনা মাফিক বণ্টনের ব্যবস্থা করে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে আমার জানা মতে একটি প্রতিষ্ঠান সেটি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনের নানামুখী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সত্যিই বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হিসেবে গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধনী শ্রেণীর কাছ থেকে যাকাত যথাযথভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী আদায় ও বণ্টন সময়ের দাবী হিসেবে অর্থনীতিবিদদের কাছে আলোচিত হচ্ছে। কেননা বাংলাদেশে দু'টি শ্রেণীর বসবাস লক্ষ্যণীয়। এক. খুব ধনী; দুই. খুব দরিদ্র। অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক দিনের পর দিন ধনী হচ্ছে আরেক শ্রেণী দিন গড়িয়ে দারিদ্র্যের সাথে বসবাস করে হিমশিম খাচ্ছে। আর এ জন্যেই যাকাতকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় ও তার সুফল রাষ্ট্রের সকল যাকাত পাওয়ার উপযোগী হকদারদের হাতে পৌছিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়েই এ উপস্থাপনা।

অন্যদিকে এ দাবীর পেছনে আমাদের যৌক্তিকতা ও সৎ সাহসের যোগানদাতা হচ্ছে ইসলামের প্রথম যুগের আরব দেশের ইতিহাস, যে আরব

সমাজে যাকাতের অর্থ যথাযথ ও পরিকল্পিত বন্টনের ফলে ১৪ শত বছর পূর্বে মক্কা ও মদীনায় মরুময় পৃথিবীর অনুর্বর নিকৃষ্ট ও গরীব আরব দেশটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। একদা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কেও না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) একদিন না খেতে পেয়ে খাদ্য পাওয়ার আশায় নিজের মেয়ে ফাতিমার বাসায় যান। মেয়ের ঘরে কোন খাদ্য না থাকায় তিনি এক ইহুদীর কাছে খেজুরের বিনিময়ে বালতি দিয়ে পানি উঠাতে থাকেন। অথচ ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর যাকাত আদায় ও যথার্থ বন্টনের ফলে ঐ আরব দেশেই উমার (রা.)-এর সময়ে কোন গরীব লোক বা যাকাত গ্রহণকারী লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। বর্তমানেও বিশ্বের কয়েকটি মুসলিম দেশ যাকাতের সদ্ব্যবহার করে গরীব শ্রেণীর উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে যাকাতের পরিমাণ কত হতে পারে তার একটি সম্ভাব্য ধারণা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক. বেসরকারী এক হিসাব মতে এদেশে এখন রাজধানী শহর হতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ/বাণিজ্যিক এলাকাতে যেসব কোটিপতি বাস করে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্তত: ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশি অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুদ অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসেব করলে এবং প্রতিজন গড়ে ন্যূনতম টাকা ২.৫০ লক্ষ হিসেবে যাকাত আদায় করলে বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

খ. এদেশের ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে আদায় হতে পারে তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণত: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৩ সালে যাকাত আদায় করেছে টা. ৪.৯৬ কোটিরও বেশি। দেশে চালু অর্থ হতে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় যে নগদ টাকা জমা হয় এবং ব্যাংকগুলো তা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর অংশ মাত্র ০.৪% (অর্থাৎ প্রতি টা. ১,০০০-তে টা. ৪/- মাত্র)। এই ০.৪% অর্থ কাজে লাগিয়েই যদি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. টা. ৪.৯৬ কোটি যাকাত দিতে পারে তাহলে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর হতে হিসাব মতো ১,২৪০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, বীমা কোম্পানীগুলোকে এই হিসাবের আওতায় ধরা হয়নি।

গ. যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়াহ মুতাবিক তাদের সকলেরও যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। এরা

সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে এর পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ঘ. যারা আয়কর দিয়ে থাকে তারা সকলেই সাহেবে নিসাব। এদের একটা অংশ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলেই সঠিক হিসাব মুতাবিক যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণও শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ঙ. যেসব কোম্পানী (ঔষধ, রসায়ন, জ্বালানি, প্রকৌশল, খাদ্য, বস্ত্র, গার্মেন্টস, সিরামিক, সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি) সরকারকে আয়কর দেয় তাদেরও যাকাত দেওয়া উচিত। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। এরা যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস।

চ. যেসব মহিলা ব্যাংকের লকারে স্বর্ণ অলংকার রাখেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া এদের অধিকাংশই যাকাত আদায় করেন না।

ছ. শহরতলী ও মফস্বল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী আড়তদার হোটেল মালিক ঠিকাদারদের অনেকের মধ্যে যাকাত দেবার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ এসব ব্যক্তির অধিকাংশই সাহেবে নিসাব। এছাড়া পরিবহন ব্যবসা, ইটের ভাটা, হিমাগার, কনসালটিং ফার্ম, ক্লিনিক, বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভুক্ত। এদের যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক শত কোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জ. যারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন, যারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা রেখেছেন ও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন, যারা পোষ্টাল সেভিংস একাউন্টে মেয়াদী আমানত রেখেছেন অথবা যারা আইসিবির ইউনিট ফান্ড ও মিউচুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট কিনেছেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। এ খাত হতে বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশের ব্যাংকসমূহে ২০০২-২০০৩ সালে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭,২৫১ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪; পৃ. ২১৯)। মেয়াদী আমানত যেহেতু এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে হয়ে থাকে এবং আমানতকারী স্বেচ্ছায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই জমা রাখে সেহেতু এর যাকাত উসুল করা ফরয। এই অর্থের ২.৫% হারে যাকাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ২,১৮১ কোটি টাকার বেশি।

বাংলাদেশে প্রাপ্তব্য উশরের পরিমাণ নির্ধারণ

যেসব কৃষি জমির মালিকের নিসাব পরিমাণ ফসল হয় তাদের মধ্যে কতিপয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যরা ফসলের উশর আদায় করে না। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার দিকে তাকালে দেখা যাবে সমগ্র উত্তর অঞ্চল তো বটেই, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেও চাষাধীন জমির বৃহৎ অংশের মালিক মোট কৃষকের ১৭%–২০%। যারা ফসলের উশর আদায় করে না। এদেশের সাহেবে নিসাব পরিমাণ ফসলের অধিকারী জমির মালিক নিজ উদ্যোগেই যদি উশর আদায় করতো তাহলে এর পরিমাণ কম করে হলেও ১,০০০ কোটি টাকার বেশি হতো।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। বাংলাদেশে গত ২০০০–২০০৩ বছরে গড়ে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সেচ দেওয়া হয় গড়ে ৯৪ লক্ষ একর জমিতে যা চাষকৃত জমির ৩৫.৩০%। বিগত ২০০০–২০০৩ সালে এদেশে ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এ থেকে সেচকৃত জমির অংশ বাদ দিলে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে থেকে ক্ষুদে ও প্রান্তিক মালিক চাষী (৪০%) এবং মাঝারী চাষীদের অর্ধেককেও (২০%) যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বাকীদের (৪০%) কাছ থেকে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১ লক্ষ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন।

প্রতি মেট্রিক টন চাউলের গড় দাম টা. ১৫,০০০/- ধরলে এ থেকে উশর আদায় হবে ৭৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (মূল্যের ১০% হারে)। একইভাবে সেচকৃত জমির উৎপাদন হতে পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণীর কৃষকদের অংশ বাদ দেওয়া হলে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার মেট্রিক টন। পূর্বে উল্লেখিত মূল্য এক্ষেত্রে উশরের পরিমাণ (মূল্যের ৫% বা নিসফে উশর হারে) দাঁড়াবে ৩৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ফলে সেচবিহীন ও সেচকৃত জমির ধানের আদায়যোগ্য উশরের পরিমাণ দাঁড়াবে সর্বমোট ১,১৩১ কোটি টাকা। এছাড়া গম, আলু, আখ প্রভৃতি ফসলের উশর আদায় করলে এই পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শাহ মু. হাবীবুর রহমান "ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ" নামক বইতে "দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাত" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎস থেকে যাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ ৫,৭৯০ কোটি এবং উশরের সম্ভাব্য পরিমাণ ১,১৩১ কোটি টাকা হবে বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের সকল উৎস থেকে রাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থাপনায় যাকাত এবং গম, আলু, আখ প্রভৃতি ফসলের উপর উশর আদায় করলে এই পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

এছাড়াও গত ৯ অক্টোবর ২০০৭ দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার শেষ পাতায় ১নং কলামে "রাষ্ট্রীয় যাকাত ফান্ডে হতাশাব্যঞ্জক জমা" শীর্ষক হেড লাইনে প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় যাকাত ফান্ডে জমার পরিমাণ খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ ফান্ডে যাকাত প্রদানে তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না। ধনীদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপক কোন উদ্যোগ না থাকাই এর প্রধান কারণ। সংগৃহীত টাকা কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ ধারণা না থাকাও সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত প্রদানে মানুষের অনাগ্রহের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অথচ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাংলাদেশে যদি ঠিকমত যাকাত আদায় করা হয়, তাহলে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি হয়। আর এ পরিমাণ টাকা যদি পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করা হয় তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করা সম্ভব।

যাকাত আদায় ও তার নিয়মাবলী

নিসাব পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে থাকার কারণে তাকে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করতে হবে। এখন প্রশ্ন এ যাকাত কিভাবে আদায় করবে? প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যাকাত আদায় করা উত্তম। যাকাত পাওয়ার হকদার লোকদের নিকট যাকাতের অর্থ সরাসরি পৌঁছে দেয়া উত্তম।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

এখানে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

০১. প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যাকাত আদায় করা।

০২. যাকাতের হকদারদের কাছে যাকাতের অর্থ সরাসরি পৌঁছে দেয়া।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই আমরা দেখি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে যাকাত আদায় করা হয়। এতে যাকাত দাতার দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে যে বিষয়টি আমি বলব সেটি হলো, প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার অর্থ– যদি নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, অন্যদেরকে যাকাতদানে উদ্বুদ্ধকরণ বা অনুপ্রাণিত করার জন্য করা হয়, এক শ্রেণীর মানুষের হক পরিপূর্ণকরণে প্রতিযোগিতার মনোভাব গঠনে করা হয়, তাহলে তা হবে গ্রহণযোগ্য। যদিও এ ঘোষণার ফলে শুধু ফকিররা যাকাত নিতে আসে। অন্য যে সাত শ্রেণীর হকদার রয়েছে তারা অনেক ক্ষেত্রেই আসে না বা আসতে চায় না।

অধিকন্তু বাংলাদেশে অতীতে যাকাত ঘোষণা দিয়ে দেয়ার বাস্তবতা হলো অত্যন্ত নির্মম, হৃদয়বিদারক ও প্রাপ্য হকের কোন একটা অংশ নিতে এসে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার নামান্তর। যা মোটেই কাম্য হতে পারে না।

আবার দেয়া হয় ৫/১০/২০ টাকা করে ভিক্ষার ন্যায়। অন্য কথায় ৮০/১০০/১২০ টাকা দামের একটি সূতাবিহীন শাড়ি আর ৪০/৫০/৬০ টাকা দামের লুঙ্গি। যা পরিধান করে লজ্জা নিবারণ বা বস্ত্র পরিধান করার মূল উদ্দেশ্য কতটুকু পরিপূর্ণ হয় তা আজ সকলেরই জানা। অনেকের মুখেই প্রশ্ন।

মূলতঃ একটি বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে হবে যাকাত যেহেতু দরিদ্রের হক– এ হক পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য বা বেশি দিলে সে কিছু একটা করে ফেলবে, আস্তে আস্তে ধনী হয়ে যাবে, সে আমার সমকক্ষ হয়ে যাবে, এখন যেমন সে আমাকে শ্রদ্ধা করে আমার বোঝা বহন করে তখন আর করবে না ইত্যাদি মাথায় এনে কম কম করে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। এতে যাকাত নামেই দেয়া হবে কিন্তু তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কাজেই ভিক্ষুকের ন্যায় যাকাত দেয়ার এ রীতি পরিবর্তন করে পরিকল্পিতভাবে সকলকে যাকাত দিতে হবে, যাতে করে আজকের অসহায়-পীড়িত ভাইয়েরাও আগামীতে অন্যদেরকে যাকাত দিতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে। আর এভাবেই হতে পারে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

যেসব মালের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক

যাকাত হিসেবে দরিদ্রদের মাঝে টাকা দেয়া বা স্ব-স্ব দেশের মুদ্রা দেয়াই উত্তম। কিন্তু জমিতে উৎপাদিত ফসল ও পশুর ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। এগুলোর ক্ষেত্রে টাকার চেয়ে ফসল ও পশু দিয়ে দেয়াই উত্তম, শরীয়াহ আইনে সিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন :

حدثنا عمرو بن سواد المصرى ثنا عبد الله بن وهب اخبرنى سليمان بن بلال عن شريك بن ابى نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر

"মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামেনে পাঠান এবং বলেন ঃ ফসলের যাকাত বাবদ ফসল,

ছাগলের যাকাত বাবদ ছাগল, উটের যাকাত বাবদ উট এবং গরুর যাকাত বাবদ গরু আদায় করবে।" (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৮১৪)

حدثنا اسحاق بن موسى ابو موسى الانصارى ثنا عاصم بن عبد العزيز ابن عاصم ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن ابى ذباب عن سليمان ابن يسار وعن بسر بن سعيد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ এবং পানি সেচ দ্বারা সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-বিংশতি অংশ যাকাত দিতে হবে।"

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৮১৬)

যাকাত কখন আদায় করা উত্তম

যাকাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত কোন দিন, ক্ষণ বা মাসের উল্লেখ আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস পাকে রাসূল (সা.) উল্লেখ করেননি। এজন্য সাহেবে নিসাব যখন তার আর্থিক বছর শেষ হবে তখনই নিজ দায়িত্বে দীনী অনুভূতি থেকে অন্যদের হক হিসেবে এ যাকাত আদায় করে দেবে। তবে বাংলাদেশে অধিকাংশ যাকাতদাতাই পবিত্র রামাদ্বান মাসে অধিক সাওয়াবের আশায় যাকাত আদায় করে থাকেন। সত্যিই রামাদ্বান মাসের মর্যাদা ও গুরুত্ব পুরো মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত বেশি। কারণ :

০১. এ মাস পৃথিবীবাসীর সংবিধান আল-কুরআনুল কারীম নাযিলের মাস।

০২. এ মাসের সিয়াম সাধনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অতীতের সকল গুনাহ (বান্দার হক ছাড়া) মাফ করে দেন।

০৩. এ মাসে শয়তানের সব নেতাদের বন্দী করে রাখা হয়।

০৪. এ মাসে জান্নাতের সকল দরজা খোলা ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

০৫. এ মাসে প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব ১০–৭০, ৭০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেয়া হয়।

০৬. এ মাস পৃথিবীর বুকে মুসলিম অস্তিত্বের বীজ বপণের মাস। এ মাসেই বদরের প্রান্তরে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং এতে মুসলিমগণ বিজয়ী হয়েছিলেন।

০৭. এ মাসে রয়েছে এমন একটি রাত; যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

০৮. এ মাসে সকল মুসলিমের মনে ও বাহ্যিক আবরণেও আসে আল্লাহর মহব্বতের ছোয়া, ফলে আল্লাহভীতি সৃষ্টির ফলে সকলেই হেদায়েত কামনা করে বেশি-বেশি। অর্থাৎ মুত্তাকী বা মুমিন হওয়ার জন্য এ মাসই সর্বোত্তম ও সহজ মাস।

অতএব এ মাসে যাকাত আদায় করার মধ্য দিয়ে আমরা যদি আল্লাহর হক ও দরিদ্র শ্রেণীর হক যথার্থভাবে আদায় করি তাহলে বহু গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে। সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাস হিসেবে অতীতের জানা-অজানা, সগীরা-কবীরা সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে নাজাত পেয়ে হয়তো আল্লাহর দরবারে মুত্তাকী বা একজন মুমিন হিসেবে গণ্য হতে পারি। তবেই আশা করা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরকালেও আমাদের সুন্দর জান্নাত উপহার দেবেন আর দুনিয়াতেও সুন্দর জীবন যাপন করার তাওফীক দেবেন।

যাকাত প্রদত্ত মালের মান

০১. যাকাত বাবদ প্রদত্ত মালের আর্থিক মূল্য থাকতে হবে।

০২. গৃহপালিত পশুর যাকাত সংশ্লিষ্ট পশুর দ্বারা প্রদান করা হলে তা মধ্যম মানের হতে হবে এবং অর্থের দ্বারা আদায় করলে তা মধ্যম মানের পশুর মূল্যের সম-পরিমাণ হতে হবে।

০৩. পণ্যের যাকাত অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যাকাত বাবদ যে পরিমাণ পণ্য প্রদান বাধ্যতামূলক, প্রদত্ত অর্থ উক্ত পরিমাণ পণ্যের মূল্যের সম-পরিমাণ হতে হবে।

০৪. কোন মালের যাকাত অন্য মাল দ্বারা প্রদান করার ক্ষেত্রে যাকাত বাবদ সংশ্লিষ্ট মালের যে পরিমাণ প্রদান বাধ্যকর হয় প্রদত্ত মালের মূল্য সেই পরিমাণ মালের মূল্যের সম-পরিমাণ হতে হবে।

যাকাত প্রদানকারীর পুরস্কার

ইহকালীন পুরস্কার

যাকাত প্রদান ইসলামের দু' ধরনের ইবাদাতের মধ্যে আর্থিক ইবাদাত হিসেবে গণ্য। সম্পদশালীরা এ যাকাত পরিশোধ করার মাধ্যমে সম্পদহীন

দীন-দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটানোর ফলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকাত দাতাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাছাড়া ধনী ব্যক্তিরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ হারে নিজেদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ অন্যদেরকে তথা অসহায় দীন-দরিদ্রদেরকে দিয়ে থাকে। যা একমাত্র স্রষ্টার আদেশের প্রতি মাথা নত করারই বাস্তব প্রতিফলন।

কেননা একদিকে যখন এক শ্রেণীর মানুষ অন্যের সম্পদ কেড়ে নিতে ব্যস্ত, নানা ধরনের অপকৌশল আঁটতে মত্ত, যে কোন অপকর্ম করতেও প্রস্তুত ঠিক সেই মুহূর্তে আরেক শ্রেণীর মানুষ স্ব-ইচ্ছায় নিজের সম্পদ হিসাব করে তার একটা অংশ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাতে তুলে দেয়ার কাজে নিয়োজিত; তখন তো অবশ্যই তাদের জন্য কিছু একটা পুরস্কার মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে ঘোষণা থাকা উচিত এবং আছেও। তাইতো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ০৯)

الا الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون

"কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।" (সূরা আল-ইনশিকাক : ২৫)

الذين ينفقون اموالهم باليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৪)

والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة والمؤمنون بالله واليوم

الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما

"এবং যারা সালাত কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার তাদেরকে অচিরেই আমি মহা পুরস্কার দান করব।"

(সূরা আন-নিসা : ১৬২)

ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون

الزکوة والذین هم بایتنا یؤمنون

"আর আমার দয়া তা তো প্রতিটি বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৬)

আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী যাকাত আদায়কারীর ইহকালীন পুরস্কারসমূহ হচ্ছে :

০১. সম্পদ বৃদ্ধি পায়ঃ যাকাত দিলে ব্যক্তির সম্পদ কমে না বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়। যারা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর বিনিময়ে কেবল পরকালে নয়, ইহকালেও তাদের সমুদয় কাজ-কর্মে ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন :

مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت

سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضعف لمن یشاء

والله واسع علیم - الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم

لایتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف

علیهم ولا هم یحزنون

"যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্য দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হইবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬১-২৬২)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله وما

اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

"মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়, ওরা সমৃদ্ধিশালী।" (সূরা আর-রূম : ৩৯)

মূলতঃ যাকাত হচ্ছে এমন এক ব্যবসা যার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি এর মূল্য প্রদানে বা এর প্রতিদান প্রদানে এমন উদার হস্ত যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور.

"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিণামে আল্লাহ তাদের সাওয়াব পুরোপুরি দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।" (সূরা আল-ফাতির : ২৯-৩০)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, যাকাত দাতাদের সম্পদও বাড়ায় আর যেহেতু যাকাতের অর্থ গরীব শ্রেণী পায় সেহেতু তাদের সম্পদও বাড়ে। এভাবে উভয় শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

০২. সম্পদ ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ঃ যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও মানব আত্মাকে পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত লাভের আশায় নির্ধারিত খাতে ব্যয় বণ্টন করার জন্য দেয়া হয়।

যাকাত একদিকে যাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র করে অন্যদিকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাধন করে। আবার দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হলো যাকাত। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এটি সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্যও ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ প্রদান করে। সম্পদের এ সুষম বণ্টনের জন্য ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত।

অন্যদিকে মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়লে সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে মানুষের অভাব-অনটন বেড়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, সর্বোপরি মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে।

চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ, লুটপাট বেড়ে যায়। আবার যাকাত যারা নিয়মিত হিসাব করে আদায় করে না তাদের প্রতিও নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব, কঠিন অশান্তি যার লক্ষণ হলো বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া। সুতরাং বলা যায়, এসব সমস্যা থেকে মানব জাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রত্যেক ধনী মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত অবশ্যই পালনীয় তথা ফরযরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

০৩. মন কলুষমুক্ত হয়ঃ নিয়মিত যাকাত আদায়কারীর প্রতি আল্লাহর রহমত বিশেষভাবে বর্ষিত হয়। আল্লাহর বিধান মেনে চলায় আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন; তাদের জন্য সুখ-শান্তির পথকে সুগম করে দেন। পাশাপাশি যাকাত দাতার মনও থাকে উৎফুল্ল; স্বস্তি ও শান্তিতে ভরপুর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى

"অতএব যে ব্যক্তি দান করে এবং মুত্তাকী হয়, আর যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য অবশ্যই সহজ করে দেব সুখ-শান্তির পথ।"

(সূরা আল্-লাইল : ০৫-০৭)

অন্যদিকে যাকাত দানের ফলে যাকাতদাতার সাথে সকলেই ভাল আচরণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের প্রতি বিশেষ রহমত দান করেন। ফলে তাদের মন থেকে সকল কলুষতা তথা হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার সহ আমিত্ব বা আমার সম্পদ ইত্যাদি কথা-বার্তা যা ইসলাম বিরোধী, যা শয়তানের প্ররোচনায় অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তা আল্লাহ দূরীভুত করে তাদেরকে খাঁটি মুমিনে পরিণত করেন। যা মূলত: যাকাত দানের মত ভাল কাজেরই প্রতিফল স্বরূপ গণ্য হতে পারে।

০৪. মানবতাবোধ জাগ্রত হয়ঃ যাকাত প্রদানের ফলে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা পায় পারস্পরিক ভালবাসা, মায়া-মমতা। এতে একজন আরেকজনের বিপদ-আপদে এগিয়ে আসে। মানুষ মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে থাকে। এই যে ভালবাসার বন্ধন তা সুদৃঢ় হওয়ার ফলে সমাজ থেকে দূরীভুত হয় মানবতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড। ফলে সমাজ ব্যবস্থা হয় সুন্দর; সকলের কল্যাণকামী; সকলের কাছে গ্রহণীয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও এমন সমাজের প্রতি দান করেন বিশেষ রহমত, দূরীভুত করে দেন সকল ধরনের কষ্ট। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

ليجزي الذين امنوا وعملوا الصلحت اولئك لهم

مغفرة ورزق كريم

"ইহা এজন্য যে, তিনি পুরস্কৃত করবেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক রয়েছে।"

(সূরা আস-সাবা : ০৪)

পরকালীন পুরস্কার

যাকাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মনোনীত দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। ইসলামের দু' ধরনের ইবাদাতের মধ্যে একটি– যা আর্থিক ইবাদাত নামে পরিচিত। এ ইবাদাত সম্পদশালীরা নিঃসঙ্কোচে একমাত্র স্রষ্টার আদেশ হিসেবে মেনে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

এখানে পরকালীন পুরস্কার প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ বলেন :

وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله

وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون

"তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ব্যয় কর। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর এর পূর্ণ পুরস্কার তোমাদের দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।"

(সূরা আল-বাকারা : ২৭২)

والذين امنوا وعملوا الصلحت سندخلهم جنت تجري

من تحتها الانهر خلدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق

من الله قيلا

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিচে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"

(সূরা আন-নিসা : ১২২)

এভাবে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। আর তাই আমাদের উচিত এ পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়া।

যাকাত হিসেবে কী দেয়া উত্তম

নগদ টাকা

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত লোকজনকে যাকাত হিসেবে নগদ টাকা, উশর হিসেবে কৃষিজ ফল ও শস্য, পশুপাখীর ক্ষেত্রে পশু-পাখি দেয়াই উত্তম। এতে যাকাতের হকদাররা তাদের চাহিদামত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করতে পারে।

অন্যদিকে যাকাত হিসেবে কোন দ্রব্য বা উপকরণ না দিয়ে টাকা দিলে যাকাত ভোগকারী ঐ টাকাকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থায়ী বা উৎপাদনশীল কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। সন্তানের পড়ালেখার খরচ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ এক বছরের প্রাপ্ত যাকাতের টাকা দিয়ে একজন মানুষ গঠনমূলক এবং তার উপযোগী এমন কোন প্রকল্প বা কাজ করতে পারে যা কিনা পরবর্তী বছরে তাকে আর যাকাত গ্রহণের উপযোগী না রেখে স্বয়ং স্বাবলম্বী করে তুলতেও পারে। আর এভাবেই ব্যক্তি তার দারিদ্র্যকে জয় করে হতে পারে আত্মপ্রত্যয়ী। রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে হতে পারে অংশীদার।

শাড়ী-লুঙ্গি

যাকাত পাওয়ার উপযোগী মানুষদেরকে টাকা না দিয়ে আজকাল আমাদের সমাজের অনেকেই শাড়ী-লুঙ্গি দিয়ে থাকেন। এ রীতি আজ সংস্কৃতি হিসেবে সমাজে বেশ প্রচলিত। পাশাপাশি বিভিন্ন টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানও যাকাতের উপযোগী শাড়ী-লুঙ্গি তৈরী করে বিক্রি করতে ব্যস্ত। তাদের দাবী তারা কম লাভে শাড়ী-লুঙ্গি বিক্রি করে উত্তম কাজে অংশগ্রহণ করছেন। এখানে কম দামে যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়। শাড়ী ১২০ টাকা, লুঙ্গি ৫০ টাকা– এ সাইনবোর্ড টানিয়ে তারা এক শ্রেণীর যাকাতদাতা ধনীদেরকে কাপড় ক্রয়ে আকৃষ্ট করে থাকেন। আসলে কাপড় পরিধান করা লজ্জা ঢেকে রাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর লজ্জা ঢেকে রাখা মুসলিমদের ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ঈমানের দাবী অনুসারেই নারী-পুরুষরা কাপড় পরিধান করে থাকেন। কিন্তু এ কাপড় যদি হয় অত্যন্ত পাতলা যা পরিধানের পর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপড়ের অন্তরালেই প্রদর্শিত হয় অথবা কাপড় এত মোটা যা পরিধান করলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তাহলে এমন কাপড় দেয়া কী সমর্থনযোগ্য হতে পারে? প্রশ্ন থাকল এমন কাপড় যারা দেন তাদের প্রতি!

অন্যদিকে যাকে কাপড় দেয়া হলো তার তো কাপড়ের অভাব নেই। তার তো প্রয়োজন টাকা পাওয়া। এতে কাপড় কী তার চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে? আবার দেখুন, কাপড় দেয়া হলো– কী কাপড় শাড়ী-লুঙ্গি অর্থাৎ পরিবারের বাবা-মায়ের পরিধান উপযোগী কাপড়। কিন্তু একথা সকলেই জানে একটা বয়সে সন্তানদের

পিতা-মাতা তথা অভিভাবকরা সন্তানদের মুখে হাসি দেখে তাদের ক্ষুধাসহ অন্যান্য চাহিদার ঘাটতিকে তুচ্ছ করে স্বস্তি, শান্তি বোধ করে থাকে। কিন্তু যারা শাড়ী-লুঙ্গি দিল তারা তো তাদের সন্তানদের প্রয়োজন উপযোগী লাল টুকটুকে জামা, শার্ট কিংবা টুপি প্রদান করছেন না (কোথাও শোনাও যায় না)। এমতাবস্থায় একটু ভেবে দেখুন না দৃশ্যটা কেমন! নাবালিগ সন্তানদের জন্য টাকার অভাবে যে মা-বাবা নতুন কাপড় কিনতে পারল না সেই মা-বাবা কি ঈদের দিন নতুন কাপড় পরিধান করবে নাকি সেদিন সন্তানদের জন্য কিছু না কিনতে পারায় তাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরবে? তারপরও কোন রকম নতুন লুঙ্গি পরিধান করে ঈদগাহে নামায আদায় করতে বাবাকে যেতে দেখে নাবালিগ সন্তানরা নতুন বস্ত্রের অভাবে কান্নাকাটি করে ঈদগাহে না যেয়ে যদি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে হে আল্লাহ! কেন ঈদের এ দিনেও এক টুকরা নতুন জামা পেলাম না। বলুন, দৃশ্যটা কেমন হবে?

আবার এভাবে যাকাত হিসেবে শাড়ী-লুঙ্গি দেওয়ার ফলে ঐ যাকাত গ্রহণকারী তো কোন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারলো না। এতে তো সে বা ঐ পরিবার সব সময়ই যাকাত উপযোগী থাকবে। সে তো তার অভাব কখনই ঘুচিয়ে নিতে সমর্থ হবে না। এতে না হবে দারিদ্র্য বিমোচন না হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সুতরাং তাদের পারিবারিক অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যাবে, যা হবে সত্যিই দুঃখজনক। আর এজন্যই বলা যায়, ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাতো এভাবে কখনো পূর্ণ হবে না। এটা যাকাতের দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাকাতের উদ্দেশ্য হলো, যাকাতের সাহায্যে সমাজের দারিদ্র্য নির্মূল করা, দারিদ্র্যকে লালন-পালন করা নয়। এদেশে এক শ্রেণীর লোক যেভাবে থোক বরাদ্দের মত প্রতি বছর বাজেট করে সামাজিক প্রভাব বিস্তার বা সমর্থন লাভ তথা ভোটের লোভে গরীব-দুঃখীকে একটা শাড়ি বা লুঙ্গি বা ১০/২০/৫০/১০০ টাকা দেয়া অব্যাহত রাখছে তাতে তো কোনদিনই দরিদ্র লোকদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না, দারিদ্র্য নির্মূল হবে না, দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখা হবে; সুতরাং এটা হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উল্টো একটি দিক।

অন্যান্য উপকরণ

যাকাত হিসেবে অন্যান্য উপকরণ যেমন খাদ্যশস্য বা এমন কোন উপকরণ দেয়া যেতে পারে যা সাময়িকভাবে যাকাত গ্রহণকারীর কল্যাণ করতে পারে। মূলত যাকাত দেয়ার মূল লক্ষ্য হতে হবে এমন যাতে পরবর্তীতে সে আর যাকাত না নিতে হয়, সে যেন দু' এক বছর পর নিজেই যাকাত দেয়ার উপযোগী হয়ে যেতে পারে এমন পরিকল্পিতভাবে দেয়া। আর এভাবেই যাকাত দেয়ার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে; সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে শান্তি ও স্বস্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কুরআনের বিধান অনুযায়ী যাকাত প্রাপ্তির হকদার কে বা কারা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু যাকাত আদায় করার জন্য তাকিদ প্রদান করেননি বরং যাকাতের অর্থ বন্টনের খাতগুলোও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
(সূরা আত-তাওবা : ৬০)

বস্তুত আল-কুরআনে বর্ণিত এ আট শ্রেণীর লোকই কেবল যাকাতের হকদার। এ খাত সমূহের বাইরে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার কারো নেই। তবে যাকাত বন্টনের উপরোক্ত আটটি খাতের বর্ণনায় প্রথম চারটির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ (ل) বর্ণ ব্যবহার করেছেন (للفقراء ....), আর এই (ل) বর্ণটি (تمليك) তথা মালিক বানানো অর্থে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে শেষোক্ত চারটি খাতের বর্ণনায় মহান আল্লাহ (فى) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (وفى الرقاب والغارمين ...) যা দ্বারা তিনি পাত্র কিংবা ক্ষেত্র অর্থ বুঝিয়েছেন। এর অর্থ হল– প্রথম চার প্রকারের ক্ষেত্রে যাকাতের সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় যাবে। আর শেষোক্ত চার প্রকারের ক্ষেত্রে তা সরাসরি ব্যক্তি মালিকানায় না গিয়ে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করলেও চলবে।

এখানে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আটটি নির্ধারিত খাতের ব্যাখ্যার পূর্বে আমাদের বুঝা আবশ্যক যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্বয়ং পৃথিবীর সমস্ত

জীবজন্তুকে জীবিকা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها

"আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবন-জীবিকা আল্লাহর দায়িত্বে নয়।" (সূরা হুদ : ০৬)

আল্লাহ সকলের জীবিকা প্রদানের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। কিন্তু তিনি সকলকে সমপরিমাণে জীবিকা প্রদান করেননি। আর এখানেই রয়েছে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর এইরূপ ব্যবস্থাপনায় মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্য এবং নিখিল বিশ্ব পরিচালনার সম্পর্কে শত সহস্র রহস্য। এ জন্যেই বলা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ মঙ্গলময় বিধান অনুসারেই কাউকে ধনী করেছেন, আবার কাউকে দরিদ্র করেছেন। অনন্তর ধনীদের অর্থে তিনি দরিদ্রের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

والذين فى اموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم

"তাদের ধন-সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিত সকলেরই নির্ধারিত হক রয়েছে।"

(সূরা আল-মা'আরিজ : ২৪-২৫)

আবার ক্ষেত্র বিশে... ধনী হওয়া সত্ত্বেও কারোর জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন :

لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغنى

"পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় : ০১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী, ০২. যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, ০৩. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ০৪. কোন ধনী ব্যক্তির গরীবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা, ০৫. যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করলে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ বৈধ।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৩৫)

– সুতরাং ধনী বা সম্পদশালীদেরকে যাকাতস্বরূপ সম্পদের যে অংশ প্রদানের আদেশ করা হয়েছে, তা দেয়া মানে তারা দরিদ্রের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন

করছে না; বরং দরিদ্রদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশই তারা প্রদান করছে অর্থাৎ দরিদ্রের এই প্রাপ্য নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। এতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নিসাব বিশ্বের কোথাও কোন কালে কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকার কারোর নেই।

দরিদ্র জনসাধারণ (আল-ফুকারা)

ফকীর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নেই, যারা সর্বতোভাবেই সহায়-সম্বলহীন, পথের ভিখারী, পথের ধারেই অনেক ক্ষেত্রে বসবাসকারী তারাই ফকীর। অন্য কথায় ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। কোন শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে পঙ্গু, বিধবা, ইয়াতীম, শিশু, অসহায় বা সহায়-সম্বলহীন বিকলাঙ্গ ও দুর্ঘটনা কবলিত লোকজন যারা জীবিকার ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী তারাও ফকীর।

অভাবী (আল-মাসাকিন)

মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মিসকীন সে সকল অভাবগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত দরিদ্রদেরকে বুঝায় যারা আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধের কারণে কারো নিকট অভাব ও দারিদ্রের কথা প্রকাশ করে না; অথচ কঠোর শ্রম ও প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও নিজেদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না।

নবী কারীম (সা.) বলেছেন :

عن ابى هريرة رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لايجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু' এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দু' একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।" (সহীহ আল-বুখারী কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৮৪)

ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا

"যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস খাবার বা দু'একটা খেজুর ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যায় তারা (প্রকৃত) মিসকীন নয়"। একথা শুনে সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে মিসকীন কে? তিনি (উত্তরে) বললেন : মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মত সামর্থ্য যার নেই আর সমাজের মানুষও তাকে অভাবী বলে জানে না যাতে তাকে দান করতে পারে এবং সে নিজেও (মুখ খুলে) কারো কাছে কিছু চায় না।" (এ ব্যক্তি হলো প্রকৃত মিসকীন অর্থাৎ আর্থিক অনটনভুক্ত গরীব ভদ্রলোক)।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২২৬২)

মূলত: ফকীর ও মিসকীন উভয় শব্দই দরিদ্রকে বুঝায় এখানে ফকীর অর্থ যার কিছু নাই। মিসকীন অর্থ যার নিসাবের কম সম্পদ আছে। কিন্তু শাব্দিক অর্থের পার্থক্য যাকাতের বিধানে কোনরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। ফলে যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে এই উভয় শ্রেণীই সমানভাবে হকদার।

যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (আমিলূন)

এই বিভাগের কর্মচারীদেরকে অবশ্যই মুসলিম, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য, যাকাতের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দায়িত্ব পালনে দৈহিকভাবে সুস্থ-সবল হতে হবে। অতএব কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে এ বিভাগে নিয়োগ দেয়া বৈধ নয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا عيسى بن حماد المصرى ثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن ابى حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدى فى الصدقة كمانعها

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকাত আদায়ে বা প্রদানের অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী যাকাত বারণকারীর সমতুল্য।"

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৮০৮)

শাফিঈ মাযহাব মতে, একজন যে পরিমাণ যাকাত সংগ্রহ করবে তার এক-অষ্টমাংশ পরিমাণ পাবে। এর বেশি বাড়ালে তা বাইতুল মাল হতে প্রদান করতে হবে। অবশ্য সরকার ইচ্ছা করলে তার পূর্ণ বেতন বাইতুল মাল থেকেও প্রদান করতে পারে। (আল-মাওসূআ, ২৩/৩১৮)

হানাফী মাযহাব মতে কোন কর্মচারীকে তার মৌলিক প্রয়োজনের সমপরিমাণ বা তার কাজের অনুপাত অনুযায়ী যাকাত হতে দেয়া হবে। তবে তার পরিমাণ আদায়কৃত যাকাতের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না। হানাফীগণ আরো বলেছেন যে, যাকাতদাতাগণ স্ব উদ্যোগে নিজ নিজ যাকাত সরকারী তহবিলে জমা দিয়ে গেলে তা থেকে ঐ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাবে না। কর্মচারী সম্পদশালী হলেও যাকাতের অংশ পাবে, এটা তার জন্য বেতন তুল্য।

(বাদায়ে ২/৪৪; ইসলামের যাকাত বিধান, ২/৫১)

মন জয় করার জন্য (মু'আল্লাফাতুল কুলূব)

'মু'আল্লাফাতুল কুলূব' মানে সেইসব লোক যাদের মন আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো যেসব লোক ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর তাদের অর্থ দিয়ে বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করা। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকদের কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন অমুসলিম, কাফির, মুশরিক, পৌত্তলিক ও আল্লাহর প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না এমন নাস্তিক স্বভাবের লোক কিংবা কাফিরদের দলের এমন লোক যাদের অর্থ দিলে দল ভেঙ্গে এসে মুসলিমদের সাহায্যকারী হতে পারে অথবা এমন লোক যারা সবেমাত্র ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আশংকা হয় যে, অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলে তারা আবার অর্থাভাবে কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে পারে– এসব লোকদের মন জয় করার জন্য স্থায়ী সাহায্য, স্থায়ী ভাতা, বৃত্তি ও সাময়িক সাহায্য

প্রদান করে তাদেরকে ইসলামের সমর্থক, সাহায্যকারী, অনুগত কিংবা বন্ধুতে পরিণত করা। এ শ্রেণীর লোকদের যাকাত দেয়ার জন্য তাদের ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হওয়া শর্ত নয় বরং তারা ধনী ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। মূলকথা হলো, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম ব্যক্তিকেও যাকাত প্রদান করা বৈধ। মহানবী (সা.) নেতৃস্থানীয় কুরাইশ পৌত্তলিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত প্রদান করেছিলেন।

হানাফীদের অভিমত হচ্ছে, ইসলামের সূচনা লগ্নে এ ধরনের লোকের মন জয় করার জন্যে যাকাত থেকে প্রদান করা হতো। কিন্তু হযরত আবু বাকর (রা.)-এর যামানায় হযরত উমর (রা.) এসব লোককে যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে তখন ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগ। মুসলিমরা ছিলো সংখ্যালঘু। কিন্তু এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোন কাফির-মুশরিকের মুখাপেক্ষী রাখেননি। অতএব এখন তাদেরকে মন জয় করার জন্য যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। পরবর্তীতে সাহাবাদের ইজমার ভিত্তিতে এ খাত রহিত হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকও এ মত পোষণ করেন। অবশ্য কোন কোন ইসলামী মনীষীর মতে এ খাত এখনো বাকী রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে মন জয় করার জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) তখনকার অবস্থা বিবেচনায় মন জয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করেননি। তাই তিনি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাই বলে এই খাতটি কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। বরং প্রয়োজনবোধে এ খাতে ব্যয় করার অবকাশ থাকা উচিত। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত-তাওবা, টীকা নং ৬৪)

ইমাম যুহ্‌রীর মতে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঐসব নও-মুসলিম যারা কেবলমাত্র কালিমা পাঠ করে মুসলিম হওয়ার কারণে তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ি, মাল-সম্পদ এমনকি উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। যারা চরম অর্থনৈতিক সংকটে মানুষের কাছে হাত পেতে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে তাদেরকে যাকাতের অর্থ থেকে সাহায্য দিয়ে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়া– এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

গলদেশ (গোলাম) মুক্তি

গলদেশ মুক্ত করা বলতে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ লোক এবং বন্দী মুক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, অন্য কারোর দাসত্ব

করবে না এটাই হচ্ছে আল্লাহর মৌলিক নির্দেশ। এজন্য ইসলাম দাসমুক্ত করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মধ্যে যাদের অর্থ ছিল তারা দাস মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রেও বাইতুল মাল থেকে এজন্য অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমান যুগে দাসপ্রথা নেই বলে অনেক লোকের ধারণা এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আর প্রয়োজন নেই। আবার অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ যুগে যারা অর্থাভাবে জরিমানা আদায় করতে না পেরে কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যেসব লোক অর্থাভাবে মামলা পরিচালনা করতে পারছে না অথচ মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী হয়ে আছে অথবা নানারূপ হয়রানির শিকার হচ্ছে তাদেরকে যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।

ঋণগ্রস্ত (গারিম)

ঋণগ্রস্ত বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার ঋণের পরিমাণ তার মালিকানাধীন সম্পদের অধিক বা সমান যা ঐ মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ মাল থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করে ঋণমুক্ত করা সরকার ও যাকাতদাতার কর্তব্য (বাদায়ে ২/৪৫)। কেননা ঋণভারে জর্জরিত লোকেরা মানসিকভাবে সর্বদাই ক্লিষ্ট থাকে এবং কখনও কখনও জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যায়, অসামাজিক ও অনৈসলামিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ইসলামকে সর্বকালের সকল সমস্যা সমাধানে কার্যকর আদর্শ হিসেবে প্রমাণের লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত লোকের ঋণের বোঝা মুক্ত করে সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ-সুন্দর রাখার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঋণ করার পর তা পরিশোধ করতে না পারা বড়ই অসম্মানের কাজ, যা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.)-এর কার্যপদ্ধতি দেখে বুঝা যায়। রাসূল (সা.)-এর সময়ে কোন সাহাবী তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে ইন্তিকাল করলে তিনি তার জানাযার নামাযই পড়তে চাইতেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোন সাহাবী ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তিনি বলতেন– এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। মূলত: ঋণের কারণে কেউ নিঃস্ব ও নির্যাতিত হবে এ অবস্থা ইসলামে কাম্য নয়। একমাত্র ঋণের কারণে পরিবারের সব শান্তি বিনষ্ট হবে আর অন্যদিকে বিত্তবান ঋণদাতা তার উপর ক্রমান্বয়ে মানসিক চাপ প্রয়োগ করবে, তাকে সমাজে নিগৃহীত-নিষ্পেষিত করবে– ইসলাম তা কখনোই চায় না।

তাই রাসূল (সা.) বলেন :

تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذالك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

"তোমরা একে দান-খয়রাত কর। লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ হল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পাওনাদরদের বলেন : এখন যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, (আপাতত) এর অতিরিক্ত আর পাবে না।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬০৭)

তবে খেয়াল রাখতে হবে যারা অপচয়, অন্যায়, অসৎকাজ সম্পাদন, জাঁকজমক প্রদর্শন কিংবা আমোদ-আহলাদের জন্য ঋণগ্রস্ত হয় তাদের এ তহবিল থেকে অর্থ দেয়া যাবে না। কারণ এ অবস্থায় সাহায্য দিলে তারা আরো অপচয় করবে এবং যাকাতের অর্থ নিয়ে ঋণ শোধ করার ভরসায় আরও অধিক ঋণগ্রহণ করবে।

অন্যদিকে যাকাত হতে সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মুসলিম হওয়া অত্যাবশ্যক। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে এবং তা পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকলে ইমাম মালিকের মতে তা পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে। এমনকি তার কাফন-দাফনের খরচও সংকুলান করা যাবে। ইমাম নাওয়াবীও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আল্লাহর পথে (ফী সাবিলিল্লাহ)

এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এর ব্যাখ্যাও বিস্তৃত। সাধারণভাবে এটা জিহাদের অর্থ বুঝায়। আল-কুরআনুল কারীমে যত স্থানে জিহাদের কথা এসেছে সবখানে "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" বলা হয়েছে। তবে আভিধানিক অর্থে একে জিহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সকল প্রকার কল্যাণময় ও নেক কাজকে এর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এখানে আল্লাহর পথে বলতে জিহাদ করা অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একে কায়েম রাখার জন্য যেসব বিশাল কাজের আঞ্জাম দিতে হয় সেজন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত দল ও সংগঠন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মর্যাদা পেতে পারে যদি তাদের নীতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম

ও দ্বীনের কালেমাকে সমুন্নতকরণ। এক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দাওয়াতের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় একটি বড় ব্যয় ক্ষেত্র। মূলত: জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামী সাহিত্য রচনা, মাহফিল পরিচালনা ও বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের যোগান যাকাতের এ খাত থেকে হতে পারে। এমনকি পাশ্চাত্য কর্তৃক পরিচালিত তরুণদের চরিত্র ধ্বংসকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিপরীতে আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া গঠন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী ও কথা প্রচারের কাজে প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

মহানবী (সা.) বলেন :

حدثنا محمد بن عوف الطائى نا الفريابى نا سفيان عن عمران البارقى عن عطية عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحل الصدقة لغنى الا فى سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك او يدعو لك قال ابو داود رواه فرس وابن ابى ليلى عن عطية عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.

মুহাম্মাদ ইবনে আউফ (রা.)..... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহর রাস্তায় থাকে অথবা মুসাফির অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসাবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসাবে দান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।"

(আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৩৭)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ইসলামকে শক্তিশালী করার কাজে অর্থ ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সফর, যানবাহন, সাজ-সরঞ্জাম এবং উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এসব কাজে নিয়োজিত লোক নিজেরা স্বচ্ছল হলে এবং প্রয়োজন পূরণের

জন্য সাহায্যের দরকার না হলেও যাকাত গ্রহণ করায় তাদের কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সকল শ্রম ও সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যয় করে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যেও যাকাত থেকে এককালীন বা নিয়মিত সাহায্য দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে, ধনী হলে দেয়া যাবে না। যার মালিকানায় পঞ্চাশ হাজার দিরহাম আছে সে ধনী হিসেবে গণ্য। (আল-মাওসূআ)

মুসাফির, পর্যটক (ইবনুস সাবীল)

যাকাতের অর্থ প্রাপ্তির হকদারদের মধ্যে সর্বশেষ হকদার হল মুসাফির, পর্যটক বা ইবনুস সাবীল। মূলত: সফর বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন এক. আল্লাহর দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, একদেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা।

দুই. পড়ালেখার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে বা একদেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা।

তিন. চাকরি বা কর্মের জন্য গমন করা।

চার. প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমির সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করা।

ইবনুস সাবীল সংজ্ঞায় সকল দলই অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবনুস সাবীল শাব্দিকভাবে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে পথে চলমান রয়েছে। যে লোক শুধু মনে মনে সংকল্প করেছে, এখনো বাড়ি থেকে বের হয়নি সে ইবনুস সাবীল নয়, কেননা সে পথিমধ্যে সৃষ্ট নানা কষ্ট, ধুলিময়তা, ক্ষুধা, পিপাসা, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতা ইত্যাদি কেমন তাতো বুঝতে পারবে না। কিন্তু যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজ ভূমি সীমা অতিক্রম করে অপরিচিত এক দেশ বা শহরে প্রবেশ করেছে যেখানে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কোন সহায়-সম্বল নেই অথচ নিজের দেশে অনেক থাকলেও এখানে তা ব্যবহার করতে পারছে না তাকেই ইবনুস সাবীল বা মুসাফির হিসাবে গণ্য করা হয়। এমতাবস্থায় সফরকালে পথিমধ্যে তার রসদপত্র ও খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। যদিও সে তার এলাকায় অনেক সম্পদশালী। তবে তাদের সফরের উদ্দেশ্য বৈধ হতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

يـايـها الـذيـن امـنـوا لاتـحـلـوا شـعـائـر الـلـه ولا الـشـهـر الـحـرام ولا الـهـدىَ ولا الـقـلائـد ولا آمـيـن الـبـيـت الـحـرام يـبـتـغـون فـضـلا مـن

ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"

(সূরা আল-মায়িদা : ০২)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, এই রকম মুসাফির বা পথিককে যাকাত থেকে কী পরিমাণ অর্থ দেয়া যেতে পারে? এ পর্যায়ে পথিকের খাবার খরচ, পোশাকের ব্যয় (প্রয়োজন হলে) এবং লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছার জন্য যা যা প্রয়োজন সেই পরিমাণ খরচ দিতে হবে। সফর দীর্ঘ হলে তাকে সফর শেষ করে বাড়ি পৌছা পর্যন্ত যাতায়াত খরচ দেয়া বাঞ্চনীয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাকাতের মালের যেন কোনরূপ অপচয় বা অপব্যয় না হয়। এজন্য সহজলভ্য যানবাহন ব্যবহার করতে হবে।

হানাফী মাযহাব মতে, যদি কেউ নিজের দেশে সম্পদ রেখে এসে বিদেশে অর্থ-সম্পদের অভাবে পড়ে যায় বা ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যায় এবং নিজের অর্থ ব্যবহারের কোন উপায়ও না থাকে সে অবশ্যই এই শ্রেণীভুক্ত হবে।

যাকাত প্রদান কী
আটটি খাতের মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা তাওবার ৬০ তম আয়াতে যাকাত প্রদানের আটটি মাসরাফ (খাতের) কথা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণী হল :

০১. ফকীর।

০২. মিসকীন।

০৩. যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

০৪. মন জয় কিংবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

০৫. দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান।

০৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ।

০৭. আল্লাহর পথে ও

০৮. মুসাফির। সুতরাং এই আট শ্রেণীর লোকেরাই যাকাতের অর্থ প্রাপ্তির হকদার।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উল্লেখিত আয়াতের শুরুতে (انما) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরবি ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী এ শব্দটি সীমিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় বিধায় আয়াতের স্পষ্ট ভাষ্য এই দাঁড়ায় যাকাত প্রদানের খাত শুধু এই আট শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমিত থাকবে। এ অর্থ অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না।

আট শ্রেণীর প্রত্যেককে যাকাত প্রদান ফরয কি না

আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আট শ্রেণীর প্রত্যেককে যাকাত প্রদান করা ফরয। তবে যাকাত দাতা ইচ্ছা করলে তাঁর সমুদয় যাকাতের অর্থ যাকাত নেয়ার উপযোগী সকলকে অল্প-অল্প করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে যে কোন এক প্রকার বা দু' প্রকারের লোককেও দিতে পারেন। প্রত্যেক প্রকারের লোককেই যাকাতের অর্থ প্রদান করতে হবে ব্যাপারটা ঠিক এ রকম নয়।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কারা অগ্রাধিকার পাবে

যাকাত শুধু নয়, ফিতরা ও মান্নতের টাকা বা পণ্য ও অন্যান্য উপকরণ উল্লেখিত আট শ্রেণীর লোকদের যে কাউকে দিলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এর মধ্যে শরীয়াতের নিগূঢ় হিকমতের ভিত্তিতে কারা অগ্রাধিকার পাবে বা বহুজনের মধ্যে কারা আগে পাওয়ার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবেন তাদের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

০১. অনাত্মীয় গরীব-মিসকীনের তুলনায় যাকাত দাতার আত্মীয় গরীব-মিসকীন অধিক হকদার। নবী কারীম (সা.) বলেছেন : "ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের যাকাত

প্রদান করলে তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটি আত্মীয়তার হক আদায়ের জন্য, অপরটি দান করার জন্য।"

(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ৪৫)

عن انس بن مالك قال كان ابو طلحة انه اكثر الانصار بالمدينة مالا من نخل وكان احب امواله اليه بير حاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما انزلت هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الى بير حاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث اراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه تابعه روح.

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা.)-রই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচেয়ে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরূ হা'আ (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : "তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না," তখন আবু তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! মঙ্গলময় মহান আল্লাহ

বলেছেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না। (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরু হাআ' আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর নিকট এর পুণ্য ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : বাঃ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রা.) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতপর আবু তালহা (রা.) তা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৬৭)

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة اثنتان صدقة وصلة

"(অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে যাকাত দান করলে তা যাকাতই (যাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ (যাকাতের সওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব) হয়।"

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৮৪৪)

সুতরাং আত্মীয়ের মধ্যে অধিক হকদার হলো পর্যায়ক্রমে যাকাত দাতার আপন ভাই, তারপর বোন, তারপর ভাই-বোনের সন্তানগণ, তারপর চাচা, তারপর ফুফু, তারপর মামা, তারপর খালা, তারপর রক্ত সম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয় এবং তাদের পরবর্তী হকদার প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের মধ্যেও মহল্লার অসহায়রা শহরের অন্যদের চেয়ে বা গ্রামের লোকজন অন্যদের চেয়ে বেশি হকদার।

০২. সাধারণ মূর্খ মিসকীনের চেয়ে দ্বীনদার এবং দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীগণ যাকাত পাওয়ার অধিক হকদার। কারণ এ উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে একজন অসহায় ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার পাশাপাশি একজন দ্বীনদার ও একজন আত্মীয়কেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি আলাদা সাওয়াবের কাজ। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

০৩. দারুল ইসলামের অসহায়-মিসকীন দারুল হারবের মিসকীনের চেয়ে যাকাত প্রাপ্তির বেশি হকদার। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

০৪. ঋণগ্রস্ত অভাবী সাধারণ অভাবীর চেয়ে যাকাতের বেশি হকদার।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

জনকল্যাণমূলক কোন কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কি না

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাত শরীয়াত নির্ধারিত আটটি খাতের কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

তাই মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, পুল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং পুকুর, খাল খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। কেননা কাউকেই এসব কাজে ব্যয়িত অর্থের মালিক বানানো হয় না। ধনী-গরীব সকলেই এগুলো সমভাবে ব্যবহার করে থাকে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলাও জায়েয নয়, তবে যদি যাকাতের টাকা দিয়ে ঔষধ খরিদ করা হয় এবং তা অসহায়-গরীব রোগীদের মাঝে ফ্রি বিতরণ করা হয়, তবে তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

আবার যাকাতের অর্থ দিয়ে রক্ত খরিদ করা জায়েয নেই এবং তা কাউকে দান করাও জায়েয নেই। অনুরূপভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে চিকিৎসালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় অথবা চিকিৎসক বা অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন দেওয়াও জায়েয নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়

০১. বনী হাশিম অর্থাৎ হযরত আলী, আব্বাস, জাফর, আকীল এবং হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর বংশধরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

(আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابى هريرة رض قال اخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت انا لا ناكل الصدقة

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রা.) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর (হাতে) নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। নবী (সা.) বললেন : খক্ খক্, যাতে সে ওটা ফেলে দেয়। অতপর তিনি বলেন : তুমি কি জান না যে, আমরা (বনু হাশিমরা) যাকাতের দ্রব্য খাই না।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৫)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

ان الصدقة لا تحل لنا وان موالى القوم من انفسهم

"আমাদের (হাশিম বংশের) জন্য যাকাত হালাল নয়। আর কোন বংশের মুক্তদাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬০৯)

০২. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى

"অবস্থাপন্ন সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬০৫)

ان المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى الا لذى فقر مدقع او غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا فى وجهه يوم القيامة ورضفا ياكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر

"ধনী ব্যক্তির জন্য এবং সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী সক্ষম ব্যক্তির জন্য (অপরের নিকট) যাঞ্চা করা জায়েয নয়, তবে সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি এবং অপমানকর ঋণে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য জায়েয। যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে এর ক্ষতচিহ্ন হবে এবং সে দোযখের উত্তপ্ত পাথর খাবে। অতএব যার ইচ্ছা (ভিক্ষা) কম করুক আর যার ইচ্ছা বেশি করুক।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬০৬)

০৩. অনুরূপ তার নাবালিগ সন্তানকেও যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

০৪. যাকাত দাতার পিতা, পিতামহ ও তার পিতৃপুরুষদের কাউকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

০৫. অনুরূপ নিজ সন্তান-সন্ততি ও অধস্তন সন্তানাদির কাউকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

০৬. স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

০৭. যাকাত দাতার নিজের যে কোন প্রকার গোলাম-বাঁদীকে (ক্রীতদাসকে) যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

০৮. যাকাতের অর্থ দ্বারা গোলাম-বাঁদীকে পূর্ণ শরীক করে অথবা আংশিক শরীক করে আযাদ করাও জায়েয নয়।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)

০৯. ধনী মুজাহিদকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

(বজলুল মাজহুদ, ফাতহুল কাদীর, আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড)

১০. নিরাপত্তা লাভ করে কোন কাফির ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করলে তাকে দেয়া জায়েয নেই।

১১. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য যাকাত দেয়া জায়েয নেই।

(নূরুল ইযাহ, ১৬২ পৃষ্ঠা)

১২. মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ, পুল নির্মাণ, পানির ব্যবস্থার জন্য কূপ খনন বা নলকূপ বসানো, পানির ঘাট, রাস্তা সংস্কার করানো এবং হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি কাজে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। কেননা যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে মালিক বানিয়ে দেয়া অপরিহার্য। আর উল্লেখিত কাজসমূহে তামলীকে শাখসী (ব্যক্তি মালিকানা) হয় না, তাই যাকাত আদায় সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যাকাত কী পরিমাণ দেয়া উত্তম

ভিক্ষুক পোষা বা ভিক্ষাবৃত্তি উৎসাহিত করার মত না দেয়া

আজকাল আমাদের সমাজে যাকাত প্রদান করা হয় ১০/২০ টাকা বা ৫০/১০০ টাকা করে, যা কিনা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.)-এর শিক্ষার বিপরীত। তিনি ভিক্ষুক পোষার জন্যে যাকাতের অর্থ বণ্টন করতে কস্মিনকালেও বলেননি। এভাবে যাকাত দেয়া মানে যাকাত গ্রহীতা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে যাকাতের মুখাপেক্ষী করে রাখা– যা দুঃখজনক। বরং আমরা জানি, রাসূল (সা.) দরিদ্রদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি তাদেরকে তাদের শারীরিক সামর্থ অনুযায়ী যে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করতেন।

জীবিকার উপায় করে দেয়া

যাকাতের টাকা ৫০/১০০ টাকা করে দেয়া বা শাড়ী-লুঙ্গি কিনে না দিয়ে এমন কিছু করে দেয়া উচিত যা দিয়ে ঐ ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের সংস্থান হতে পারে।

মূলত: এ যাকাত প্রদানের বিধান হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল। সমগ্র পৃথিবীর আলিমদের অভিমত হলো পরিধান করার অযোগ্য এ শাড়ী-লুঙ্গি একটা একটা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের দারিদ্র্য অবস্থাকে দীর্ঘদিন জাগিয়ে রাখার মত এমনভাবে যাকাত দেয়া উচিত নয়। এখানে ধনী বা সম্পদশালী যাকাতদাতাগণকে একটি বিষয় ভাল করে বুঝতে হবে যাকাতের অর্থ প্রাপ্তি তো তাদের হক বা অধিকার। অন্য কথায় আপনার কাছে পাওনা। এটা তো আপনার পক্ষ থেকে করুণা বা অনুকম্পা বা দয়া নয় যে এটা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দেবেন!

বাংলাদেশে যেহেতু ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা নেই, যাকাত বোর্ডও মিটমিট করে অগুছালোভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেহেতু সেখানে আপনার যাকাতের টাকা না দিতে চাইলে আপনার এলাকায় পরিচালিত সামাজিক সংগঠন যদি থাকে বা ব্যক্তিগতভাবেই প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত রামাদ্বান মাসে) যে যে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয় তার হিসাব করে; যাদের যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে তাদের থেকে নিকটতম অবস্থানের ভিত্তিতে মনে করুন পাঁচটি পরিবারকে নির্বাচন করে তাদের কর্ম, প্রকৃতি ও অবস্থান লক্ষ্য করে নগদ টাকা বা শাড়ী-লুঙ্গি না দিয়ে এমন কিছু কিনে দেয়া যা দিয়ে তাদের আয়ের সংস্থান হবে।

যেমন একজন বিধবাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়া, একজন দরিদ্র কৃষককে দুটি বাছুর/ছাগল কিনে দেয়া বা একখণ্ড জমি রেখে দেয়া, যারা ব্যবসা করতে পারবে তাদেরকে ছোট পরিসরে ব্যবসায়ের মূলধন দেয়া, এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিনের তত্ত্বাবধানে ঠেলাগাড়ী, ভ্যানগাড়ী, ট্যাক্সি, রিক্সা কিনে দেয়া, যার যার যোগ্যতা অনুসারে দা, হাতুড়ী, কাস্তে, কোদাল, কুড়াল কিনে দেওয়া যায়। এতে কর্মহীন মানুষের কর্মের সংস্থান হবে। কেউ কেউ হয়তো বা ভাবছেন আমার তো এত টাকা হয় না আমার যাকাত কম আসে তাই আমি কয়েকটি শাড়ী-লুঙ্গি দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলব, আপনারা আরো কয়েকজন ভাই যারা যাকাত দেয় তাদের সাথে একত্রিত হয়ে তো পরিকল্পিতভাবে এমন কাজগুলো করতে পারেন। তাহলে তো এ মানুষগুলো অলস কর্মহীন বা বেকার অবস্থায় থাকবে না। তারা তাদের দু'খানা হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করে নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের আয় দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবারে ফিরিয়ে আনতে পারবে শান্তি ও সমৃদ্ধি। আর এভাবে তাদের অভাব ঘুচে গেলে এক সময় তারাও তাদের নিকটতম প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন যারা

অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয় তাদেরকে সাহায্য করতে শিখবে, সমাজ ব্যবস্থা হবে উন্নত, মানুষ হবে কর্মমুখর। অন্যদিকে দৈন্য ঘুচে গেলে, অভাব মুছে গেলে মানুষ আল্লাহর প্রতিও মাথা ঝুঁকাবে; হতে চেষ্টা করবে খাঁটি মুসলিম।

যখন দেবেই তখন সচ্ছল করে দেয়া

যাকাত দেয়ার ব্যাপারে অভিমত হলো যাকাত এমন পরিমাণে দেয়া দরকার সে যেন আর অন্য কারোর মুখাপেক্ষী হতে না হয়। পরবর্তী বছরগুলো থেকে সে-ই যেন যাকাত দেয়ার যোগ্য হতে পারে; এভাবে যদি পরিকল্পিতভাবে যাকাত দেয়া হয় তাহলে এক সময় এসে এই বাংলাদেশে যাকাত নেয়ার মত লোক পাওয়া যাবে না। যার প্রমাণ আমরা পাই ইসলামের প্রথম যুগে হযরত উমার (রা.)-এর যুগে। হযরত উমার (রা.) যাকাতের সম্পদ দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তবিকই ধনী ও সচ্ছল বানিয়ে দিতেন। সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে কিংবা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে সাময়িক ক্ষুধা বা উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েই ক্ষ্যান্ত হতেন না। সে সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে বসলো। তিনি তাকে তিনটি উট দিয়ে দিলেন। এটা ছিল তাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচানোর জন্যে। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বার বার তা বণ্টন কর, তাতে এক একজন একশ'টি করে উট পেয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

তাবেয়ী ফিকাহবিদ আতা বলেছেন, "কোন মুসলিম ঘরের লোকদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করলে পূর্ণমাত্রায় দাও। ওটাই আমার নিকট পছন্দ।"

বিয়েতে সহযোগিতা প্রদান

ইসলামী শরীয়াহ মতে মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটির বাইরেও মানুষের স্বভাবজাত কিছু প্রয়োজন বা তাগিদ রয়েছে, যা না হলে মানুষের জীবন পূর্ণতা পেতে পারে না। সে প্রয়োজন পূর্ণ করা একান্ত আবশ্যক। আর তা হচ্ছে বংশ পরম্পরায় জাতি সংরক্ষণ ও যৌন প্রবণতার চরিতার্থতা বিধান। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ বিশাল পৃথিবী আবাদ করণ ও মানব বংশ সংরক্ষণে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন মানব– নর ও নারী, দিয়েছেন তাদের একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সীমা ও নিয়ম পদ্ধতি।

অন্যদিকে ইসলাম অবিবাহিত জীবন যাপন অথবা পাশ্চাত্যের ন্যায় নারী-পুরুষের অবাধ আচরণ কোনটিকেই সমর্থন করে না। আর তাই মানুষের যৌন ও

প্রজনন শক্তি দমনের অন্যায় ও অবৈধ পন্থাকে সমর্থন না দিয়ে বরং প্রত্যেক দৈহিক সামর্থবান নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ নির্দেশ সত্ত্বেও যারা কন্যাদায়গ্রস্ত বা যারা পুরুষ অথচ বিয়ের খরচ ও মোহর দেয়ার সমস্যায় বিয়ে করতে পারছে না তাদের মাঝে যাকাতের অর্থ বন্টন করা এবং সেই পরিমাণ দেয়া যে পরিমাণে তাদের বিয়েগত সমস্যা কেটে যায়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

"আর তোমরা বিবাহ করাও তোমাদের মধ্যে যে পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে নারীর স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মাঝে যারা সৎ ও বিয়ের যোগ্য তাদেরও, যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন-নূর : ৩২)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

"রাসূল (সা.) বলেন, তোমাদের যে কেউ সামর্থবান হবে, সেই যেন বিয়ে করে। কেননা, এই বিয়েই তার দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং তার যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করবে অতীব উত্তমভাবে। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ না তার রোযা রাখা উচিত। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৭৭০)

জ্ঞান অর্জন ও বইপত্র দেয়া

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত যে কিতাব আল-কুরআনুল কারীম তার প্রথম কথাই হলো পড়। অর্থাৎ মানুষকে আদর্শ জ্ঞান অর্জনের প্রতি আল্লাহ তায়ালা আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দেশ্য মানুষ জ্ঞান অর্জন করলে কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কোনটি করা উচিত, কোনটি করা অনুচিত, কিভাবে স্রষ্টাকে চেনা যায়, স্রষ্টার কথা জেনে মানবতাবোধকে জাগ্রত করা যায় ইত্যাদি খুব সহজেই জানবে এবং মেনে চলবে। যারা আদর্শ জ্ঞান অর্জন করবে না তারা হবে

মূর্খ। তারা স্রষ্টাকে চিনবে না, জানবে না। আর বাস্তবেও দেখি তাই, কেউ কেউ বলে আল্লাহ বলতে কিছু নাই। পৃথিবীতে সবকিছু নাকি এমনিতেই হয়। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের লক্ষ্য করে বলেন,

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب

"ওদের জিজ্ঞেস কর, যারা জানে আর যারা জানে না এই উভয় ধরনের লোক কী সমান হতে পারে? কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" (সূরা আয-যুমার : ০৯)

এখানে যে জানার কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্য ব্যাপকভাবে জানার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুসলিম সমাজ তার এই জীবনে যত কিছু জ্ঞানের মুখাপেক্ষী তা সবই শিখতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সমাজ সভ্যতা পরিচালন ও সংগঠন সংক্রান্ত সব শিক্ষা শামিল রয়েছে।

এ কারণে ইসলামের ফিকহবিদগণ যাকাত বণ্টনের বিধানে ঘোষণা করেছেন, জ্ঞান অর্জনে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে তার অংশ দিতে হবে– দেয়া যাবে। অথচ ইবাদাতের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগকারীর জন্যে তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তার কারণ ইবাদাতের জন্যে উপার্জন বিমুখ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু জ্ঞান ও তাতে বুৎপত্তি অর্জন একনিষ্ঠ ও একান্ত হয়ে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। উপরন্তু ইবাদাতে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজ নিজের জন্যে আর জ্ঞান অর্জনকারীর কাজ তার নিজের জন্যে যেমন, তেমনি বিশ্ব মানবতার কল্যাণেও।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারা অর্থ সংকটের ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা রীতিমত করতে পারছে না তাদের পড়ালেখার ব্যবস্থাকল্পে যাকাতের অর্থ তাদের শিক্ষার জীবনকে উজ্জ্বল-আলোকিত করতে পারে। তাদেরকে করে তুলতে পারে জাতির জন্য বিশাল সম্পদ। কেননা, আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ একথা কেইবা না জানে?

ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা

সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলক প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ হলো যাকাত। যা দরিদ্রের হক। যা দরিদ্রেরা গ্রহণ করে ধনীদের প্রতি ইহসান করে থাকে। কেননা উমার (রা.)-এর শাসনামলের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম সম্পদশালীরা যাকাতের অর্থ সাথে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু যাকাতের অর্থ নেয়ার মত দরিদ্র খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়েছেন, দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন দরিদ্রের হক আমার কাছে থাকলে না জানি আল্লাহ আমার

সাথে কেমন আচরণ করেন! না জানি হক অনাদায়ের দায়ে আমি অভিযুক্ত হয়ে যাই ইত্যাদি। সেই দীন ইসলাম আজও পৃথিবীর বুকে আছে। কিন্তু নেই সেই সময়কার মত তাওহীদবাদী মুসলিম। অর্থাৎ মুসলিম আছেন কিন্তু নেই সেই রকম মনোবৃত্তি গঠনের পরিবেশ, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেই সেই রকম আয়োজন। তাই আজ যাকাত নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে নতুন করে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভাবতেও হচ্ছে। অথচ ইসলামী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো যাকাত। অন্যদিকে চারধারে যখন অধিকার বঞ্চিত ভুখা মানুষের কান্না শোনা যায়, নিরন্ন, বস্ত্রহীন হাড় কাঁপা শীতে কেঁপে কেঁপে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার কথা শুনা যায়, বন্যায় ঘর-বাড়ি সব তলিয়ে নেয়ার দৃশ্য দেখা যায়, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখা যায়, ঋণ ভারে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দেখা যায়, আদর্শ শিক্ষার অভাবে গণ্ড মূর্খ মানুষকে পশুর ন্যায় আচরণ ও কর্ম করতে দেখা যায়, তখন প্রতিবেশী সম্পদশালীরা চুপ করে থাকবে বা থাকতে চাইলেও শান্তিতে থাকতে পারবে তা কী করে হয়! বর্তমান সময়ে সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনে ঘটে যাওয়া অনৈতিক অন্যায় আচরণ বলে আমরা যেগুলোকে চিহ্নিত করি তার সিংহভাগ কি দরিদ্রদের অভাব, জেদ প্রবণতা, না পাওয়ার খেদোক্তি ও হতাশা আর সম্পদশালীদের অধিক সম্পদের লোভ-লালসা অথবা সম্পদের পাহাড়ের তোড়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এমন লজ্জাহীনতার ফলাফল নয়? আমার তো মনে হয়, অপহরণ, ছিনতাই, রাহাজানি, অন্যের হক হরণ, কাটাকাটি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ সহ মানব চরিত্রের নেতিবাচক অধিকাংশ কর্মকাণ্ড এজন্যেই ঘটে থাকে। আর তাই তো ধনী দরিদ্র্যের বৈষম্য কমিয়ে আনতে পারলে, সচেষ্ট হলে, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হকদারদের যথাসম্ভব হক আদায় করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে যেমন সম্পদ দাতা মালিক (আল্লাহ) খুশী হবেন তেমনি মানুষের মধ্যেও গড়ে উঠবে সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। কমে যাবে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, কলহ।

অন্য কথায় যাকাত হিসেবে পরিমাণ মত অর্থ ও দ্রব্য তো তাদেরই হক। যে হক সম্পদের প্রকৃত মালিক আদায় করে দিতে সম্পদের তত্ত্বাবধায়ককে আদেশ দিয়েছেন। সে সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করে দিতে অনুগত তত্ত্বাবধায়কের মনে প্রশ্ন বা এত সম্পদ দিয়ে দেব তা কি করে হয় এমন চিন্তা আসাই তো মালিকের কথা অমান্য করার শামিল।

একটু চিন্তা করুন, আপনি কাউকে কোন কিছু দেখাশুনা এবং বৃদ্ধির চেষ্টা করে জীবন ধারণ করার লক্ষ্যে দায়িত্ব দিলেন, সে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করলে।

আপনি তাকে আরো দেবেন এটাই স্বাভাবিক। এভাবে এক সময় এমন একটা পরিমাণ সম্পদ তার কাছে জমা হলো যে, এখন আর তার বা তার একান্ত অধীনে যারা আছে তাদের সব চাহিদা পূরণে সমস্যা হচ্ছে না। বরং চাহিদা পূরণ করে নির্দিষ্ট সময় শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি তাকে একটা ন্যূনতম পরিমাণ তার পাশাপাশি যাদের নেই তাদেরকে দিতে আদেশ প্রদান করলেন। কিন্তু সে দিল না। এতে আপনি মালিক হিসেবে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন? বলুন! থাকতে পারে কেউ! হ্যাঁ তারপরও যাকে আপনি এতদিন ভালবেসে সম্পদ দিয়েছেন ঠিক আজই একটা আদেশ অমান্য করায় তার সম্পদ হয়তো আপনি কেড়ে নেবেন না। কেননা আপনি তো তাকে ভালবাসেন, তাই হয়তো আপনার আদেশ অব্যাহত রেখে আপনি তাকে আরো সম্পদ দিয়ে চাইবেন যে দেখি না সে ফিরে আসে কি না, কখনো ভুল স্বীকার করে কিনা, কখনো দেয় কিনা। কিন্তু তারপরও যদি সে না দেয় তখন আপনি তাকে অশান্তি দিয়ে পরীক্ষা করা, তারপরও না বুঝলে অসুস্থতা দান করা, তারপরও সেই আদেশের প্রতি মাথা নত না করলে সম্পদ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা কি করবেন না, বা করা কি আপনার জন্য বেঠিক হবে? আল্লাহ যদি সেটি করেন তাহলে কী ভুল হবে। না প্রশ্নই আসে না ভুল হওয়ার। আর তাই তো আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে– "সকাল বেলা আমীর রে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা" এটি যথার্থ। আমার এ বয়সেই আমি কয়েকজন সম্পদশালীকে দেখেছি তার জীবদ্দশায় সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হতে আবার এমন লোককেও দেখেছি তেমন ছিল না কিন্তু আজ অনেক কিছু আছে। বিতর্ক করার সুযোগ নেই। আজ অনেক কিছু আছে অর্থ এই নয় যে সে খুব আল্লাহ ভক্ত আর যার নেই সে একদম আল্লাহ ভক্ত নয়।

আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তার একটা অংশ নির্দিষ্ট সময় শেষে আমার প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে দিতে হবে বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে দেব? কী পরিমাণ দেব বা দেয়া উত্তম!

জবাবে বলব, একক ব্যক্তিকে নয়, সকলেই কোন না কোন পরিবারের সদস্য হওয়ায় পরিবারের সকল সদস্যের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের দ্বারা সম্ভব কোন কাজ এবং সেই কাজে উৎসাহী ও মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সেই কাজের সহায়ক উপকরণ যা হবে উৎপাদনমুখী, বর্ধনশীল তা দেখে শুনে পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা করে দেব। যেমন কোন একটি পরিবারে ৫ জন সদস্য– বাবা বয়স ৪৫, মা (৩৮), বড় মেয়ে (১৮), মেঝো ছেলে (১৬), ছোট ছেলে বয়স (৬) বছর (কাল্পনিক)। এ পরিবারের বাবা কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক, বড় মেয়ে ও ছেলে অর্থাভাবে পড়ালেখা করতে পারেনি, ছোট ছেলে স্কুলে ও মাদরাসায় যাওয়া আসা করে। মনে করুন, আপনার যাকাত বাবদ অর্থ হলো ৫০,০০০ টাকা। এ পরিবার

আপনার একান্তই কাছের হওয়ায় তাদের হক আপনার কাছে বেশি। কিন্তু আরো দু/তিনটি পরিবার অতীতের ধারাবাহিকতায় আপনার কাছ থেকে এবারও যাকাতের অর্থ পাওয়ার প্রত্যাশী। অতীতে আপনি তাদেরকে কিছু কিছু টাকা দিয়েছেন। সুতরাং এবারও তারা আপনার কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। যাহোক প্রথম পরিবার একটু বেশি কাছের হওয়ায় এবার তাদের প্রতি পরিবারের সদস্য অনুসারে আপনি যা করতে পারেন তাহলো :

পরিবারের প্রধান একজন ভূমিহীন কৃষক হওয়ায় তাকে কর্ম উপযোগী এক খণ্ড জমি মনে করুন ২০,০০০ টাকা দিয়ে (সন জমার পদ্ধতি অনুসারে) সংস্থান করে দেয়া হলো, মেয়েকে ৩,০০০ টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হলো, যে ছেলেটি পড়ালেখা করতে পারেনি তাকে ৬,০০০ টাকা দিয়ে দু'টি ছাগী কিনে দেয়া হলো, সে ছাগী পালনে আনন্দবোধ করতে করতে এক বছরে ছাগীগুলো বাচ্চা দেবে দু'বার। প্রত্যেক বার ২/৩টি করে বছর শেষে একটি ছাগী বাচ্চা দেবে ৪/৬টি। এভাবে দুটি ছাগী দেবে ৮/১২টি। এরপর এ ছাগী থেকে দুধ পাওয়া যাবে যে দুধ পান করে পরিবারের সদস্যরা অনেক জটিল রোগে সংক্রমিত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের মধ্যে সে একটি ছাগলের খামারের মালিক হতে তো পারবেই পাশাপাশি প্রয়োজনে ঈদুল আযহাতে ছাগল বিক্রি করে সে আরো চাষাবাদযোগ্য জমি ও অন্যান্য বর্ধনমূলক আয়ের ব্যবস্থা শুরু করতে পারবে।

আর ছোট ছেলের পড়ালেখার জন্যে তাদের বাবার সাথে আলোচনা করে এক বছর পড়ালেখা বাবদ যদি ৫,০০০ টাকা দেয়া হয় তাহলে প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বা মাদরাসায় হলে নজরানা ক্লাসে পড়ালেখার ক্ষেত্রে খাতা-কলম ও বই-কিতাব কেনার জন্যে তেমনটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এভাবে (২০,০০০+৩,০০০+৬,০০০+৫,০০০) মোট ৩৪,০০০ টাকার উৎপাদনমুখী উপকরণসহ আরো ৬,০০০ টাকা নগদ দিয়ে তখনকার সময়ে অন্যান্য দৈনিক নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মোটামুটি পূরণের লক্ষ্যে দেয়া হলে পরবর্তী বছরেই তাদেরকে আর যাকাত বাবদ তেমন অর্থ ও উপকরণ না দিলেও সে ছোট ছেলের পড়ালেখা গতিশীল রেখে সমাজে সুন্দরভাবে জীবন ধারণ করতে পারবে। এবার আপনার যাকাতের বাকী ১০,০০০ টাকা এ বছর অন্যান্য দু/তিনটি পরিবারে কম করে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই দেয়া যেতে পারে।

তারপর দ্বিতীয় বছরে আবার আপনার যাকাতের টাকা মনে করুন ৫০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (কুরআনে আল্লাহর ঘোষণা যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়) ৬০,০০০ টাকা হলে এই বছরের অন্য যে দু/তিনটি ভিকটিম পরিবার আছে তাদের সদস্যের প্রকৃতি অনুসারে এভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চতুর্থ বা পঞ্চম

বছরের মধ্যেই আপনার নিকটতমদের মধ্যে যাকাত নেয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি তখন নিজ এলাকার বাইরে বা দূরের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দেরকে আপনার টার্গেটে নিয়ে আবারও অর্থ প্রদান করলে এরপর ষষ্ঠ বছর থেকে আপনি নিজ এলাকার বাইরে বা দূরের যাকাত গ্রহণকারী লোকজনদের মাঝেও এ অর্থ প্রদান করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করে দিতে পারবেন।

উপরে আলোচিত ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদানের প্রথম এ প্রস্তাবনা পড়ে কেউ কেউ হয়তোবা ভাবতে পারেন আমার তো বছরে ৫০,০০০ টাকা যাকাত হয় না, আমার তো হয় ২৫,০০০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে আমি কিভাবে প্রদান করব?

এমন ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো আপনাকেও নির্বাচন করতে হবে আপনার নিকট আত্মীয়দের মাঝে কে বা কারা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার উপযোগী। এখানে নির্বাচন করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, আপনার কোন কোন আত্মীয় আছেন যারা মুখ দিয়ে আপনার কাছে চাইতে লজ্জা পায়, চাইতে অস্বস্তিবোধ করে অর্থাৎ আল-কুরআনুল কারীমে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্যান্যদের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া উত্তম।

মনে করুন, একটি পরিবারে বাবা (৪০) মা (২৮), ১ম মেয়ে (১২), দ্বিতীয় মেয়ে (৮), তৃতীয় ছেলে (২), এ পরিবারে বাবাই একমাত্র কর্মক্ষম আর তিন সন্তানের মধ্যে ২ জনই স্কুলগামী এবং ছেলে ছোট। সুতরাং এবার বাবার কর্ম উপযোগী কোন ব্যবস্থায় অর্থের যোগান দেয়া যেতে পারে। অধিকন্তু স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের দু'জনই মেয়ে হওয়ায় তাদের বসবাস গ্রামে হওয়ায় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এইচ এস সি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকায় সেখানে পড়ালেখার খরচ বলতে শুধু বই-খাতা, কলম, স্কুল ড্রেস ও প্রাইভেট টিউটরের সম্মানী ইত্যাদিরই শুধু যোগান দিতে হয়। যদিও স্টাইপেন্ড বা বৃত্তি ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে চালু আছে, কিন্তু এ টাকাও সংসারের খরচ যোগাতে বাবা-মা খরচ করে ফেলেন। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পথকে সুগম করে দেওয়ার লক্ষ্যে যথাসম্ভব একটা পরিমাণ অর্থ বিবেচনায় এনে বাকী সব টাকা অতীতের ধারাবাহিকতায় কাউকে কাউকে দেয়া যেতে পারে। যেমন বিধবা, বিকলাঙ্গ, কর্মক্ষম, অসুস্থ রোগী প্রভৃতি।

বিভিন্ন সংগঠন, মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কর্তৃক যাকাত আদায় ও বণ্টন

বাংলাদেশে প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন কার্যক্রম শত ভাগ সফল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রধানের প্রণীত নীতি ও লোকবলের অভাবে ধনী ও দরিদ্র উভয়

শ্রেণীই যখন বিপাকে তখন ধনীদের প্রতি যাকাতের অর্থ নিয়ে ইহসান করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসে বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থা, মসজিদ, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও ইয়াতীমখানার পরিচালকরা। আলহামদুলিল্লাহ। যথেষ্ট কাজ তারা করেছেন। কিন্তু এ কাজগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা মাফিক না হওয়ায় কিন্তু পরবর্তীতে সঠিক ও যথার্থ তত্ত্বাবধান না হওয়ায় তার সুফল স্থায়ীভাবে মানুষ পাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে—

০১. যাকাত আদায় হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো এর প্রকৃত হকদারদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়া। অতএব যাকাতের টাকায় মসজিদ বানানো বা কোন লা-ওয়ারিশ মুর্দার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করা জায়েয নেই; কেননা এখানে কাউকে মালিক বানানোর মত কোন অবস্থা পাওয়া যায় না। (আদ-দুররুল মুখতার, ২য় খণ্ড)

০২. যাকাতের টাকা এমন কোন সংগঠন বা মাদরাসায় দেয়া– যেখানে তা শুধু গরীবদের মাঝে খরচ করা হয় না বরং কর্মচারীদের বেতন বা নির্মাণ খাতে খরচ করা হয়; যা সম্পূর্ণ নাজায়িয। অবশ্য যদি কোন সংগঠন বা মাদরাসায় গরীব ছাত্রসহ অন্যান্য মিসকীনদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য দেয়া হয় তবে এ রকম মাদরাসা বা সংস্থায় যাকাত প্রদান করা জায়েয। তবে এ যাকাত তখনই আদায় হবে যখন ঐ টাকা নগদ দেয়া হবে বা ঐ টাকার পরিবর্তে খাবার গরীবদেরকে দেয়া হবে অথবা অন্য কোন বস্তু যেমন কাপড় বা লেপ ইত্যাদি জিনিসের জন্য তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

০৩. বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসায় যদি কেউ যাকাতের অর্থ দিয়ে কিতাব দান করে এবং ঐ কিতাবগুলো যদি শিক্ষার্থীদের মালিকানা স্বত্বে দিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ এ কিতাবগুলো আর ফেরত নেয়া হবে না এমন শর্তে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে নতুবা আদায় হবে না।

০৪. বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন মাদরাসা বা ইয়াতীমখানায় শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিতাব পড়তে দেয়া হয়; যার নিয়ম হচ্ছে, বছর শেষে ফেরত দেয়া এসব কিতাবও এমন শর্তে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেয়া ও ফেরত নেয়ায় এতে শিক্ষার্থীদের কোন মালিকানা প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় যাকাতের টাকা দিয়ে এ কিতাব কেনা জায়িয নেই।

তবে যদি বিষয়টি এমন হয় যে, যাকাত প্রদানকারী কিতাব কিনে গরীব-মিসকীন ও ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের মাঝে তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা শর্তে দিয়ে দিল, সেই শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ করে বছরান্তে পরীক্ষা শেষে সে যখন উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলো তখন সে তা অনুজ শিক্ষার্থীদের জন্য স্বেচ্ছায় বা

স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে দেয় তবে এ দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এতে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি যেমন যাকাত প্রদানের জন্য সাওয়াব পাবেন, সাথে সাথে ঐ গরীব ছাত্রটিও পরবর্তী বছরের শিক্ষার্থীদেরকে তার কিতাবাদি দিয়ে দেয়ায় নফল সাদাকার সাওয়াব পাবেন।

০৫. গরীব শিক্ষার্থীদেরকে পড়ালেখার জন্য যাকাত ফান্ড থেকে বৃত্তি দেয়ার বিধান জায়িয। তবে বিভিন্ন সংগঠন যাকাতের অর্থ থেকে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের এসএসসি, দাখিল, এইচএসসি, আলিম ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে পড়ালেখার সহায়তায় বৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে। এতে বৃত্তি পাওয়ার উপযোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি শর্ত থাকে যা সর্বস্তরের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের কল্যাণের প্রতিবন্ধক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, তাই এই ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলছি :

একটি শর্ত হলো দরিদ্র ও মেধাবী হতে হবে, এ শর্তের জবাবে আমার মনে যা আসে তাহলো যেহেতু যাকাতের ফান্ড থেকে বৃত্তি দেবেন তো এতে সকল দরিদ্র যারা যারা আবেদন করবে তারা সবাই তো হকদার, তাছাড়া ন্যূনতম একটা রেজাল্টের কথা তো উল্লেখ আছেই, কিন্তু এরপরও অত্যন্ত ভাল রেজাল্টের অধিকারী হতে হবে তার মানে কী? আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম সবাইকে তো দেয়া সম্ভব নয়, ফান্ডের সীমাবদ্ধতা বলে তো একটা কথা আছে; তাই এ শর্তটি মেনে নেয়ার মতই।

দ্বিতীয় শর্ত দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ সম্বলিত আবেদনপত্র জমা দেয়া– এ শর্তের জবাবে বলব, একজন লোক দরিদ্র তো এজন্যই যে, তার বা তাদের পরিবারের সাথে স্বনামধন্য বা এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদদের তেমন ভাল সম্পর্ক নেই।

যিনি সুপারিশ করবেন তিনি যদি উচু মাপের ব্যক্তি না হন তাহলে তার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এবার যারা এমন উচু পর্যায়ের তারা থাকেন শহরে; গ্রামে যান শুধু নির্বাচনকালে এ কথা তো গ্রাম প্রধান এলাকার লোকজন সবাই জানে। এবার গ্রামের ঐ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্যে আবেদন করতে চাইলে সে আবেদন কিভাবে করবে বলুন, বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর পেতে হলে তাদেরকে ঢাকায় আসতেই অনেক টাকা গাড়ি ভাড়া দিতে হবে যা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব।

যাক সেসব কথা। এবার আমার অভিমত বলছি, যেহেতু এ ফান্ডে প্রাতিষ্ঠানিক সিস্টেমেই প্রতি বছর যাকাতের অর্থ জমা হচ্ছে সেহেতু স্কুল-কলেজের প্রধানসহ স্ব-স্ব এলাকার ইমাম সাহেবদের সুপারিশের ভিত্তিতে দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের কয়েকজনকে (ফান্ড অনুযায়ী) নির্বাচন করে তাদের পরবর্তী শিক্ষা জীবনের সফল

সমাপ্তির লক্ষ্যে বা প্রয়োজনে বিদেশে পাঠিয়ে বিশ্ব স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে তাদেরকে ভবিষ্যতে বিভিন্ন চেয়ারে বসার সুযোগ প্রদান করলে সে যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারবে তা হবে অতুলনীয় বা টাকার অংকে পরিমাপ অযোগ্য। সে দেশ ও জাতির জন্য পরবর্তীতে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারবে।

০৬. মাদরাসা ও ইয়াতীমখানায় শিক্ষার্থীদের যাকাত দেয়া হলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। একটি হলো যাকাত প্রদানের সাওয়াব, আর অপরটি হলো ইসলামী শিক্ষায় সহযোগিতার সাওয়াব। অবশ্য একটি কথা বলে রাখা ভাল– যাকাতের অর্থ এমন মাদরাসাতেই দেয়া উচিত হবে যে মাদরাসার ব্যবস্থাপক পরিচালকের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ও অগাধ আস্থা আছে যে, তারা যাকাতের অর্থ সঠিক খাতেই ব্যয় করবে।

সবশেষে যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হলো এদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন যাকাত তাদের লোকবল, কাঠামো বিন্যাস, বাধ্যাতামূলক আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা মাফিক পরিচালনার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাছাড়া বলতে দ্বিধা নেই এদেশে যাকাত বোর্ডের অবস্থান হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে বটগাছের উপর জন্ম নেয়া পরগাছা বা আগাছা তুল্য। ফলে এ সংগঠন তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। এরই দুর্বলতায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেবামূলক সংস্থা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে ধনীদের কাছ থেকে যা যাকাত বাবদ অর্থ পেয়েছে তা দিয়ে সাধ্যমত দরিদ্রদের সেবা, ইয়াতীমদের শিক্ষা প্রকল্প পরিচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তার ফল খুবই সীমিত। কাজেই দেশের বৃহত্তম পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যাকাত আদায় ও বন্টনকে রাষ্ট্রীয় একটি গতিশীল ও চলমান অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান

ইসলাম প্রবর্তিত যাকাত ব্যবস্থা সম্পদশালী মুসলিমদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে সম্পদহীন তথা আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আট শ্রেণীর লোকজনের মাঝেই বিতরণযোগ্য। এই অর্থে অমুসলিমদেরকে যাকাতের অর্থ বা মাল প্রদান কোনভাবেই জায়েয নয়।

অমুসলিমদেরকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

০১. দারুল হরব বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই।

০২. যিম্মী অমুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। অবশ্য তাদেরকে নফল দান-খয়রাত করা জায়েয আছে।

০৩. দারুল হরবের যে অমুসলিম ব্যক্তি নিরাপত্তা ভিসা গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করে এমন ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন

কতিপয় চতুর ব্যবসায়ী লোক আছেন, যারা হিসাবে বেশ দক্ষ। ফলে আপাতদৃষ্টিতে তারা দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রেই সফল ও সার্থক। কিন্তু আখিরাতে? যাকাতের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে মাকরূহ। যেমন কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্টে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা জমা আছে। তাদের মাথায় আছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয হবে। এইজন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েক দিন পূর্বেই ঢাকার আশেপাশে কম দামে জমি কিনে থাকে; এতে তাঁদের ধারণা হলো বছর শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকাতে তাদের উপর যাকাত ফরয নয়; আবার কোন ব্যক্তির নিকট যাকাতের পশু আছে বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বে সে তা যাকাত ফরয হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় তার উপর যাকাত ফরয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

অন্যদিকে যাকাতদাতার নিয়ত কী ছিল বা আছে তা কোন মানুষ না দেখলে বা জানলেও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর কাছে তাতো অস্পষ্ট বা অজানা নয়। সুতরাং যাকাত দেয়ার উপযোগী ভাই-বোনদের এ বিষয়টি খেয়াল রেখে ফাঁকি দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে সচেতন থাকা চাই।

আবার কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে পারিবারিক খরচ নির্বাহ করার জন্য তা বিক্রি করে দিলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যাকাত আদায় না করে মারা যাওয়া

কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর আদায় করার পূর্বে সে যদি মারা যায়, তবে মরার পূর্বে অসিয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে যাকাত আদায় করা হবে। আর অসিয়ত না করে গেলে উত্তরাধিকারদের উপর তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করা ফরয নয়। তবে আদায় করে দেয়া ভাল। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر

حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه

وسلم فقال يا رسول الله إن امى افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ করে মারা গেছেন এবং কোন অসিয়ত করতে পারেনি। আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে অসিয়ত করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদাকা দান করি তাহলে কি তিনি এর সাওয়াব পাবেন? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২১৯৭)

যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং কাউকে ঋণ দেয়া

কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত যাকাতের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নেই। উসূলকৃত যাকাতের টাকা কাউকে ঋণ দেয়াও জায়েয নেই। আস্তে আস্তে দেব এমন বলে দীর্ঘদিন ধরে দেয়াও জায়েয নেই।

প্রকৃতপক্ষে যাকাতের যে ৮টি খাত আছে এর সবগুলি জরুরী বা তৎক্ষণাৎ পূরণযোগ্য খাত। পুঁজি বর্ধন বা পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করার মত কোন খাত নয়। যেমন সালাত, হাজ্জ যখন সময় তখনই আদায় করে নিতে হয় ঠিক তেমনি যাকাতও সব সময় ইবাদাত মনে করে প্রদান করে দিতে হবে।

অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের জরুরী তহবিল হল যাকাত তহবিল। সুতরাং কোনভাবেই যাকাত তহবিল বিনিয়োগ যোগ্য নয়।

নোট চেক ইত্যাদি দ্বারা যাকাত দেয়া

কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে। পূর্বে যখন ধাতব মুদ্রার লেনদেন ও প্রচলন ছিল আর কাগজী নোট তার রশিদ বা সনদ, তখন কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান ও তা আদায় প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধাতব মুদ্রার লেনদেন নেই বললেই চলে। কাগজী নোটই মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য। কাগজী নোট থাকলেই তাকে ধনী বলে গণ্য করা হয়, তার উপর যাকাত, হজ্জ ফরয হয়। তাই বর্তমানে কাগজী নোট দ্বারা যাকাত প্রদান করা হলে তা আদায় হবে।

নিসাবের মালিক ব্যক্তি নোট বা ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করলে যখন ঐ চেক ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে তখনই মালিকের যাকাত আদায় হবে। তার পূর্বে নয়। প্রদত্ত চেক যদি কোন কারণে ভাঙ্গানো না হয় অথবা চেক হারিয়ে বা পুড়ে বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিকের যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় ঐ যাকাত আদায় করতে হবে।

মানি-অর্ডার যোগে যাকাত দেয়া

ডাকঘরে যাকাতের টাকা প্রদান পূর্বক যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি তা মানি-অর্ডার করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ওই নগদ টাকা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। কারণ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীক বা মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানি-অর্ডারের টাকা হস্তগত করলে মালিকের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কোন কারণে টাকা ঐ ব্যক্তির হাতে না পৌঁছলে মালিকের যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত বাবদ প্রদত্ত টাকা শুধু নিজের মালিকানা থেকে বের করে দিলেই যাকাত আদায় হবে না বরং হকদারের হাতে অর্পণ করলে তখন তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

যথার্থভাবে যাকাত আদায় না করার ফলে সমাজ ও সামাজিকতার চিত্র

০১. মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই এ সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে।

০২. হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৩. দুর্নীতি চরম পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

০৪. ঘুষ ও সুদের প্রতি এক শ্রেণীর লোক ঝুঁকে পড়েছে।

০৫. অপহরণ, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ, অপরের সম্পদ জোর-জবরদস্তি করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেয়া বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৬. কারে মেরে কারে খাবে এমন কুনীতির বিস্তার ঘটছে।

০৭. সহমর্মিতা ও সহানুভূতির বিপরীতে অসহযোগ অবস্থা বিরাজ করছে।

০৮. কোন কোন ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহ বিমুখতায় মানুষ ধাবিত হচ্ছে।

০৯. দেশ ও বহির্বিশ্বে মানব সম্প্রদায় থেকে মানবতা বিদায় নিচ্ছে।

১০. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা– এ মনোভাবের বিস্তার ঘটছে।

১১. থাকলে খাও না থাকলে দু'চোখ বড় করে চাও– এ প্রবাদের বিস্তার ঘটছে।

১২. সমাজ ও সামাজিক জীবনে অন্যায় অপকর্ম, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে দেশ সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

১৩. মানুষ ইসলামী যিন্দেগী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

১৪. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে।

১৫. বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

১৬. আর্থ-সামাজিক অবস্থা নাজুক হচ্ছে।

সুতরাং দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে যে সমস্যার কবলে নিপতিত তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে যারা ধনী ও সম্পদশালী তাদেরকে যথার্থভাবে যাকাত ও উশর আদায়ে উজ্জীবিত করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابن عباس قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المراة تلقى القلب والخرص

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ঈদের দিন নবী (সা.) বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোন নামায (নফল বা সুন্নাত) পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন। (এ সময়) বিলাল (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের চুড়ি ও কানবালা খুলে দিতে থাকল।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৩৮)

عن ابى موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء

আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সাহায্যপ্রার্থী রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসত, কিংবা তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন মিটাবার

আবেদন করা হত, তখন তিনি বলতেন : তোমরা সুপারিশ কর, তার জন্য তোমরা পুণ্য লাভ করবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর যবানীতে যা চান তাই আদেশ করেন।"

(ঐ, হাদীস নং ১৩৩৯)

عن اسماء قالت قال لى النبى صلى الله عليه وسلم لا توكى فيوكى عليك

আসমা বিনতে আবু বাকর (রা.) বলেন, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন : (দান না করে) সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।" (ঐ, হাদীস নং ১৩৪০)

عن عبدة وقال لا تحصى فيحصى الله عليك

আবদা ইবনে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) আসমা (রা.)কে বলেছেন : (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৪১)

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر شعبة عن عمرو بن مرة ممن خيشمة عن عدى بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة

আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের কথা উল্লেখ করে (আল্লাহর কাছে) এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং তিনবার মুখ ফিরিয়ে অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করলেন। অত:পর তিনি বললেন, তোমরা দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যদি তা এক টুকরো খেজুরের মাধ্যমেও হয়। আর যদি তোমরা এতটুকু দান করতেও সমর্থ না হও তাহলে ভাল কথার মাধ্যমে দোযখ থেকে বাঁচো।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২২২০)

রাসূল (সা.) আরো বলেন :

أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك

"খরচ করো তবে কত খরচ করলে তা গুণে রেখো না। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন (অর্থাৎ কম দিবেন)।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২২৪৫)

উল্লেখিত হাদীসগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস যেমন লাঘব হবে তেমনি সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা পাবে মানবতাবোধ এবং সমাজ-সামাজিকতায় প্রতিফলন ঘটবে আদর্শিক ধারার।

যাকাত আদায়কারী আল্লাহ ও ঈমানদারদের বন্ধু, আদর্শ মানুষ

যাকাত যথাযথ হিসাব করে আদায় করা ঈমানদার মুসলিমদের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত যে সকল সম্পদশালী ব্যক্তির উপর ফরয তারা যদি আদায় না করে তবে তারা কোনভাবেই ঈমানদার মুসলিম হিসেবে পরিচিত হতে পারে না, হতে পারে তারা নামমাত্র মুসলিম। কিন্তু তারা কখনোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বন্ধু হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة

ويؤتون الزكوة وهم ركعون

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ– যাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে।" (সূরা আল-মায়িদা : ৫৫)

সুতরাং বক্তব্য স্পষ্ট। যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের হুকুম-আহকামকে মেনে চলে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.) খুশি হন আর জগতের আল্লাহভক্ত মানুষরাও একে অপরকে ভাই-বন্ধু বলে মনে করে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে থাকে। এমন লোকদের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف

وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة ويطيعون

الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

"আর ঈমানদার নারী ও পুরুষরা একে অপরের বন্ধু। তাদের পরিচয় হল, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।" (সূরা আত-তাওবা : ৭১)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিধি বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করেই কোন মানুষ গণ্য হতে পারে আদর্শ মানুষ। পৃথিবীর বুকে আদর্শ মানুষ বা ভাল মানুষ, ফুলের মত পবিত্র মানুষ বানানোর আর কোন ব্যবস্থা বা নীতি নেই। এবার প্রশ্ন আসতে পারে আদর্শ মানুষ তাহলে কারা? তাদেরকে কিভাবে চিনব! আর কেইবা স্বীকৃতি দেবে তারা আদর্শ মানুষ? জবাব অত্যন্ত সহজ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত। কারণ স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই কে বা কারা আদর্শ মানুষ এবং তাদের পরিচয় কী হবে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ নেই আর আদর্শ মানুষ নির্বাচনে ভুল হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
من امن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبين واتى
المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون
بعهدهم اذا عهدوا والصبرين فى البأساء والضراء وحين الباس
اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী তথা আদর্শ মানুষ।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

সপ্তম অধ্যায়

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

'সাদাকাহ' আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ দান। পরিভাষায় যে দান দ্বারা আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করা যায় তাই সাদাকাহ।

ফিতর আরবি শব্দ। এর অর্থ– রোযা ভঙ্গ বা রোযা শেষ করা বা আর রোযা না রাখা। তবে পরিভাষায়, নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যে দেয় ওয়াজিব হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়।

সাদাকাতুল ফিতর হিজরাতের দ্বিতীয় বছর ধার্য করা হয়েছে। আর এ বছরই ফরয হয়েছে রামাদ্বান মাসের রোযা। মূলত: ফিতরা ওয়াজিব হয়েছে রোযাদারের বেহুদা ও অশ্লীল কথা-কাজ থেকে তাকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে। সেই সাথে ফকীর-মিসকীনদের জন্যেও খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, অভাবের লাঞ্ছনা থেকে, ঈদের দিনে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তাদের দূরে রাখাই এর সুফল।

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.) বলেন, সাদাকাতুল ফিতর রামাদ্বানের ক্ষতিপূরক যেমনিভাবে সিজদায়ে সাহু নামাযের ক্ষতিপূরক।

সাদাকাতুল ফিতর এর আরেক নাম যাকাতুল ফিতর। এটি অন্যান্য যাকাত থেকে স্বতন্ত্র এক প্রকারের যাকাত। কেননা এটা ব্যক্তির উপর ধার্য হয়। আর অন্য সব যাকাত ধার্য হয় ধন-সম্পদের উপর। এ কারণে অপরাপর যাকাত ধার্য করার ক্ষেত্রে অনেক শর্ত মেনে চলতে হয়, কিন্তু এখানে রয়েছে তার ব্যতিক্রম। ফলে ফিকহবিদগণ এ যাকাতের নাম দিয়েছেন, মাথার যাকাত, ঘাড়ের যাকাত, শরীরের যাকাত ইত্যাদি। আর শরীর বলতে ব্যক্তি বুঝায়– প্রাণ বা আত্মা নয়।

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব

সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যেমন: ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী, মালিক ও আহমদ প্রমুখের মতে সাদাকাতুল ফিতর ফরয। তবে এই উভয় মতের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মর্মগত সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين

"ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের উপর সাদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।"

(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪০৭)

অন্যত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

حدثنا محمد بن خالد الدمشقى وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى نا مروان قال عبد الله نا ابو يزيد الخولانى وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه نا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلوة فهى زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات

"মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আদ-দামেশকী (র.).... ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর– রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসাবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পর পরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসেবে গণ্য।"

(আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬০৯; সুনান ইবনে মাজা)

ফিতরা কার উপর ওয়াজিব

আযাদ মুসলিম যিনি জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যথা আবাসগৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের সরঞ্জামাদি, খাদ্য দ্রব্য, যুদ্ধের বাহন যথা ঘোড়া, উট, অস্ত্র-শস্ত্র ও খিদমতের দাম ব্যতীত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। (ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড ও আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড)

সাদাকাতুল ফিতর নিজের পক্ষ থেকে ও নিজের নাবালিগ সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا ان تمر على الصغير والكبير والمملوك

"ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপর সাদকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।"
(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪১৫)

فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদ, গোলাম, পুরুষ, স্ত্রী সবার উপর রমযান মাসের ফিতরা ফরয (ধার্য) করে দিয়েছেন। তিনি মাথাপিছু এর পরিমাণ ধার্য করেছেন এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি। রাবী বলেন, লোকেরা এর বিনিময় ধার্য করেছে অর্ধ সা' গম বা আটা।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২১৫১)

তেমনি বাঁদীর ফিতরাও তার মালিকের উপর ওয়াজিব। নারীদের উপরেও ফিতরা ওয়াজিব। চাই তার স্বামী থাক বা না থাক। স্বামী থাকলে তার স্বামীর উপর ফিতরা ওয়াজিব। অবিবাহিতা মেয়ের ফিতরা তার পিতা বা অভিভাবক দেবে এবং অভিভাবক না থাকলে সে নিজে দেবে। ছোটদের উপরেও ফিতরা ওয়াজিব। যদিও সে ইয়াতীম হয়। তার মাল থাকলে তা থেকে তার অভিভাবকরা

ফিতরা দেবে। যদি তার মাল না থাকে তাহলে তার অভিভাবককে তার ফিতরা দিতে হবে। নাবালিগের ফিতরা তার পিতার উপর ওয়াজিব। ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে যে ব্যক্তি মারা যায় তার ফিতরা দিতে হবে না। আর সুবহে সাদিকের পূর্বে যে সন্তান জন্ম নেবে তার ফিতরা দিতে হবে।

ইমাম আবু হানীফার মতে সাহেবে নিসাব ব্যক্তিই ফিতরা আদায় করবে- নিজের পক্ষ থেকে এবং তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস-দাসী সকলের পক্ষ থেকে। সাহেবে নিসাব বা সঙ্গতিসম্পন্ন হলো সেই ব্যক্তি যার নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে সমগ্র বছর এই ধন-সম্পদ বা সমপরিমাণ অর্থ কোন ব্যক্তির হাতে থাকা শর্ত কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে সারা বছর নয় বরং ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকে এই পরিমাণ মাল বা অর্থ তার অধীনে থাকলে তাকে ফিতরা দিতে হবে।

যে রোযা রাখেনি তার উপরও কি ওয়াজিব

কোন ব্যক্তি যদি রোযা নাও রাখে তবুও তাকে ফিতরা দিতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا عقبة بن مكرم البصرى حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فى فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او سواه صاع من طعام

আমর ইবনে শুআইব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অলিতে গলিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন : "জেনে রাখ! প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, আজাদ-গোলাম, ছোট অথবা বড় সবার উপর ফিতরা ওয়াজিব। এর পরিমাণ হল, (মাথাপিছু) দুই মুদ্দ গম অথবা এটা ছাড়া এক সা' পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬২৬)

অমুসলিমরা রোযা রাখে না কিন্তু ইবনে উমার তাঁর অমুসলিম ক্রীতদাসের ফিতরা আদায় করতেন।

যে রোযা রাখেনি তার ফিতরা দেয়ায় উপকার দুটি। প্রথমত: সে মিসকীনদের খাবার সংস্থান করে, যা ফিতরার একটি উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত: রোযা না করে সে যে অপরাধ করেছে এবং তার স্রষ্টার ক্রোধের পাত্র হয়েছে তা থেকে হয়ত সে কিছুটা স্বস্তিও পেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ان الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء

"দান-খয়রাত আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রশমিত করে এবং লাঞ্ছিত মৃত্যু রোধ করে।"
(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬১৫)

কাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়ালীর উপর ওয়াজিব

সম্পদহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়ালীর (অভিভাবকের) উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক মতিভ্রম ও পাগল সন্তানের সাদাকা আদায় করাও ওয়ালীর উপর ওয়াজিব।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং স্ত্রী ও পিতা-মাতার সাদাকা আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

(আল-হিদায়া ১ম খণ্ড ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

এক ভাইয়ের সাদকায়ে ফিতর অন্য ভাইয়ের আদায় করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোন নিকট আত্মীয়ের ফিতরা আদায় করা অন্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

আবার যার উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ছিল সে যদি তা আদায় করার পূর্বেই মারা যায়, তবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তার উত্তরসূরীরা যদি সাদাকা আদায় করে দেয়, তবে আদায় হয়ে যাবে। উত্তরসূরীরা নিষেধ করলে জোরপূর্বক তাদের থেকে সাদাকা আদায় করা জায়িয হবে না। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি এ ব্যাপারে ওয়ারিশদের অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে তার মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

ফিতরা কি পরিমাণ দিতে হবে

গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। ফিতরা কি পরিমাণ দিতে হবে– তার বর্ণনা পাওয়া যায় হাদীস শরীফে।

عن ابى سعيد ن الخدرى قال كنا نخرج زكوة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب

"আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রাসূলুল্লাহর যমানায়) সাদাকায়ে ফিতর বাবদ (মাথাপিছু) এক সা'[১] পরিমাণ খাবার (আটা) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।"

(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪০৯)

عن عبد الله بن عمر قال امر النبى صلى الله عليه وسلم بزكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة

"আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকায়ে ফিতর বাবদ এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ বলেন, (পরবর্তী কালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ্দ'[২] গম নির্ধারিত করেছেন।"

(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪১০)

عن ابى سعيد ن الخدرى قال كنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين

"আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা ফিতরা বাবদ (মাথাপিছু) এক সা' খাবার গম অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান

১. এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক।

২. দুই 'মুদ্দ' হলো : এক সা'র অর্ধেক অর্থাৎ এক সের সাড়ে তের ছটাক।

করতাম। মুআবিয়া (রা.)-এর যমানায় যখন গম আমদানী হল যখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ্দ' (অন্য জিনিসের) দুই মুদ্দের সমান।"
(সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪১১)

তবে যদি সাদাকাতুল ফিতর গম বা যব ব্যতীত অন্য কোন শস্য যেমন ধান, চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দিয়ে আদায় করতে হয় তাহলে আধা সা' গমের মূল্য পরিমাণ চাউল, ধান, বুট দ্বারা ফিতরা আদায় করলে আদায় সহীহ্ হবে। মূল্য হিসাব না করে অনুমান করে আদায় করলে সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে না।
(ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়া, ৩য় খণ্ড)

ফিতরা কোন সময় দেয়া উত্তম

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পর ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। কোন কারণবশত সাদাকা আদায় করতে না পারলে পরে আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের পূর্বেই সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতেন।
(আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بزكوة الفطر
قبل خروج الناس الى الصلوة

"ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে (ঈদের) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪১২)

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى نا زهير نا موسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بزكوة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلوة قال
فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين

"আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন নুফায়লী (র.) ..... ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে

সাদাকাতুল ফিতর লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (র.) বলেন, ইবনে উমার (রা.) ঈদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করতেন.....।" (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬১০; সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ জামে আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসায়ী,)

ফিতরা কাদের দেয়া যাবে

ফিতরা কেন, কী উদ্দেশ্যে দেয়া হয়; কাদের দেয়া হয়– এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য সুস্পষ্ট। রাসূল (সা.) বলেন :

زكوة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلوة فهى زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات

"সদাকাতুল ফিতর– রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসাবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরে পরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসাবে গণ্য (ইবনে মাজা)।" (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬০৯)

সুতরাং ফিতরা পাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন :

০১. গরীব ভাই-বোন, যারা পৃথক অন্নে থাকে।

০২. গরীব ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েরা।

০৩. গরীব চাচা, মামা, খালা, ফুফু, চাচাত-খালাত ও ফুফাত ভাই-বোন।

০৪. গরীব নিকটাত্মীয়।

০৫. গরীব প্রতিবেশী।

০৬. ফকীর মিসকীন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নিজের পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান পৃথক অন্নে থাকলেও তাদেরকে ফিতরা দেয়া জায়েয হবে না।

আবার একজন গরীবকে একাধিক ব্যক্তির ফিতরা দেয়া জায়েয, কিন্তু একজনের ফিতরা একজনকে দেয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দেয়াও নাজায়েয নয়।

ফিতরা কাদের দেয়া যাবে না

ইসলামের দুশমন কাফির বা মুরতাদ অথবা যে লোক তার ফিসক ফুজুরী দ্বারা মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ করে, যে লোক স্বীয় মাল বা উপার্জনের দরুন ধনী অথবা উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রম করে না বলে বেকার তাকে ফিতরা দেয়া যাবে না। তাছাড়া পিতা-মাতা, সন্তান-স্ত্রী এদেরকেও ফিতরা দেয়া যাবে না। কেননা কেউ যদি এ লোকদের ফিতরা দেয়, তাহলে কার্যত তা নিজেকেই দেয়া হবে। সুতরাং এমন লোকজনদেরকে ফিতরা প্রদান করা কোনভাবেই জায়েয নেই।

ফিতরা দিলে উপকার কী হবে

০১. সিয়াম দোষ-ক্রটিমুক্ত ও কবুল হবে।

০২. মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হবে।

০৩. ফকীর-মিসকীনরা খাদ্য পাবে এবং যে কোন সাদাকা প্রদানকারীর উপর আল্লাহ প্রসন্ন হন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم فيرد الله تعالى عليه اكثر مما اعطاه.

"ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দুইজনের পক্ষ থেকে এক সা' গম বা খেজুর নির্ধারিত হল। তোমাদের মধ্যে যারা ধনী– তাদের আল্লাহ পবিত্র করবেন এবং যারা গরীব– তাদেরকে আল্লাহ তাদের দানের তুলনায় আরও অধিক দান করবেন।"

(আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬১৯)

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

সংকলন—

মাসিক পৃথিবী

মাসিক মদীনা

মাসিক জিজ্ঞাসা

মাসিক আদর্শ নারী

অষ্টম অধ্যায়
যাকাত
সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

০১. প্রশ্ন ঃ যাকাত শব্দের আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ কি? যাকাত কি মক্কায় ফরয হয় না মদীনায়? যাকাত কখন থেকে সরকারীভাবে আদায় হতে শুরু করে?

উত্তর ঃ 'যাকাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রকরণ এবং প্রবৃদ্ধি। শরীয়তের পরিভাষায় 'যাকাত' অর্জিত সম্পদের ঐ অংশকে বলা হয়, যেটুকু অভাবগ্রস্ত, অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া আল্লাহ পাক ফরয করেছেন। এ বাধ্যতামূলক দানের দ্বারা একাধারে যেমন অর্জিত সম্পদ পবিত্র হয়, তেমনি দাতার মনকেও লোভ-লালসার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করা হয়। এ কারণেই এ দানকে যাকাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা আল-মুযযাম্মিল প্রথম অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরাতে যাকাতের কথা উল্লেখিত হওয়ায় তাফসীরবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, মক্কার জীবনে একেবারে প্রথম অবস্থাতেই যাকাতের বিধান নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ যাকাত ফরয হয়েছিল। কিন্তু সরকারীভাবে যাকাত আদায় শুরু হয় মদীনায় হিজরত করার পর থেকে।

০২. প্রশ্ন ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা কী?

উত্তর ঃ ইসলামের বিধানে সম্পদ অর্জন করার যেমন কিছু নীতিমালা রয়েছে, ঠিক তেমনি অর্জিত সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ রয়েছে। নির্ধারিত নিয়ম-নীতি তথা হালাল পথে যেমন অর্জন করতে হয়, তেমনি ব্যয় করার বেলায়ও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার বাইরে ব্যয় করা হারাম। উৎপাদনশীল কোন কাজে নিয়োজিত না করে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে কার্পণ্য করা, অপব্যয়ের আশ্রয় নেয়া, সীমাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয নয়। এমনি একটি সুষম অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পরও যেসব ইয়াতীম, বিধবা, পঙ্গু বা রুগ্ন লোক রোজগার করতে সক্ষম নয়, তাদের ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্যই আল্লাহ পাক সঞ্চিত সম্পদের উপর বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত ফরয

করেছেন। যাকাত মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ যে দারিদ্র্যের সাথে পরিচিতই ছিল না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বর্তমানের বহু গবেষকও তথ্যনির্ভর উপাত্তের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, যাকাত ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসৃত হলে সমাজে দারিদ্র্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

০৩. **প্রশ্ন** : যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কেন?

উত্তর : যাকাত যখন ট্যাক্স নয় ইবাদাত, তখন তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেয়া হবে কেন? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু জেনে নেয়া উচিত, ইসলাম পুরো সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করেছে। ফকীর-মিসকীন তথা দুঃস্থ মানুষগুলোও সমাজের একটি অংশ। তাদের ভাল-মন্দ দেখাশুনা ও তাদের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। সেই দায়িত্ব যেন আরো ভালভাবে পালন করা সম্ভব হয়, সেজন্য যাকাত আদায় ও বন্টনের যিম্মাদারী রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে যাদের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ করা হবে তাদেরকেও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে হাদীসে আল্লাহর পথের গাজীর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ শরীফ, জামে আত-তিরমিযী)
একদিকে তাদেরকে কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে আবার অপরদিকে তাদের দায়িত্বকে সুচারুরূপে পালনের জন্য অনুভূতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা একদিকে যেমন এ দায়িত্বকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মনে করে পালন করবেন, অন্যদিকে এর প্রতিটি পয়সা গনীমতের মাল মনে করে হিফাযত করবেন। খিয়ানত থেকে বিরত থাকবেন। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োজিত করি এবং সেজন্য তাকে ভাতাও দেই, তারপর যদি সে কোন মাল আত্মসাত করে সে গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর মতই অপরাধী।' (সুনান আবু দাউদ)

০৪. **প্রশ্ন** : দারুস সালাম ট্রাস্টের অধীনে দারুস সালাম এবতেদায়ী মাদরাসায় যাকাত কালেকশন করা হয়। এখানে কোন ইয়াতীমখানা বা লিল্লাহ বোর্ডিং চালু নেই। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো শিক্ষক বেতন-ভাতা নিয়ে। অন্য কোন সাধারণ আয়ের উৎস না থাকায় শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেও কোন বেতন-ভাতা নেওয়া হয় না। আর সকল ছাত্র-ছাত্রীই গরীবের সন্তান। যাদের পক্ষে বেতন দিয়ে ও বইপত্র, খাতা-কলম কিনে পড়ালেখা করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়

শরীয়াতসম্মত কোন উপায়ে যাকাতের টাকা থেকে শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে কিনা জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। যদি কোন উপায় না থাকে তবে উক্ত মাদরাসায় কোন কোন খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে বিস্তারিতভাবে জানাতে অনুরোধ করছি।

উত্তর ঃ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত হল আটটি।

এক. ফকীর, দুই. মিসকীন, তিন. যাকাত আদায়কারী, চার. যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, পাঁচ. দাস মুক্তির জন্য, ছয়. ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, সাত. আল্লাহর পথে, আট. পথিক মুসাফির। (সূরা আত-তাওবা: ৬০)

কেবল এ আটটি খাতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। এ খাতগুলো ব্যতীত অন্য কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হবে না। মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন দেয়া এ আটটি খাতের কোন খাতে পড়ে না বিধায় যাকাতের টাকা দ্বারা শিক্ষকদের বেতন দেয়া যাবে না। তবে গরীব-মিসকীন ছাত্র-ছাত্রী যারা পড়ালেখার খরচ চালাতে পারে না তাদেরকে পড়ালেখার খরচ বহনের জন্য যাকাতের টাকা থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।

০৫. প্রশ্ন ঃ একটা ঔষধের দোকান আছে। দোকানের ফার্ণিচারসহ মাল আছে। এখন যাকাত দিতে হবে ফার্ণিচার ও মালের উপর, না শুধু মালের উপর? যদি শুধু মালের উপর যাকাত দিতে হয়, তবে হিসাব করে দেখা গেল গত বছর সব মালের উপর যাকাত দিয়েছি, এ বছর সেসব মালের উপরও যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা মাল যাকাতের আওতায় আসবে। দোকান ঘর, ফার্ণিচার ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে না। হিসাব কষে যে কোন একটি ব্যবসা পণ্যের যাকাত দেয়ার পর যদি বছর ঘুরে আসার পরও সে পণ্যটি অবিক্রিত থেকে যায়, তবে পুনরায় তার উপর যাকাত ফরয হবে। এভাবে প্রতিবারই বছর ঘুরে আসার পর যাকাতের হিসাব করতে হবে।

০৬. প্রশ্ন ঃ আমি আমার বাৎসরিক আয়ের উপর যথাযথভাবে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করে আসছি– যা আমার কোম্পানী প্রতিমাসে বেতন থেকে কেটে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বছর অন্তে যাকাত দেয়াটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর ঃ যাকাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক ধার্যকৃত। কতটুকু সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে, কিভাবে তা আদায় হবে এবং কোন কোন খাতে তা ব্যয় করতে হবে তা কুরআনের আলোকেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কার্যকর করে দেখিয়ে গেছেন। অপরদিকে

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতি যুগেই নানা ধরনের খাজনা-ট্যাক্স ধার্য করে আসছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ইনকাম ট্যাক্স ছাড়াও ওয়েলথ ট্যাক্স, গেইন ট্যাক্স প্রভৃতি নানা ধরনের ট্যাক্সের প্রচলন আছে– যেগুলো সম্পদের উপর ধার্য করা হয়। এ ধরনের যত ট্যাক্সই প্রদান করা হোক না কেন সেগুলো যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক ধার্যকৃত যাকাতের বিকল্প হতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স প্রদান করে ফরয যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

০৭. **প্রশ্ন ঃ** যাকাত ইংরেজি বা বাংলা বছর হিসাব করে দিলে জায়েয হবে কি না? অনেকে বলেন, চন্দ্র বছরের হিসাব ধরে না দিলে যাকাত আদায় হবে না। এটা ঠিক কি না?

উত্তর ঃ যাকাত চান্দ্র বৎসরের হিসাব অনুযায়ীই দিতে হবে। সৌর বর্ষের হিসাবে দিলে আদায় হবে না। কারণ চন্দ্র বর্ষের তুলনায় সৌরবর্ষ গড়ে এগার-বার দিন কম হয়। ছত্রিশ বছরে সৌর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যায় এ সময়ের মধ্যে চন্দ্রবর্ষ একটি বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং সৌর বর্ষের হিসাবে যাকাত দিলে সৌরবর্ষের তুলনায় চন্দ্রবর্ষের যে কয়টা দিন বেশি হয় সে কয় দিনের যাকাত বাদ পড়ে যায়।

০৮. **প্রশ্ন ঃ** ইসলাম কি যাকাত উসুল করার সাথে সাথে আয়কর আরোপ করারও অনুমতি দেয়?

উত্তর ঃ জি, হ্যাঁ। ইসলামী রাষ্ট্রে এ দু'টিই এক সাথে জায়েয হতে পারে। যাকাতের ব্যয় খাত পুরোপুরি নির্ধারিত। সূরা আত্-তাওবায় এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি এর নিসাব (অর্থাৎ সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পদ যার উপর যাকাত আরোপিত হয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জায়েয নয়। বলাবাহুল্য, এরপর রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধ করলে দেশবাসীর নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এ সাহায্য গ্রহণ যদি বলপূর্বক হয় তাহলে তা ট্যাক্সে পরিণত হয়, যদি স্বেচ্ছামূলক হয় তাহলে তা পরিণত হয় চাঁদায় আর যদি ফেরত দেয়ার শর্ত থাকে তাহলে তা হয় ঋণ। যাকাত ও অন্যান্য ট্যাক্স পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে না এবং এদের একটি অন্যটিকে বাতিলও করতে পারে না।

এ হচ্ছে এ প্রশ্নটির নীতিগত জওয়াব। কিন্তু এই সংগে আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে, আমাদের দেশে একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলে এবং বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে

তার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিকল্পিত হতে থাকলে আজকের মত এ সকল ট্যাক্সের প্রয়োজন থাকবে না। বর্তমান যুগে ট্যাক্সের ব্যাপারে যত রকম দুর্নীতি ও জালিয়াতি হয় তা সবই আপনি জানেন। একদিকে যে উদ্দেশ্যে ট্যাক্স লাগানো হয় তার বড়জোর শতকরা দশ ভাগ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একে ব্যয় করা হয় আবার অন্যদিকে ট্যাক্স থেকে নিষ্কৃতি লাভের একটা সাধারণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই ব্যবস্থা যদি গলদমুক্ত হয়ে যায় তাহলে বর্তমান প্রচলিত ট্যাক্সের এক চতুর্থাংশই যথেষ্ট বিবেচিত হবে এবং এর কল্যাণময়তাও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

০৯. প্রশ্ন ঃ দু'টি প্রশ্নের সমাধান করতে পারছি না। আশা করি আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

০১. এ পর্যন্ত ব্যবসায়ের শেয়ারে যাকাত সম্পর্কে আপনার যেসব লেখা আমার নজরে পড়েছে সেখানে যেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র অথবা কমপক্ষে যাকাত আদায়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। এখন সেখানে যেন সমস্যা কেবল এতটুকুন যে, যাকাত কোন্ পর্যায়ে ও কার থেকে আদায় করা হবে? যত দিন কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কায়েম হচ্ছে না ততদিন শেয়ারের যাকাত গ্রহণ করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?

আমি নিজের শেয়ারকে অর্থের প্রতিবদল হিসেবে কিয়াস করে তার মূল্য যে পরিমাণ অর্থ হয় তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু শেয়ারের বার্ষিক আয়কর বাদ দিয়ে তা থেকে যা পাই তা পুরোপুরি তার যাকাতে ব্যয় হয়ে যায়। এ অবস্থা তো একেবারেই অসন্তোষজনক।

০২. ব্যবসায়ের শেয়ার সম্পর্কে আর একটা কথা বলতে চাই। এতদিন অন্যরা এবং আপনিও একথা বলে এসেছেন যে, শেয়ার ক্রয়ের পর বছর পূর্ণ হলে তবেই যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা এক বছর একই শেয়ার রাখে না। কখনো দাম কমে গেলে শেয়ারটি বেচে দেয়। কখনো অন্য শেয়ারগুলো বেশি লাভজনক মনে হলে নিজেরটা বেচে দিয়ে অন্যগুলো কিনে নেয়। এ ধরনের আরো অনেক ব্যাপার ঘটে থাকে। আমাদের দেশে হয়তো এখনো এটা ততটা ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু এখন লণ্ডনে এটাই হচ্ছে। এ অবস্থায়ও কি কোন একটি কোম্পানীর অংশের উপর এক বছর পূর্ণ হবার পরই যাকাত আরোপিত হবে? এভাবে কি লোকেরা

স্থায়ীভাবে যাকাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? যাকাত প্রদান করার নিয়ত সত্ত্বেও কি তারা যাকাত দিতে পারবে না?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্ন দু'টির সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

০১ ও ০২. ব্যবসায়ের শেয়ারের যাকাত এমন কোন নীতির ভিত্তিতে আদায় করা যাবে না, যার ফলে একথা মনে হয় যেন শেয়ারের অর্থ আপনার কাছে জমা আছে এবং আপনি জমা টাকার যাকাত আদায় করে চলেছেন। বরং ব্যবসার পণ্যের যাকাত আদায়ের যে নীতি নির্ধারিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। সে নীতিটি হচ্ছে, ব্যবসার শুরু করার দিন থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর দেখতে হবে মওজুদ পণ্য (Stock in Trade) কী পরিমাণ আছে। তার মূল্য কত। আর হাতে নগদ (cash in hand) কত টাকা আছে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ নীতির ভিত্তিতে একটি কোম্পানী বা বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে আপনার যে শেয়ারগুলো রয়েছে বর্তমান বাজার দর হিসেবে তার মূল্য কত দেখতে হবে। বছরের মাঝখানে এক ব্যক্তি তার শেয়ার বা শেয়ারগুলো যতবারই বিক্রি করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি কোম্পানীর প্রথম শেয়ারটি যখন কেনেন তখন থেকেই বছর গণনা করা হবে এবং বছরের শেষে আপনার শেয়ারের বাজার দর (Market price) যা হবে তার প্রেক্ষিতে যাকাত নির্ধারণ করা হবে। এই সঙ্গে আপনার কাছে নগদ কত আছে তাও দেখা হবে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, ট্যাক্স আদায় করার পর আপনার আয়কৃত অর্থের পরিমাণ এত কমে যায় যে, তা থেকে যাকাত আদায় করলে হাতে আর কিছুই থাকে না। এ অবস্থার কোন সুরাহা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা তো এমন একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকার শাস্তি যে রাষ্ট্র ট্যাক্স আদায় করার সময় যাকাতের প্রতি কোন নজরই দেয় না।

১০. প্রশ্ন ঃ ইসলাম ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী হওয়ার দরুন দেখা যায় কোন কোটিপতি নির্ধারিত হারে যাকাত দেয়ার পরও তার তো এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় না, যা তার ধন-দৌলত উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামী অর্থনীতির এটা কি একটা দোষণীয় দিক নয়? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা তিনটি। প্রথমত: হালাল উপায়ে আয় এবং হালাল পথে ব্যয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত: হালাল উপায়ে রুজি-রোজগারের

জন্য সকল মানুষকেই সমান অধিকার দিতে হবে। তৃতীয়ত: যাদের রোজগারে বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না তাদের ঐ প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

এই তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে যদি কোন ব্যক্তি কোটিপতি হয়ে যায় এবং তার মালের যাকাত আদায় করে তাহলে এটা মোটেই দোষনীয় নয়। ইসলামী রাষ্ট্র ধনীদের কাছ থেকে যাকাত উসূল করে অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করার দায়িত্ব পালন করে। যদি যাকাতের মাধ্যমে সংগৃহীত মাল এর জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে ধনীদেরকে আরো বেশি দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কারো অভাব অপূরণ না থাকে।

তবে আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আল হাশরের ০৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, সম্পদ এমনভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কিছু সংখ্যক ধনীদের হাতেই জাতীয় সম্পদ জমা হয়ে না যায়। এই নীতির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিধান রচনা করবে। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য বহাল থাকাই স্বাভাবিক।

১১. প্রশ্ন ঃ (ক) আমার স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে পরিবার। বিয়ের সময় আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে 'পাঁচ ভরি' ওজনের স্বর্ণ অলংকার দিয়েছেন। পরবর্তী সময় আমার আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী ও দুই কন্যাকে কিছু কিছু স্বর্ণ অলংকার তৈরি করে উপহার হিসেবে দিয়েছে। এতে করে স্বর্ণের ওজন সাড়ে সাত ভরি ওজন অতিক্রম করেছে। এখন যাকাত দেওয়া কর্তব্য হয়েছে। কিন্তু যাকাত দেবার মত সামর্থ্য আমার খুবই কম। আমার প্রশ্ন হল যাকাত না দিলে অসুবিধা আছে কি? কিংবা যাকাত দিতে হলে অলংকারগুলি বিক্রয় না করে কোন ব্যবস্থা করা যায় কি?

(খ) কন্যাদের ভবিষ্যত চিন্তা করে বহু দিন ধরে খুব কষ্ট করে কিছু অর্থও সঞ্চয় করেছি। এমতাবস্থায় কি করা উচিত? পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারের অনেক কম।

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাব মতে প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান মুসলিম ব্যক্তি যদি জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যথাঃ খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, থাকার ঘর, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, চলার বাহন ইত্যাদি ব্যতীত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ মূল্যের নগদ অর্থ বা ব্যবসার মাল থাকে এবং তার যদি কোন ঋণ না থাকে অথবা ঋণ

থাকলে তা বাদ দিয়েও যদি নিসাব পরিমাণ মাল থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ মাল না থাকলে যাকাত ফরয হবে না। অতএব আপনার স্ত্রীর স্বর্ণের পরিমাণ যদি সাড়ে সাত তোলা বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং তার যদি কোন ঋণ না থাকে অথবা ঋণ থাকলে তা বাদ দিয়েও যদি ঐ পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। অনুরূপ আপনার সঞ্চিত অর্থ নিসাব পরিমাণ হলে এবং ঋণ থাকলে তা বাদ দিয়েও যদি নিসাব পরিমাণ থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে আপনার উপরও যাকাত ফরয হবে।

যার উপর যাকাত ফরয হয়, তাকে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে। যাকাত আদায় না করলে কবীরা গুনাহ হবে এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন : "যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন জমা রাখার স্বাদ আস্বাদন কর।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৫–৩৬)

১২. প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তির এক লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট আছে। বর্তমান বাজারে শেয়ার মূল্য ১,৪০,০০০ টাকায় উন্নীত হল বা ৮০,০০০ টাকায় নেমে গেল। যাকাত প্রদানের সময় মূল্য কোনটা ধরতে হবে– ফেস ভেল্যু না বাজার মূল্য?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় করার সময় শেয়ারের যে বাজার মূল্য থাকে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। শেয়ারের মুনাফা খরচ না হয়ে থাকলে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে তাও শেয়ারের সাথে যোগ করতে হবে।

শেয়ার বাজার মূল্য ও মুনাফা এবং শেয়ার মালিকের নিকট অন্য কোন টাকা-পয়সা বা ব্যবসার পণ্য থাকলে সব মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং সেই নিসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হবে। (ফিকহুয যাকাত, ১/৫২৩–২৮)

১৩. প্রশ্ন ঃ ২৩ জন ব্যক্তি অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে একটি ব্যবসায়িক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংস্থা ১ বছর পূর্বে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদস্য কর্তৃক এককালীন ১,০০০/- ও মাসিক ২০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান মালামালসহ ৫৫,০০০/- বা ৬০,০০০/- টাকা আছে। সংস্থা একক ধরে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে; না সংস্থার টাকা ২৩ জনের মধ্যে বিভাজ্য করে প্রতিজন সাহেবে নিসাব হলে যাকাত দেবেন?

উত্তর ঃ সংস্থার সদস্যদের কেউ ব্যক্তিগতভাবে সংস্থায় তাঁর জমাকৃত টাকা (লভ্যাংশ) এবং অন্যান্য নগদ টাকা ও ব্যবসায়ী পণ্য থাকলে তা সহ সব মিলিয়ে যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হন এবং সে মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তাঁর উপর যাকাত ফরয হবে। অবশ্য এখানে একটা ভিন্ন মত রয়েছে, তাহলো সংস্থাকে একক ধরে সংস্থার মাল নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে সংস্থা যাকাত আদায় করবে।

১৪. প্রশ্ন ঃ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা যাবে কিনা এবং এভাবে যাকাত আদায় করলে আদায় হবে কিনা?

উত্তর ঃ যে সব সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয় তা দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, সেই সব সম্পদ যার উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। যেমন নগদ টাকা, সোনা-রূপা, ব্যবসার মাল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ হলো, যার উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। নিসাব পরিমাণ হলেই যাকাত ফরয হয়। যেমন জমির ফসল।

অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে প্রথম প্রকার সম্পদ (সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) নিসাব পরিমাণ হলে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়েয এবং এভাবে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারো কারো মতে সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলেও সেই সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত আদায় করা জায়েয হবে না।

এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো, বিনা প্রয়োজনে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় না করা। প্রয়োজনে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করলে তাতে কোন দোষ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ অর্থাৎ ফসলাদির যাকাত-উশর ফসল ওঠার পরই আদায় করতে হবে। এজন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় এবং ফসল ওঠার পূর্বেও তা আদায় করা যাবে না। (দেখুন ফিকহুয যাকাত ২/৮২৩-২৬)

১৫. প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি গরীব হয় এবং স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয়, যাতে তার উপর যাকাত ফরয হয় এমতাবস্থায় স্ত্রী নিজের গরীব স্বামীকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর ঃ স্ত্রী নিজের স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কিনা এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। এক মতে স্ত্রী যদি বিত্তশালী হয় এবং স্বামী গরীব হয় তাহলে স্ত্রী নিজের স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে।

দ্বিতীয় মতটি হল, বিত্তশালী স্ত্রীর নিজের স্বামী গরীব হলেও সে তার গরীব স্বামীকে যাকাত দিলে তার যাকাত আদায় হবে না।

(শামী ৩৪৬; ফাতহুল বারী ৩২৯)

উপরোক্ত দুটি মতের যে কোন মত অবলম্বন করার সুযোগ আপনার রয়েছে। আর প্রকৃত হক যেহেতু দুটি মতের যে কোন একটিই হবে এবং সেটি অনির্দিষ্ট ও অজানা সেহেতু দ্বিতীয় মতের মধ্যেই সতর্কতা বিদ্যমান। কারণ স্ত্রী স্বামীকে যাকাত না দিলে স্বামী উপকৃত হতে পারল না বটে কিন্তু কোন গুনাহর দিক থাকে না। আর যদি স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে যাকাত আদায় না হয় তাহলে স্ত্রীর একটা ফরয অনাদায় থেকে যাবে, যার ফলে স্ত্রী গুনাহগার হবে।

১৬. প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তির কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট আছে এবং শেয়ারগুলোর একটা ফেস ভেল্যু রয়েছে কিন্তু বাজারে শেয়ারের মূল্য উঠানামা করে। কখনো ফেস ভেল্যু থেকে কমে যায় আবার কখনো তার চেয়ে বেড়ে যায়। যাকাত প্রদানের সময় মূল্য কোনটা ধরতে হবে। ফেস ভেল্যু না বাজার মূল্য?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় করার সময় শেয়ারের যে বাজার মূল্য থাকে সে অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। শেয়ারের মুনাফা খরচ না হয়ে থাকলে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে তাও শেয়ারের সাথে যোগ করতে হবে।

শেয়ারের বাজার মূল্য ও মুনাফা এবং শেয়ার মালিকের নিকট অন্য কোন টাকা-পয়সা বা ব্যবসার পণ্য থাকলে সব মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং সেই নিসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হবে। (ফিকহুয যাকাত ১/৫২৩-২৮)

১৭. প্রশ্ন ঃ আমি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী একজন ব্যবসায়ী। গত কয়েক বছর পূর্বে আমি ব্যবসা শুরু করি। কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ খুব কম হওয়ায় আমি বাকিতে জিনিসপত্র বিক্রয়ে বাধ্য হই। এখানে উল্লেখ্য, বাকীতে বিক্রয়ের জন্য আমি ক্রেতাদের নিকট থেকে বেশি মূল্য আদায় করি না অথবা নিম্নমানসম্পন্ন দ্রব্য বিক্রয় করি না। উপরন্তু উন্নত মানের নির্ভেজাল দ্রব্য প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মুনাফায় বিক্রয়ের চেষ্টা করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দোকানের বাকীর পরিমাণ বিরাট অংকে রূপ নেয় এবং বেশ কিছু ক্রেতা বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও বাকী অর্থ পরিশোধে চরম অনীহা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় ঐসব ক্রেতাদের (যাদের নিকট থেকে বাকী অর্থ আদায় অসম্ভব) নিকট পাওনা অর্থ (তাদের না জানিয়ে বা জানিয়ে) যাকাত হিসেবে প্রদান করার কোন বিধান অর্থাৎ ইসলামী বিধান আছে কিনা?

উত্তর ঃ এভাবে যাকাত আদায় করা যায় না। যাকাত আদায় করার নিয়ম হল সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে এবং সে সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হলে সে সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে যাকাতের হকদারদেরকে প্রদান করতে হবে। কারো কাছে টাকা পাওনা থাকলে সে টাকা যাকাত হিসেবে ধরে তাকে পাওনা থেকে অব্যাহতি দিলে তাতে যাকাত আদায় হবে না। বরং যাকাতের মাল বাস্তবে আদায় করতে হবে।

১৮. প্রশ্ন ঃ হাদিয়া কি? হাদিয়া এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা যারা সৌদিতে চাকুরীরত আমাদের হাদিয়া বা যাকাত খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হাদিয়া হল উপঢৌকন বা সৌজন্যমূলক উপহার। বিনিময় ছাড়া যা কাউকে দেয়া হয়। যাকাত বলা হয় বিত্তশালী ও নিসাব পরিমাণ মালের মালিক সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতের হকদারদেরকে যথা গরীব-মিসকীন, যাকাত উসূলকারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিসহ আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত মোট আটটি খাতে প্রদান করা। যাকাত যাদেরকে দেয়া হবে তাদের নিকট থেকেও কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। তবে যাকাত আদায় করা ফরয। এর নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্যত্র ব্যয় করা যাবে না। হাদিয়া যে কোন ব্যক্তিকেই দেয়া যায় এবং হাদিয়া দেয়া জরুরী নয়।

১৯. প্রশ্ন ঃ (ক) ডিপোজিট পেনশন স্কীম বা প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত টাকার (মূলধন+চক্রবৃদ্ধি সুদ) উপর যাকাত আদায় জায়েজ হবে কি? নাকি শুধু মূলধনের টাকার উপর যাকাত আদায়যোগ্য? সুদের টাকা কিভাবে ব্যয় করা জায়েজ হবে?

(খ) কোন ব্যক্তি যদি ডিপোজিট পেনশন স্কীম বা প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের টাকা মেয়াদ শেষে রেখে মারা যান তবে সুদের টাকাগুলি ঐ পরিবারের জন্য ব্যয় করা জায়েজ হবে কি? এতে মৃত ব্যক্তির কোন গুনাহ্ হবে কি?

উত্তর ঃ ডিপোজিট পেনশন স্কীম-এ জমাকৃত মূলধনের যাকাত আদায় করতে হবে। এর উপর যে সুদ আসে তার যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং সুদের সমুদয় টাকা (মূলধন ব্যতীত) সাদাকাহ্ করে দিতে হবে।

সুদের ভিত্তিতে টাকা লগ্নি করা সুস্পষ্ট হারাম ও কবীরাহ গুনাহ। ডিপোজিট পেনশন স্কীম এক প্রকার সুদী লগ্নী। কাজেই এতে যে সুদ আসে তা ভোগ করা লগ্নিকারীর পক্ষে যেমন জায়েয নয়, তেমনি তার পরিবারের লোকদের পক্ষেও জায়েয নয়। বরং সুদী টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীব-মিসকীনদেরকে সাদাকাহ্ করে দিতে হবে।

২০. প্রশ্ন ঃ সুদ ঘুষ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি পাবে কিনা? অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ করলে তার হজ্জ হবে কিনা?

উত্তর ঃ যাকাত একটি ফরয ইবাদাত এবং যে পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাকাত তার মধ্যে একটি। অনুরূপ হজ্জও। সুদ, ঘুষ বা যে কোন হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না এবং ইসলামে হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদের উপার্জনকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

(ফাতহুল বারী ৩/২৭৯)

এরূপ সম্পদের মালিক জানা থাকলে মালিক বা তার উত্তরাধিকারীকে তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব। মালিক জানা না থাকলে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়াই তা সাদাকাহ করে দেয়া ওয়াজিব। কাজেই হারাম সম্পদের যাকাত দিলে তা হালাল বা পবিত্র হয় না এবং তা দ্বারা হজ্জ করলে সে হজ্জ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তায়ালা কেবল হালাল জিনিসই কবুল করেন। যে ব্যক্তি হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকাহ করে আল্লাহ তায়ালা তার সে সাদাকাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা সাদাকাহকারীর জন্য প্রতিপালন করে থাকেন। যেমন তোমাদের কেউ তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিপালন করে থাকে। এক পর্যায়ে সে সাদাকা পাহাড় সমান হয়ে যায়।

(সহীহ আল-বুখারী)

২১. **প্রশ্ন ঃ** কোন ধনী মহিলা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বর্ণ কিনেন এবং প্রতি বছর যাকাত আদায় করেন তাহলে কি তাঁকে সূরা আত-তাওবার ৩৫ নং আয়াত অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয়ের শাস্তি ভোগ করতে হবে?

উত্তর ঃ সূরা আত-তাওবার ৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : "যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা ললাটপার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে (এবং বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন এসব জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।"

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন : ইবনে উমার (রা.) বলেন, "এ হলো সেই সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয়নি। উমার (রা.) বলেন, "যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।" (মুখতাসার ইবনে কাসীর ২/১৩৯)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা জমা রাখা গুনাহ নয়। (মাআরিফুল কুরআন ৪/৩৬৭)

২২. **প্রশ্ন ঃ** স্ত্রীর ব্যবহৃত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কিনা? নিসাবের কম পরিমাণ স্বর্ণ স্বামীর অর্থের সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে স্বামীকে স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ স্ত্রীকে যে অলংকার দেয়া হয় সে তার মালিক হয়। স্ত্রীর অলংকার সোনা বা রূপা অথবা যদি উভয়টা মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হয় অথবা অলংকার ছাড়া যদি তার নগদ টাকা থাকে, আর সব মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হয় এবং সে নিসাবের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে স্ত্রীর উপর যাকাত ফরয হবে। নিসাব পূরণের জন্য স্বামীর অর্থের সাথে স্ত্রীর অলংকার বা অর্থ-সম্পদকে মিলাতে হবে না। স্ত্রীর অলংকার বা সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে স্ত্রীর উপরই যাকাত ফরয হবে। তার সম্পদের যাকাত আদায় করা স্বামীর জন্য জরুরী নয়। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে।

২৩. **প্রশ্ন ঃ** পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে চাকুরীর বেতন থেকে অনেক কষ্টে কিছু টাকা বাঁচিয়ে ইসলামী ব্যাংকে ১০ (দশ) বছর মেয়াদী হজ্জ স্কীম খোলা হয়েছে। উক্ত স্কীমে নিসাব পরিমাণ টাকা হলে যাকাত দিতে হবে কি?

উল্লেখ্য যে, স্কীমের অনুকূলে ইসলামী ব্যাংক কোন টাকা উত্তোলন করতে দেন না। কিন্তু বেতনের টাকা থেকে যাকাত আদায়ের সামর্থ্য নেই। এমতাবস্থায় যাকাত ফরয হলে তা কীভাবে আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের হজ্জ স্কীমে কারো জমাকৃত টাকা যদি নিসাব পরিমাণ অথবা তার নিকট এ টাকা ছাড়া যদি আরো টাকা বা সোনা-রূপা থাকে এবং সব মিলিয়ে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং উক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। অবশ্য তার ঋণ থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট টাকা বা সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কারো উপর যাকাত ফরয হলে যেভাবেই হোক তাকে তা আদায় করতে হবে।

২৪. প্রশ্ন ঃ অবিবাহিত মেয়েকে যদি স্বর্ণ অথবা টাকা দেওয়া হয় তাহলে কি সেটা পিতার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতাকে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। কেউ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে এবং সে মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

মেয়েকে যে স্বর্ণ অথবা টাকা দেয়া হয় তা যদি তাকে পুরোপুরিভাবে দেয়া হয় অর্থাৎ সে যদি তার মালিক হয়ে যায় তাহলে তা পিতার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে না এবং সে সম্পদের যাকাত আদায় করা পিতার উপর ফরয নয়। মেয়ের মালিকানায় যে স্বর্ণ অথবা টাকা থাকে তা নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হলে তার যাকাত আদায় করা উক্ত মেয়ের উপর ফরয।

২৫. প্রশ্ন ঃ সাহেবে নিসাবের হিসাব করা হয় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ দিয়ে; কিন্তু টাকার হিসাবে তা কত টাকা তা ব্যাখ্যা করা হয় না। ফলে আমরা অনেকেই মূল হিসাবটা বুঝি না। টাকার অংকে কত টাকা থাকলে যাকাত ও কুরবানী ওয়াজিব/ফরজ জানালে খুব খুশি হব।

সাহেবে নিসাব নয় এমনিতে সাধারণ সচ্ছল কোনো ব্যক্তি কুরবানী দিতে পারবে কি? আর তা কোন পর্যায়ের কুরবানী হবে?

উত্তর ঃ কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ নগদ টাকা থাকলে তিনি যাকাতের সাহেবে নিসাব হন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে সাহেবে নিসাবের উপর যাকাত ফরয হয়।

সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের টাকা হল নগদ টাকার নিসাব। সোনা ও রূপার মূল্য সব সময় সব দেশে এক থাকে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় এর মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে বিধায় নগদ টাকার নিসাবের নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। যাকাত দাতা যাকাত দেয়ার সময় তার নিজ দেশের সোনা বা রূপার মূল্য অনুযায়ী তার নিকট সঞ্চিত নগদ টাকার নিসাব ঠিক করে নেবেন এবং তার উপর যাকাত ফরয হলে যাকাত আদায় করবেন। কুরবানীর দিনগুলোতে কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সোনা, রূপা অথবা নগদ টাকা থাকলে কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং কুরবানীর দিনগুলোতে যিনি সাহেবে নিসাব নন, কুরবানী করা তার জন্য ওয়াজিব নয়, তবে করলে তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে।

২৬. **প্রশ্ন ঃ** সরকার কর্তৃক ঘোষিত পেনশন সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ নির্ধারিত। প্রশ্ন হচ্ছে, সঞ্চয়পত্রের খাটানো টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি না? প্রভিডেন্ট ফান্ডে গচ্ছিত টাকার যেমন যাকাত দিতে হয় না, এটাও কি তদ্রূপ?

উত্তর ঃ এই টাকা হাতে আসার পর এক বছর সঞ্চিত থাকলে যাকাত দিতে হবে। এর আগে নয়।

২৭. **প্রশ্ন ঃ** যাকাতের টাকা দ্বারা কোনো অসহায়-গরীব লোকের দাফন-কাফন করা যাবে কি না?

উত্তর ঃ কোন অসহায়-গরীব মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনে যাকাত কিংবা যেকোনো ওয়াজিব সাদাকার অর্থ সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য মৃত ব্যক্তির কোনো ওলী-ওয়ারিশ যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে সেই অর্থ গরীব আপনজনের দাফন-কাফনে ব্যয় করতে পারবেন। এখানে বিষয় হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যাকাত-সাদাকার প্রাপক হতে পারেন না।

২৮. **প্রশ্ন ঃ** কোনো মহিলার নিকট ৭০,০০০/- টাকা আছে। উল্লেখ্য এটা স্বামীকে বলা যাচ্ছে না। এই টাকার উপর কি যাকাত ফরয হবে এবং প্রতি বছর তার জমীনে উশর বাদেও ফসল বাবদ ১,৫০০/- টাকা পায় এখন তার টাকায় যাকাত ফরয হলে কীভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর ঃ মহিলার উক্ত টাকায় যাকাত ফরয হয়েছে। যাকাত আদায়ের নিয়ম হলো প্রতি বছর সঞ্চিত অর্থ-কড়ির ৪০ ভাগের এক ভাগ গরীব-দুঃখীদের নিঃশর্ত মালিক বানিয়ে দেয়া। স্বামী জানলে সমস্যা মনে হলে কোনো ইয়াতীমখানায় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে পারেন। যাকাত আদায়

করা এখন আপনার উপর ফরয যিম্মাদারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যে কোনোভাবেই তা পালন করতে হবে।

২৯. প্রশ্ন ঃ (ক) এক ব্যক্তি নিয়মিত যাকাত দেয়। সম্প্রতি সে বিধর্মীসহ আরও ৫ জনের সাথে একটি ক্লিনিকের মালিক হয়েছে। প্রশ্ন হলো, তার যাকাতের সাথে ক্লিনিকের শেয়ার কি যোগ করতে হবে? যদি ক্লিনিকের লাভ থেকে ভবিষ্যতে ক্লিনিকের জন্য আরও কিছু কেনা হয় তবে সে হিসাবও কি যোগ করতে হবে?

(খ) স্বামী-স্ত্রীর যাকাতের দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের উপর। অনেক স্বামী-স্ত্রী এমন আছেন যে, দুজনই চাকরি করেন। দুজনেই সংসারে খরচ করেন। খরচের পর অতিরিক্ত টাকা স্বামীর একাউন্টেই জমা রাখেন। স্ত্রীর অলংকার নিসাব পরিমাণ। এই স্বামী-স্ত্রীর যাকাতের নিসাব কেমন হবে?

(গ) নাবালিগ মেয়ের নামে তার পিতা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। ইচ্ছা করলে পিতা সেই টাকা যে কোন সময় উঠাতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন। প্রশ্ন হলো যাকাতের হিসাবে পিতার টাকার সাথে এই টাকা যোগ করতে হবে কি না?

উত্তর ঃ (ক) ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও বাড়ীর মূল্যের ওপর যাকাত আসবে না। এই ব্যবসা থেকে যে আয় হয় সেই আয় যদি নিসাব পরিমাণ হয় তা পূর্ণ এক বছর জমা থাকার পর সেই অর্থের উপর যাকাত ফরয হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত লাভ যদি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে পুনঃ বিনিয়োগ করা হয় তবে লাভের সে অর্থের উপরও যাকাত বর্তাবে না।

(খ) স্বামী বা স্ত্রী যার একাউন্টেই টাকা সঞ্চিত হোক সেই সঞ্চয়ই যাকাতের হিসাবে আসবে এবং যৌথ অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। স্ত্রী যেহেতু নিসাবের মালিক অর্থাৎ তাঁর উপর যেহেতু যাকাত ফরয, এজন্য তাঁর অলংকারের সাথে অন্যান্য সম্পদ যা আছে, সেটুকুর মূল্যও যোগ করতে হবে।

(গ) নাবালিগ সন্তানের নামে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সে অর্থের মালিক যেহেতু সঞ্চয়কারী নিজে এজন্য সঞ্চিত সে অর্থও যাকাতের আওতায় আসবে।

৩০. প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি প্রবাসে থেকে ৮/১০ লাখ টাকার মধ্যে বাড়ি বানাবার জন্য ২-৩ লাখ টাকা জমা করেছেন। উক্ত ব্যক্তির বাড়ি নির্মাণের আগ পর্যন্ত সেই সঞ্চিত টাকার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : সেই সঞ্চিত টাকার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত খরচ না হবে সেই টাকার উপর অতিবাহিত বছরগুলোর যাকাত দেওয়া জরুরী।

(হিদায়া ১ম খণ্ড যাকাত অধ্যায়, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

৩১. প্রশ্ন : আমার নানা মারা গেলে মা নানার জমির ফসল বিক্রি করে ২৫ হাজার টাকা পেয়েছেন। এই টাকার যাকাত দিতে হবে কি না? যাকাতের টাকা এবং ফসলের উশর হিন্দু কিংবা অন্য ধর্মের লোকদের দেওয়া যাবে কি না? দয়া করে সবগুলোর উত্তর দিবেন।

উত্তর : যে কোন হালাল সূত্রেই মালিকানাধীন টাকা ও সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। অমুসলিমদেরকে যাকাতের টাকা এবং ফসলের উশর দেয়া জায়েয নেই।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, ৩/৪ পৃষ্ঠা, আল-হিদায়া ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা)

৩২. প্রশ্ন : আমার স্ত্রী বিয়ের সময় আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে পঞ্চাশ তোলা স্বর্ণালংকার গিফট হিসেবে পেয়েছিলেন। উক্ত পরিমাণ অলংকারের প্রতি বছর প্রচুর টাকা যাকাত আসে। আমার স্ত্রীর নিজস্ব কোন ইনকাম বা নগদ টাকাও নাই। এসব স্বর্ণ অলংকারের যাকাত কি আমাকে দিতে হবে? আমার স্বল্প আয়ের সংসারে এত মোটা অংকের যাকাত দেওয়া খুবই কষ্টকর। আমার স্ত্রী গয়নাসমূহ বিক্রি করতে ইচ্ছুক নয়। এমতাবস্থায় কি করা যাবে দয়া করে সমাধান দেবেন।

উত্তর : অলংকারের যিনি মালিক যাকাত তাকেই দিতে হবে। তাঁর নিজস্ব কোন সঞ্চয় না থাকলে দেনমোহর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা যাকাত পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে অলংকারের কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত দিতে হবে। যাকাত দেওয়া নামায-রোযার মতই ফরয যা উপেক্ষা করার কোনই সুযোগ নেই।

৩৩. প্রশ্ন : এক ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তের মালিক। প্রতি বছর হিসাব করে যাকাত দিতেন। সম্প্রতি তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। তিনি স্ত্রী এবং তিনটি শিশু সন্তান রেখে গেছেন। এখন এই সম্পদের যাকাত কিভাবে দিতে হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : এই সম্পদে মরহুমের স্ত্রী এবং অন্য যাঁরা উত্তরাধিকারী হয়েছে তাঁদের প্রাপ্ত হিসসার উপর যাকাত ফরয হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের প্রাপ্ত অংশে যাকাত হবে না।

৩৪. প্রশ্ন ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী, নামায-রোযার পাশাপাশি প্রতি বছর গরীব-দুঃখীদেরকে যাকাত দিয়ে থাকি। একদিন জনৈক ব্যক্তির নিকট শুনলাম যে, কোন লোককে যাকাত দিলে তাকে বলে দিতে হবে যে, আমি তোমাকে এত টাকা যাকাত দিলাম। যাকাত কথাটা উল্লেখ না করলে নাকি যাকাত দেওয়া শুদ্ধ হবে না। উনার এ কথাটা কতটুকু সঠিক? দয়া করে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে যাকাতের টাকা দেওয়া হয়, তাহলে বলে দেওয়া উচিত। কারণ যাকে টাকাটা দিচ্ছেন, তিনি হয়ত যাকাত খাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি নন, অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টাকাটা খরচ করার সময় যেন যাকাতের খাতেই খরচ করা হয়। কিন্তু পরিচিত লোককে দেওয়ার সময় যদি আপনি জানেন যে, সে ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার যোগ্য এবং সে নিজের জন্যই টাকাটা নিচ্ছে, তাহলে যাকাত দেওয়া হচ্ছে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মনে করুন, আপনার কোন আপনজন নিজের কোন বিশেষ ঠেকার জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী হলো, আপনি জানেন সে ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাকে যাকাতের টাকা থেকে সাহায্য করছেন একথা জানতে পারলে সে মনে কষ্ট পাবে, তাহলে যাকাতের কথা উল্লেখ না করে তাকে দেওয়া উত্তম হবে।

৩৫. প্রশ্ন ঃ আমি একজন গরীব বিধবা মহিলা। আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনজন কন্যা সন্তান। আমার স্বামী মৃত্যুর আগে কিছু টাকা ঋণ করে গিয়েছিলেন। আয়ের কোন উৎস না থাকায় ঋণ পরিশোধ করতে পারছিলাম না। আমার তিন কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের মতামতে বসত বাড়ির জমির কিছু অংশ বিক্রি করে ঋণ শোধ করেছি। অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে রাখি। এমন কোনো বিশ্বাসী আত্মীয় পেলাম না যার কাছে টাকা দিয়ে ব্যবসা করে লাভ-লোকসানের অংশীদার হতে পারি। বাধ্য হয়ে ব্যাংকে টাকা রেখে তার লাভ দিয়ে সংসার চালাই। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, নফল ইবাদাত করি এবং নফল দান-খয়রাত করি। তবে বছর শেষে হিসাব করে যাকাত দেওয়া হয় না। কারণ বছর শেষে আমার হাতে কোন টাকা থাকে না। পাঁচ বছর ধরে আমি খুব অশান্তিতে আছি। কারণ আমি মুসলমান হয়ে সুদের টাকা খাচ্ছি এবং যাকাত দিচ্ছি না। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমার তিন কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে এবং সামান্য কিছু আয়ের পথ পেয়েছি, ৪/৫টি কাঁচা ঘর করে ভাড়া দিয়েছি। আমি অসুস্থ। আমার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা ব্যাংকে রাখতে হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে–

ক. আমি আমার চিকিৎসার জন্য ব্যাংকে যে টাকা রাখব তার যাকাত আমি কিভাবে দেব?

খ. পাঁচ বছর যাবৎ আমি ব্যাংকে রাখা মূল টাকার কোন যাকাত দেইনি, এখন আমার কি করণীয়?

গ. অনেকে বলছে, সুদের টাকার যাকাত হয় না। তাহলে আমি কি করে যাকাত দেব?

ঘ. ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে ঐ টাকার লাভ দিয়ে যাকাত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর ঃ বর্তমানে দেশে অনেকগুলো ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সেসব ব্যাংকে টাকা জমা রেখে হালাল পন্থায় লাভ পাওয়া যায়। সুতরাং জমা টাকার যাকাত পরিশোধ করায় সমস্যা নেই। টাকা যে নিয়তেই জমা রাখা হয় তার যাকাত দিতে হবে।

হাঁ, সুদের টাকার যাকাত হয় না। সুদী টাকা সাওয়াবের নিয়ত না করে গরীব- মিসকীনদেরকে সাদাকাহ্ করে দিতে হবে।

৩৬. প্রশ্ন ঃ একজন মহিলা ঋণগ্রস্ত। স্বামী রোজগার করতে অক্ষম। এক ছেলে চাকুরি করে। এই চাকুরির বেতনেই সংসার চলে। এমতাবস্থায় নিকটাত্মীয়দের যাকাতের অর্থ গ্রহণ করত তিনি ঋণ পরিশোধ, চিকিৎসা কিংবা নিজের জরুরি ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন কি না?

উত্তর ঃ মহিলা যেহেতু সন্তানের উপর নির্ভরশীল। নিজের কোন রোজগার বা সম্পদ নেই। সেহেতু তিনি যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকেরই যাকাতের অর্থ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা যাকাত গ্রহণ করার যোগ্য তাদের দেওয়া উত্তম।

৩৭. প্রশ্ন ঃ যাকাতের টাকা দিয়ে কোনো গরীবকে স্বাবলম্বী হওয়ার শর্তে গাড়ি কেনার জন্য ৮০/৯০ হাজার টাকা দেওয়া যাবে কি না? প্রাপক কি উক্ত টাকা নিসাব পরিমাণের উপরে হওয়ায় যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দেয়া যাবে। তবে এই টাকা যদি গ্রহীতার নিকট এক বছর কাল জমা থাকে কিংবা এই টাকা বিনিয়োগের পর তার আয় যদি বছরান্তে নিসাব পরিমাণ জমা হয় তাহলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে।

৩৮. প্রশ্ন ঃ আমার পিতা ইন্তিকালের পূর্বে ২০,০০০ হাজার টাকা আমাকে দিয়ে যান। এ টাকা ব্যাংকে রক্ষিত অবস্থায় এক বছর পূর্ণ হয়েছে উক্ত টাকায় যাকাত ফরয হয়েছে কি না?

উত্তর ঃ উক্ত টাকা যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার বেশি হয় আর উক্ত টাকার পূর্ণ মালিকানা যদি আপনার হয় এবং তা যদি আপনার জীবন নির্বাহের প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় তবে সেই টাকার যাকাত ফরয হয়েছে, ৪০ ভাগের এক ভাগ উপযুক্ত গরীবদের বছরান্তে দিয়ে দেবেন।

৩৯. প্রশ্ন ঃ স্বর্ণালংকারে খাদ থাকে প্রতি ভরিতে ২ থেকে ৬ আনা পর্যন্ত। যাকাত দেবার সময় এই খাদের হিসাব বাদ দিয়ে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে কি না? স্বর্ণালংকারে খাদের তারতম্য হিসাবেই তার দাম বেশ-কম রয়েছে। যার কাছে যে মানের স্বর্ণ রয়েছে সেই মানের দাম স্থির করেই যাকাতের হিসাব করবে কি না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সেই দাম নির্ধারণ করেই যাকাতের হিসাব করবে।

৪০. প্রশ্ন ঃ আমার এক ভরি স্বর্ণ ও পাঁচ ভরি রূপার গহনা আছে। সোনার গহনা সব সময় ব্যবহার করি। কিন্তু রূপার গহনাগুলো ব্যবহার হয় না। আমাকে কি এগুলোর যাকাত দিতে হবে? একজন বললেন, এক ভরি সোনা ও কিছু রূপা থাকলেই যাকাত দিতে হয়। কথা কি সঠিক? আমাদের ঘরে যদি টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল থাকে তাহলে কি ঐসবের মূল্য থেকেও যাকাত হিসাব করতে হবে? দয়া করে উত্তর দিবেন।

উত্তর ঃ আপনার স্বর্ণ রৌপ্য এবং নগদ টাকা (যদি থাকে) সব মিলিয়ে যদি সাড়ে ৫২ ভরি রূপার সমমূল্য হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে যাকাত দিতে হবে। আপনার উল্লেখিত বস্তু সামগ্রী যেহেতু আসবাব পত্রের মধ্যে গণ্য, সুতরাং তার যাকাত দিতে হবে না।

৪১. প্রশ্ন ঃ আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমার ৫/৬ বিঘা জমি আছে। হজ্জে যাওয়ার মতো টাকা আমার আছে। কিন্তু আমি ঋণী আছি। ঐ টাকা দিয়ে দিলে আমার হজ্জের টাকা হয় না। এহেন অবস্থায় আমার কি হজ্জ ফরয হবে? আমার ওপর যাকাত ফরয কি না জানাবেন।

উত্তর ঃ হজ্জ এবং যাকাত কার উপর ফরয হয় জানলেই বুঝতে পারবেন। নিজের সাংসারিক খরচ বাদে যানবাহন এবং খাওয়া-পরার মাঝারি ধরনের খরচ চালিয়ে যে মক্কা শরীফ গমন করতে এবং সেখান হতে আবার বাড়ি ফিরতে পারবে, তার উপর হজ্জ ফরয। কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা এক বছর কাল জমা থাকলে বছরান্তে তার উপর যাকাত দেয়া ফরয। যদি তার চেয়ে কম রূপা বা সোনা থাকে তবে

যাকাত ফরয হবে না। উপর্যুক্ত পরিমাণের বেশি থাকলেও যাকাত দিতে হবে। (মেশকাত ২২১ পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর ২য় খণ্ড, ১৫৮, ১৬৩ পৃষ্ঠা, শরহে বেকায়া, ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

৪২. প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রের খাদসহ হিসাব করতে হবে নাকি খাদ ছাড়া এবং বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আপনি বিক্রি করতে গেলে যে মূল্য পান সেই মূল্য হিসাব করেই আপনাকে যাকাত আদায় করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এগুলোর বর্তমান বাজার মূল্য যাই থাক না কোন যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই খাদসহ আর খাদ ছাড়া কোনটাই আর বিবেচ্য বিষয় রইলো না।

৪৩. প্রশ্ন ঃ যাকাতের হিসেব করার ক্ষেত্রে কোন সনটি বিবেচনায় নেবো।

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে আপনি চন্দ্র মাস হিসাব করতে পারেন। অর্থাৎ মহররম, সফর, রমযান ইত্যাদি আরবি মাস।

৪৪. প্রশ্ন ঃ বছরের মধ্যে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তখন সময়ের হিসাবটা কিভাবে করবো?

উত্তর ঃ বছরের শুরুতে যদি কারও নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের শেষেও যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে মাঝখানে না থাকলেও তাঁকে ঐ বছরের যাকাত দিতে হবে।

৪৫. প্রশ্ন ঃ ধার দেওয়া টাকা সময় মত না পেলেও এ টাকাকে কি যাকাতের হিসেবে ধরে নেবো?

উত্তর ঃ ধার দেওয়া টাকা হাতে না পেলেও সেটাকে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। দু' ধরনের পাওনা টাকা হতে পারে। এক. যে টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সেটির যাকাত দিতে হবে। দুই. যে টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, পাওয়া যেতেও পারে নাও পারে। এমন টাকার যাকাত আদায় করতে হয় না। কেবলমাত্র টাকা হাতে পাবার পরে এক বছরের হিসাব করে যাকাত দিতে হয়।

৪৬. প্রশ্ন ঃ বিলাস সামগ্রী কি যাকাতের হিসাবে আসবে? যদি আসে তার আর্থিক মূল্যায়ন কিভাবে করব? বিলাস সামগ্রীর বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ। বিলাস সামগ্রীর যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে ঐ সামগ্রী বিক্রি করতে গেলে যে দাম পাওয়া যাবে সেই দামের উপরে যাকাত আদায় করতে হবে। বিলাস সামগ্রী হচ্ছে যেমন একটি বড় টিভি আপনি কিনলেন, এটি না হলেও হয়, তাই যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন একটি গাড়ি আপনার চলাফেরার জন্য প্রয়োজন, সেটির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। কিন্তু তারপরেও আর একটি গাড়ি যদি আপনি ক্রয় করেন তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। এমনিভাবে বাড়ি-ঘরের ব্যাপারেও যদি একের অধিক বাড়ি অধিক পয়সা খরচ করে বিদেশ থেকে নির্মাণ সামগ্রী এনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি করা হয় তবে সেগুলোও বিলাস সামগ্রী এবং এগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। এভাবে যে কোন জিনিসই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই সেটি বিলাস সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাঁর যাকাত এভাবে হিসাব করে আদায় করতে হবে।

৪৭. প্রশ্ন ঃ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মজুদ/বিক্রয়যোগ্য মালামাল কি যাকাতের হিসেবে আসবে? আসলে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য না বিক্রয় মূল্য হিসেব করে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ এ সকল ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। আবার যদি এমন থাকে যে, কোন পণ্য আপনি প্রোডাকশন বা উৎপাদন করেছেন তাহলে সেই পণ্যের উৎপাদন খরচ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

৪৮. প্রশ্ন ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঁচামাল/উৎপাদিত পণ্য কি যাকাতের হিসেবে আসবে। আসলে তার মূল্য নির্ধারণ কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ তৈরিকৃত মালের উৎপাদন খরচ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। কাঁচামালের ক্রয়মূল্যসহ হিসাব করতে হবে এবং বাজারে যে টাকা পড়ে আছে তার হিসাব করে তার যাকাত আদায় করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি কারও পাওনা থেকে থাকে তাহলে সেই ঋণ বাদ দিয়ে হিসাব করে তার যাকাত আদায় করতে হবে। ঋণ যদি মেয়াদী ঋণ হয় যেমন ধরুন ১০ বছর ধরে আপনি ঋণ শোধ করেছেন তাহলে পুরোটা ঋণ একসাথে হিসাব করে বাদ দেওয়া যাবে না। যতটুকু আপনি আদায় করেছেন মূল টাকা থেকে ততটুকু বাদ দিয়ে হিসাব করে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৪৯. প্রশ্ন ঃ স্থাবর সম্পত্তি যেমন বাড়ি ঘর, জায়গা জমি, শিল্প প্রতিষ্ঠান কি যাকাতের হিসাবে আসবে?

উত্তর ঃ বসবাসের বাড়ি জায়গা জমি এগুলোর যাকাত দিতে হয় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র কল-কারখানা এগুলোর যাকাত দিতে হয় না। তবে হ্যাঁ সেই বাড়ির যাকাত দিতে হয় যে বাড়ির ব্যবসা করা হয়। অর্থাৎ বাড়ি বানিয়ে বিক্রি করা আবার ক্রয় করে বিক্রি করার যে বাড়ি সেই বাড়ির যাকাত দিতে হবে। জমির ক্ষেত্রেও যদি কেউ জমি বেচাকেনার ব্যবসা করেন তাহলে সেই জমিকে পণ্য ধরে তার ক্রয়মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। মাঠের জমিতে যে ফসল হবে সেই ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি সেচ দেওয়া ফসল হয় তাহলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৫০. প্রশ্ন ঃ কোন কোন খাতে যাকাত দেওয়া যেতে পারে? প্রকাশ্যে না গোপনে? বলে নাকি না বলে? কিভাবে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ যাকাত দেওয়ার খাত তো আল-কুরআনুল কারীমে নির্দেশ করা আছে যে, ফকীর, মিসকীন, যারা ইসলামে নতুন এসেছে, পথিক, মুসাফিরকে যাকাত দেওয়া যাবে। ঋণগ্রস্তকে এবং কোন বন্দি মুক্তির জন্যও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে এবং যদি এ রকম হয় যে, রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে বিতরণ করে তাহলে ঐ যাকাত সংগ্রহ কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদেরও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে বেতন হিসেবে।

অনেকে মনে করেন যে, যাকাতের অর্থ দিতে হবে এই বলে যে, এটি যাকাতের অর্থ। এটি ঠিক নয়। যাকাতের অর্থ বরং না বলে দেওয়াটাই উচিত। কারণ অনেকের এতে করে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

৫১. প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী একজন আর্মি অফিসার। তাঁর ৫ লাখ টাকা ওয়েজ আর্নার বন্ড কেনা আছে যা থেকে ৬ মাসে প্রায় ৬/৭ হাজার টাকা সুদ আসে এটা কি হালাল? এর যাকাত কি দিতে হবে?

উত্তর ঃ এ জাতীয় বিনিয়োগ বা জমার থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে তা গ্রহণ করা হারাম। সুদ আল্লাহ হারাম করেছেন। তাই ঐ সুদের টাকা নিজে গ্রহণ না করে সাওয়াবের নিয়ত না করে গরীব-দুঃখীদের দান করে দিতে হবে। আর আপনার যে মূল টাকা তার যাকাতও প্রতি বছরেরটা প্রতি বছর আদায় করতে হবে। আপনার স্বামীর ঐ বন্ডের টাকা শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

৫২. প্রশ্ন ঃ আমার স্বর্ণ ৭.৫০ ভরির উপরে এর জন্য আমি যাকাত দেই। আবার ব্যাংকে আমার ২০ হাজার টাকা জমা আছে সেটারও কি যাকাত দিতে হবে? আলিকোতে আমার মেয়ের নামে একটি শিক্ষা বীমা আছে সেটারও কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ আপনার নগদ টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে এবং ইনসিউরেন্স এ জমাকৃত টাকারও যাকাত দিতে হবে।

৫৩. প্রশ্ন ঃ একজন লোকের জমা খরচের হিসাব দেওয়া হলো, আপনি কি বলবেন এক বছরে তাঁর কত টাকা যাকাত দিতে হবে? তাঁর মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা, রমযান মাসে কোন টাকা জমা দিলো না, শাওয়াল মাসে কোন টাকা জমা দিলো না, যিলকদ মাসে জমা দিলো ৩ হাজার টাকা, জিলহজ্জ মাসে জমা ২ হাজার টাকা, মহররম মাসে দিলো ২ হাজার টাকা, সফর মাসে ব্যাংক থেকে উঠালো ২ হাজার টাকা, রবিউল আউয়াল মাসে জমা দিলো ৯ হাজার টাকা এবং রবিউস সানীতে উঠালো ১ হাজার টাকা। জমাদিউল আউয়ালে জমা দিলো ৩ হাজার টাকা, জমাদিউস সানীতে এভাবে তার কত টাকা যাকাত হবে?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের সোজা উত্তর হচ্ছে– যে মাস থেকে টাকা জমা করা শুরু করেছেন এবং জমা করতে করতে যখন টাকার পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সম-সাময়িক বাজার দরের সম-পরিমাণ টাকা হলেই যাকাত ফরয হবে। এবার ঐ পরিমাণ টাকা জমা হবার পরে পরবর্তী ১ বছর দেখতে হবে যে, জমা হয়েছে কত এবং খরচ হয়েছে কত এবং খরচ জমার থেকে বাদ দিয়ে যদি দেখা যায় যে ঐ পরিমাণ টাকার বেশি আছে তাহলে তাঁকে যাকাত দিতে হবে। এই ১ বছরের মাঝখানে যদি তিনি টাকা তোলেন আবার জমা দেন তাতে কোন কিছু আসে যায় না। ঐ পরিমাণ টাকা জমা হবার পর থেকে পরবর্তী ১ বছরের জমা খরচ হিসাব করেই কেবল যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

৫৪. প্রশ্ন ঃ আমার বাবা মারা গেছেন প্রায় ৫ বছর হলো। আমরা ৩ ভাই পড়ালেখা করছি। বর্তমানে আমাদের সংসারে উপার্জনক্ষম কেউ নেই, তবে আমার মায়ের কাছে প্রায় ৭০ হাজার টাকা এবং ৫ ভরি স্বর্ণ আছে, এতে কি আমাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে? উল্লেখ্য যে, আমরা আমার চাচার দেওয়া টাকা দিয়ে সংসার চালাই।

উত্তর ঃ আপনার কথার দ্বারা বুঝা গেছে যে, আপনাদের তেমন স্বচ্ছলতা নেই। তবুও নগদ ৭০ হাজার টাকার সাথে ৫ ভরি স্বর্ণের বাজার মূল্য যোগ করে

যাকাত আদায় করতে হবে। আপনি হয়তো ভাবছেন যে, যাকাত দিলে আমাদের অবস্থা আরও নিচে নেমে যাবে। কখনও না। বরং যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে, পবিত্র হয়। আপনার তো ৭০ হাজার টাকা আছে, যার ৭০ টাকাও নেই তাঁর দিকে তাকালে আপনার যাকাত দিতে কষ্ট হবে না। কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যাকাতকে সমৃদ্ধি দান করেন এবং সুদকে ক্ষয় করেন। তাই আপনাদের এই টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।

৫৫. প্রশ্ন ঃ প্রতি বছরের যাকাতের টাকা প্রতি বছরই খরচ করতে হবে? নাকি এই টাকা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কোন ইয়াতীমদের কল্যাণে অথবা তাদের লেখাপড়ার জন্য খরচ করা যাবে?

উত্তর ঃ যাকাতের টাকা ফাণ্ড করে ধরে রাখা যাবে না। কারণ যতক্ষণ যাকাতের টাকা না পৌঁছানো হবে ততক্ষণ যাকাত আদায় হবে না। তবে আপনি পরিকল্পনা করে একজন বা দুইজন বা তিনজন গরীব ছাত্রকে লেখাপড়া করাতে পারেন এই টাকা দিয়ে। আপনি এটা এভাবে করতে পারেন যে, তারা যেহেতু যাকাত নেওয়ার যোগ্য এবং আপনি তাদেরকে এটা দেবেন আপনার উদ্দেশ্য থাকবে যে, তাঁরা এই অর্থ দিয়ে লেখাপড়া করুক, তবে এটা তাদের ব্যাপার যে, তাঁরা এটা লেখাপড়ার জন্য খরচ করুক বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করুক। এ ব্যাপারে আপনি তাঁদের কোন শর্ত আরোপ করতে পারবেন না যে, তুমি এই অর্থ কেবল এই খাতেই ব্যবহার করতে পারবে। কোন শর্ত দিলে সেটির দ্বারা যাকাত আদায় হয় না। তবে এই টাকা ধরে রাখা যাবে না এবং আস্তে আস্তে দেবেন এই চিন্তাও করা যাবে না।

৫৬. প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের সঞ্চিত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ জী, হ্যাঁ। ছাত্রদের সঞ্চিত টাকা যদি যাকাত পরিমাণ হয় তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। টাকার পরিমাণ যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সম মূল্যমান হয় তবে ছাত্র হোক আর শিক্ষক হোক তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৫৭. প্রশ্ন ঃ আমাদের স্বামী স্ত্রীর দুজনের প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা আছে। আমার স্ত্রীর আছে ১ লক্ষ টাকা। তাছাড়া আমার ২ লক্ষ টাকা ঋণ আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত ৩ লক্ষ টাকার যাকাত আমাকেই আদায় করতে হবে? নাকি যার যার যাকাত তারই আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ আসলে নিয়ম হচ্ছে যার যাকাত তারই আদায় করতে হবে। তবে আপনি যদি পুরো যাকাত একাই আদায় করে দেন অথবা আপনার স্ত্রী যদি আপনার যাকাতও আদায় করে দেন তাহলে আদায় হয়ে যাবে। এতে কোন নিষেধ নেই। এটি জায়েয। আপনার যাকাতযোগ্য অর্থের চাইতে যদি ঋণ বেশি হয় তবে যাকাত আদায় করতে হবে না এবং ঋণ বাদ দিয়ে জমাকৃত অর্থের যে যাকাত হবে সেই যাকাত আদায় করতে হবে।

৫৮. প্রশ্ন ঃ আমার স্ত্রীর ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। তার কি পুরো স্বর্ণের যাকাত আদায় করতে হবে? নাকি সাড়ে সাত ভরির যাকাত আদায় করলেই হবে?

উত্তর ঃ জী, হ্যাঁ। ১০ ভরি স্বর্ণের যাকাতই আদায় করতে হবে। সাড়ে সাত ভরি হচ্ছে যাকাতের নিসাব। সাড়ে সাত ভরি হলে সে যাকাত দানের উপযুক্ত হবে এবং এর বেশি যত পরিমাণ স্বর্ণ থাকবে সকল স্বর্ণেরই যাকাত আদায় করতে হবে।

৫৯. প্রশ্ন ঃ আমার স্ত্রীর যাকাত পরিমাণ স্বর্ণ আছে কিন্তু যাকাত আদায়ের জন্য নগদ অর্থ নেই। আমি তার যাকাত আদায় করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমার কিছু লোন রয়েছে। ঐ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যদি আমার লোন হিসাব করে স্ত্রীর যাকাত আদায় করে দেই তাহলে কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ জী না জায়েয হবে না। কারণ আপনার স্ত্রীর যাকাত তারই আদায় করার বিধান। কিন্তু আপনিও তার পক্ষে যাকাত আদায় করতে পারেন। সেই অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার লোনের টাকার সঙ্গে ঐ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগের বিধান ইসলামে নেই। কারণ লোন হচ্ছে আপনার নিজের। আর যাকাত আপনার স্ত্রীর। দুটি আলাদা বিষয়। আপনার যাকাতের ক্ষেত্রে আপনার লোনের বিবেচনা হতে পারে। আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে নয়।

৬০. প্রশ্ন ঃ আমি একটি কলেজের প্রভাষক। আমার স্বর্ণের যাকাত হয় প্রতি বছর ৫ হাজার টাকা। আমার কলেজে প্রতি বছর গরীব ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির জন্য ৫ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। আমার যাকাতের টাকা যদি এ খাতে দেই তাহলে কি যাকাত আদায় হবে? উল্লেখ্য যে, আমার যাকাত আদায়ের জন্য আলাদা কোন টাকা নেই।

উত্তর ঃ যদি ঐ চাঁদার টাকা শুধু গরীব ছাত্রদের জন্য খরচ করা হয়, তাহলে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি আপনার নগদ অর্থ না থাকে তাহলে স্বর্ণ ৪০ ভাগ করে ১ ভাগ যাকাত আদায় করুন।

৬১. প্রশ্ন ঃ যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার নিয়ম কেন হলো। দুটোর মূল্য তো সমপরিমাণ নয়। কোনটি কার জন্য প্রযোজ্য বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর ঃ সে যুগে স্বর্ণ মুদ্রা (দীনার) ও রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) চালু ছিলো এবং সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যমান প্রায় সমান ছিলো, তাই এই নিয়ম চালু করা হয়।

৬২. প্রশ্ন ঃ আমি প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার দেনা আছি এবং আমাকে এই দেনার সুদ আদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় আমাকে কি যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি আপনার জমাকৃত টাকার চেয়ে ঋণের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যদি আরও যাকাত যোগ্য সম্পদ থাকে তাহলে সব সম্পদ হিসাব করে যদি দেখা যায় যে, ঋণের চাইতে বেশি তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে।

৬৩. প্রশ্ন ঃ স্বর্ণের যাকাতের ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন এসে যায় সেটি হচ্ছে স্বর্ণের মধ্যে কিছু খাদ থাকে খাদ বাদ দিয়ে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে, নাকি বিক্রয় মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ জি, হ্যাঁ। আপনার শেষের কথাটিই সঠিক। কারণ বিক্রয় করতে গেলে তারা বুঝতে পারেন যে, কতটুকু খাদ আছে। তারা সেভাবেই মূল্য নির্ধারণ করেন। সুতরাং ক্রয়মূল্য নয় বরং বিক্রয় মূল্য হিসাব করেই যাকাত দিতে হয়।

৬৪. প্রশ্ন ঃ ব্যাংকে একটা ডিপিএস আছে। প্রতি মাসে এর কিস্তির টাকা প্রদান করছি। উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ জি, হ্যাঁ। ডিপিএস যেহেতু আপনারই টাকা সেহেতু আপনাকে এর যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

৬৫. প্রশ্ন ঃ আমার কিছু অলংকারের যাকাত আমি প্রতি বছর হিসেব করে দিয়ে আসছি। আমি চাকুরী করি না আমার স্বামী চাকুরী করেন। প্রতি মাসেই আমার স্বামীকে তার কর্মস্থলের একটা ফান্ডে ৫০০/১০০০ টাকা সাহায্য দিতে হয়। যদি ঐ টাকা হিসাব করে যাকাতের টাকা আদায় করে দিই তাহলে কি তা আদায় হবে?

উত্তর ঃ যে তহবিলের কথা আপনি বলেছেন সেই তহবিলের বিস্তারিত বিবরণ না জানালে বলা যাচ্ছে না যে সেই তহবিলে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কিনা? যাকাতের টাকার ব্যাপারে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, যাকাতের টাকার মালিকানা দিয়ে দিতে হবে যাকাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে। আর যাকাতের টাকা কেবল গরীবরাই ভোগ করতে পারবে। যে তহবিল থেকে ধনী গরীব উভয়েই সুবিধা নিচ্ছে সে রকম তহবিলে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না।

৬৬. প্রশ্ন ঃ নন ইসলামী ব্যাংকে আমার ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা জমা আছে। উক্ত টাকা ইসলামী ব্যাংকে জমা রাখব বলে সংকল্প করেছি। আমার উক্ত টাকার কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ জি, হ্যাঁ। এই পরিমাণ টাকার অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আপনি টাকাগুলি ইসলামী ব্যাংকে নিয়ে আসুন এবং উক্ত টাকার যত সুদ হয়েছে সব টাকা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিন।

৬৭. প্রশ্ন ঃ চাকুরী না থাকলে বা অবিবাহিত হলেও কি যাকাত আদায় করতে হবে? যদি করতে হয় তবে কত টাকায় কি পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ জি, হ্যাঁ। চাকুরী না থাকলেও অবিবাহিত হলেও যদি যাকাত পরিমাণ টাকা থাকে তাহলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। বিয়ের সাথে যাকাতের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থের সাথে যাকাতের সম্পর্ক। সাড়ে সাত তোলা বা তার বেশি স্বর্ণ থাকলে অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা তার বেশি রৌপ্য থাকলে এবং ১ বছর পর্যন্ত যদি এগুলো কারও কাছে থাকে তাহলে বছর শেষে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। আর টাকার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমতুল্য টাকার মালিককে যাকাত আদায় করতে হয়। আর যাকাতের নিয়ম হচ্ছে শতকরা আড়াই টাকা হারে অথবা ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসাবে যাকাত আদায় করতে হয়।

৬৮. প্রশ্ন ঃ আমার বছরে ১৫ হাজার টাকা যাকাত হয়। আমার দেবরকে আমার স্বামী ৩ বৎসর আগে এবং চলতি বছরের মধ্যে সব মিলে ৫ লাখ টাকা ব্যবসার জন্য দিয়েছে যা সে ফেরত দিতে পারবে না। প্রশ্ন হচ্ছে দেবরকে দেওয়া ঐ টাকা থেকে কি প্রতি বছর যাকাতের টাকা কেটে দেওয়া যাবে?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হয়েছে আপনার উপরে। আর ঐ টাকা যেহেতু আপনার স্বামী আপনার দেবরকে দিয়েছে তাই আপনার যাকাত ঐ টাকা থেকে

আদায় হবে না। আপনারটা আপনার টাকা দিয়েই আদায় করতে হবে। আর যদি আপনার স্বামীর উপর যাকাত হয়ে থাকে তবে ঐ টাকা থেকে কেটে কেটে যাকাত আদায় করলে সেটা যাকাত হবে না। নিয়ম হচ্ছে যে, যাকাতের মালিকানা ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি কারও কাছে টাকা পায় তিনি ঐ টাকা ফেরত দেওয়ার পরে আবার তা থেকে যাকাত দিতে পারবেন। কিন্তু এভাবে কেটে রেখে যাকাত আদায় হবে না।

৬৯. প্রশ্ন ঃ আমি যদি ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন গ্রহণ করি এবং তা পরিশোধ করতে ৩/৪ বছর লাগে। এই সময়ে আমি কিভাবে যাকাত আদায় করব?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে ঋণকৃত টাকা বাদে আপনার মোট সম্পদ (যাতে যাকাত দিতে হয়) হিসাব করতে হবে এবং একই সাথে আপনার লোনের পরিমাণ হিসাব করতে হবে এবং চলতি বছরে আপনার ঋণ যতটুকু পরিশোধ করতে হবে সেই পরিমাণ টাকা মোট সম্পদের থেকে বাদ দিয়ে যা থাকে সেই পরিমাণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আগামী বছর বা তার পরের বছরের লোন হিসাব করা যাবে না।

৭০. প্রশ্ন ঃ আমার আপন ভাই-বোনদের কি আমি যাকাত দিতে পারবো?

উত্তর ঃ যাদেরকে রোজগার করে খাওয়ানো আপনার দায়িত্ব তাদেরকে আপনি যাকাত দিতে পারবেন না। এটা হচ্ছে নিয়ম। এখন আপনার ভাই বা বোন যদি আলাদা সংসারে বসবাস করে থাকেন, আলাদা রোজগার করে খেয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। তবে তাদের যাকাতের অর্থ না দিয়ে অন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করা উচিত। যাকাতের অর্থ আপন ভাইবোনদেরকে দেওয়া জায়েয। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত। আবার যাকাতের অর্থ দিয়ে সেটা আপনি গোপনও রাখতে পারেন। এটা যে যাকাতের অর্থ সেটা না বলেও সাহায্য করা যেতে পারে। কারও আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকলে তাকে না বলেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যায় এবং এটা ইসলাম সম্মত।

৭১. প্রশ্ন ঃ আমার উপরে যাকাত ফরয। আমি কিছু টাকা একজনকে ধার দিয়েছি। ঐ টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় কালে কি ধার দেওয়া টাকার যাকাতও আমাকে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ ধার দেওয়া টাকা আপনারই টাকা এবং আপনি যদি নিশ্চিত হন সেই টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তাহলে ঐ টাকার যাকাতও

আপনাকে আদায় করতে হবে। আর যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে ঐ টাকা আপনি ফেরত পাবেন না তাহলে যাকাত আদায় না করলেও চলবে। ফেরত পাওয়ার পরে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৭২. প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে নিয়মিত যাকাত আদায় করি। কিন্তু অতীতে যাকাত আদায় করিনি। আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া এজন্য আমি আর কি করতে পারি?

উত্তর ঃ আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং বেশি বেশি দান-খয়রাত করতে পারেন। অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। আপনার সাধ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে এ কাজগুলি বেশি বেশি করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন আশা করা যায়।

৭৩. প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৭০ বছর, আমি বিগত দিনে নামায, রোযা, যাকাত কিছুই আদায় করিনি। কিন্তু আমি এখন অনুতপ্ত হয়ে পেছনের সকল কাযা অল্প অল্প করে আদায়ের সাথে নিয়মিত নামায আদায় করছি। এভাবে কি আমি ক্ষমা পাব?

উত্তর ঃ জী, হ্যাঁ। আপনি অনুতপ্ত হয়ে পেছনের গুনাহ থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে আর কোন এ ধরনের ভুল না করার প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন। ৭০ বছরের পেছনের কাযা নামায ওয়াক্ত গুণে গুণে না পড়লেও চলবে কেবল সুযোগ পেলেই বেশি বেশি নফল নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতে হবে। রোযার ক্ষেত্রে বেশি-বেশি নফল রোযা রাখবেন আর যদি সম্ভব হয় পেছনের অনাদায়ী যাকাত হিসাব করে যাকাত আদায় করবেন। অন্যথায় বেশি-বেশি দান-খয়রাত করবেন এবং এখন থেকে নিয়মিত যাকাত আদায় করবেন। তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৭৪. প্রশ্ন ঃ যাকাত পরিমাণ অর্থ আছে তবে ঋণের পরিমাণ তার চাইতে বেশি এমতাবস্থায় কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ জী না। ঋণগ্রস্ত থাকলে যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় বেশি দিন থাকা যাবে না। যতশীঘ্র সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে ফেলতে হবে এবং ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। ঋণ বাদ দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে সে অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে।

৭৫. প্রশ্ন ঃ যারা ঠিকাদারী করে তাদের টাকা ৬ মাস এক বছর বা তারও বেশি সময় আটকে থাকে, সে ক্ষেত্রে কি ঐ আটকে থাকা টাকার যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ জী না। আটকে থাকা টাকার উপরে যাকাত দিতে হবে না। যদি এমন হয় যে, আপনি কাজ করার পরে বিল সাবমিট করেছেন কিন্তু হাতে পাননি তাহলে সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। যখন আপনি বিল আপনার হাতে বা একাউন্টে জমা করবেন কেবল তখনই যাকাত দিতে হবে।

৭৬. প্রশ্ন ঃ ব্যবসায় খাটানো টাকা বা ডিপিএস-এ জমাকৃত টাকার উপর কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ দিতে হবে। অর্থাৎ টাকার মালিক আপনি এবং সেই টাকা ব্যবসায় বা ব্যাংকে ডিপিএস-এর মাধ্যমে জমা করেছেন এবং শরীয়াত অনুযায়ী সেই টাকার মুনাফা আপনি পাবেন বা পাচ্ছেন, এমন হলে ঐ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।

৭৭. প্রশ্ন ঃ আমার স্বর্ণের কিছুটা আমার শাশুড়ীকে দিয়েছি, কিছুটা আমার মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি এবং সকলকে দেওয়ার পরে আমার যেটুকু স্বর্ণ আছে তাতে যাকাত হয় না, দিয়ে দেয়া স্বর্ণসহ আমার স্বর্ণের কি যাকাত আমাকে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি আপনি আপনার শাশুড়ী ও মেয়েকে ঐ স্বর্ণের মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে তার যাকাত আপনাকে দিতে হবে না। আর যদি ধার হিসেবে দিয়ে থাকেন তবে যাকাত দিতে হবে।

৭৮. প্রশ্ন ঃ আমি ফারইস্ট ইসলামী বীমায় বীমা করেছি। আমি বছরে যে কিস্তি দেই সেটার কি যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ আপনি বছরে যে টাকা কিস্তি হিসাবে প্রদান করেন সেটা যদি যাকাত পরিমাণ হয় তবে আপনাকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং মেয়াদ শেষে আপনি যে টাকা পাবেন সেটা সুদের টাকা হবে না।

৭৯. প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী অনেক বছর আগে ব্যবসা করতেন, জাহাজে পরিবহন ব্যবসা। ঐ ব্যবসা করে তিনি ১৮ লাখ টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ব্যবসায় লাভ হয়নি। তার মধ্যে এখনো প্রায় ৭-৮ লাখ টাকা দেনা আছে, আমার স্বামী শোধ করতে পারেনি। কয়েক মাস আগে আমার স্বামী মারা

গেছেন। কিন্তু এখন ঐ কর্জ শোধ করার মতো আমাদের সামর্থ নেই। আমার ছেলেরা চাকুরী করে। চাকুরী করে এ কর্জ শোধ করতে পারবে না। তাদেরও সংসার আছে তারা পোল্ট্রি ফার্ম করেছিলো তাতেও লোকসান হয়েছে। এখন আমার সাড়ে আট ভরি স্বর্ণ আছে এবং আমার স্বামীর ৭-৮ লাখ টাকা কর্জ আছে। আমার কি যাকাত দিতে হবে? এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ আপনাকে যাকাত দিতে হবে। কারণ আপনার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব তো আপনার না। ঋণী হয়েছিলেন আপনার স্বামী, তারই উচিত ছিলো সংসারের খরচ বহন করার। আর ঋণীও তিনি হয়েছেন। সেজন্য আপনি দায়ী নন। আপনার যে অলংকার আছে সম্পদ আছে সে জন্য আপনাকেই যাকাত দিতে হবে। ঋণের মালিক হলেন স্বামী আর অলংকারের মালিক হলেন আপনি। সুতরাং আপনারটা আপনাকেই দিতে হবে। স্বামীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আর যাদের কাছে আপনার স্বামী ঋণী, তাদেরকে বলে কয়ে তাকে দায়মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনি বলতে পারেন, যেহেতু আমার স্বামী আপনাদের কাছে ঋণী, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন। যদি আল্লাহ আমার ছেলেদের সামর্থ দেয় তাহলে শোধ করে দেবে বা আমার যদি সামর্থ হয় তাহলে শোধ করে দেবো।

৮০. প্রশ্ন ঃ আমার ৩ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। তার জন্মের সময় আমার আত্মীয়-স্বজন যে সকল স্বর্ণ টাকা এবং আরও উপহার সামগ্রী দিয়েছিলো তা ২০ হাজার টাকার সমান এবং তা আমি আমার নামে ব্যাংকে রেখেছি। উক্ত টাকার যাকাত আমাকে কি প্রদান করতে হবে?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ যাকাত দিতে হবে। যেহেতু ঐ বাচ্চার অভিভাবক আপনি, সেহেতু আপনাকে ঐ অর্থের যাকাত দিতে হবে। ঐ অর্থ সংরক্ষণ করা এবং সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। আর যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা হয়।

৮১. প্রশ্ন ঃ হারাম উপার্জন বা অসৎ উপায়ে উপার্জিত টাকার কি যাকাত আদায় করা যাবে? কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই?

উত্তর ঃ মূলত: হারাম বা অসৎ উপায়ে উপার্জিত টাকার মালিকানা উপার্জনকারী ব্যক্তির হতে পারে না। বরং যাদের হক নষ্ট করে তিনি উপার্জন করেছেন

তারাই এই অর্থের মালিক। অতএব যত সম্পদই থাকুক সম্পদের মালিকানা না থাকলে কি করে সেই সম্পদের যাকাত তিনি দেবেন। হারাম উপার্জনের পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে যারা ঐ সম্পদের মালিক তাদেরকে। আর যদি এমন হয় যে, সম্পদের আসল মালিক কে বা কার হক নষ্ট করে উপার্জন করা হয়েছে, এটা জানা বা খুঁজে বের করা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ অর্থ পুরোটাই গরীবদের দান করে দিতে হবে এবং এই দান হবে অর্থের আসল মালিকের পক্ষে উপার্জনকারীর নয় এবং দানের সওয়াব উপার্জনকারীর হবে না বরং যারা বা যাদের হক নষ্ট করে উপার্জন করা হয়েছে সাওয়াব কেবল তাদেরই হবে।

তবে যে কোনভাবেই হোক অবৈধ উপার্জন করে ফেলেছেন তাদেরকে দানের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত না করাই উত্তম। প্রথমত হারাম উপার্জন করে একটি কবীরা গুনাহ করা এবং দ্বিতীয়ত তা হারাম পথে খরচ করে আর একটি গুনাহ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বেশি বেশি দান করা উচিত। হারাম উপার্জন বলে দান ফিরিয়ে দেওয়ার চাইতে ভালো কাজে তা ব্যয় করা উচিত তাহলে অন্তত হারাম পথে খরচ করার গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

৮২. **প্রশ্ন ঃ** আমার স্বামী ৭/৮ লক্ষ টাকার ঋণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমার ৮ ভরি স্বর্ণ আছে। এমতাবস্থায় আমাকে কি যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ যেহেতু স্বর্ণের মালিকানা আপনার সেহেতু আপনার যাকাত আদায় করতে হবে। আপনার স্বামীর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় না। আপনার যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আপনি কোনভাবেই বাধ্য নন। যাদের কাছে আপনার স্বামী ঋণী তাদের কাছে আপনি ঋণের ব্যাপারে আপনার স্বামীর পক্ষে মাফ চেয়ে নিতে পারেন। আপনি তাদের বলতে পারেন আমার স্বামী যেহেতু মৃত্যুবরণ করেছেন তাই আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁকে মাফ করে দিন। আমি বা আমার সন্তানরা যদি কোন দিন সঙ্গতি হয় তাহলে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে দেবো।

৮৩. **প্রশ্ন ঃ** সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে ব্যাংকে টাকা জমা রাখি। এভাবে বেশ কিছু টাকা জমা হয়েছে। এছাড়া বাড়িতেও বেশ কিছু টাকা মজুদ আছে। এখন যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাড়ির মজুদকৃত টাকার যাকাত দেব, নাকি ব্যাংকের সঞ্চয়কৃত টাকারও যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ বাড়িতে মজুদকৃত জমা টাকার মতই ব্যাংকের সঞ্চয়কৃত টাকারও যাকাত দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭২, জাওয়াহিরুল ফাতওয়া ১/৫১, নিযামুল ফাতাওয়া ২/২৭০)

৮৪. প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাড়ি বা দোকান ভাড়া নিলেই মালিকের নিকট ভাড়া গ্রহণকারী বেশ কিছু টাকা অগ্রীম জমা রাখতে হয় ঐ শর্তে যে, যখন সে বাড়ি বা দোকান ছেড়ে দেবে, তখন বাড়ি বা দোকানের মালিক উক্ত টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। ঐ টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে। যিনি বাড়ি বা দোকান ভাড়া নিচ্ছেন, তিনিই ঐ টাকার যাকাত দেবেন। কেননা ভাড়া গ্রহণকারীই ঐ টাকার প্রকৃত মালিক, দোকানের মালিকের নিকট উক্ত টাকা জমা রাখার কারণে তার মালিকানা শেষ হয়নি। তাই ভাড়া গ্রহণকারীই ঐ টাকার যাকাত দেবেন। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৩০৫, আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৬১)

৮৫. প্রশ্ন ঃ আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করি। বহু কষ্টে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাসায় জমা করেছি। এক বছরের বেশি হল, কোন কাজে লাগাইনি। এ টাকার কি যাকাত দিতে হবে? দিতে হলে শতকরা কত দিতে হবে? আর যদি উক্ত টাকা জমি বন্ধকে দেই, তবুও তার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আরবি তারিখ হিসেবে এক বছর পূর্ণ হলে উক্ত টাকার অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। এ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত হবে ১২৫০/- (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা)। সেই টাকা জমির বন্ধকে দিলেও যাকাত দিতে হবে। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৭৮)

৮৬. প্রশ্ন ঃ আমি একজন ব্যক্তির নিকট ৫,০০০/- টাকা পাই। প্রায় দুই বছর হল। লোকটি ভীষন গরীব বিধায় উক্ত টাকা আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই ক্ষেত্রে যদি আমি তাকে যাকাতের টাকা সরাসরি তার হাতে না দিয়ে তার কাছে পাওনা ৫,০০০/- টাকা মাফ করে দেই, তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হবে?

উত্তর ঃ না, এতে আদায় হবে না। পাওনাদারকে পাওনা টাকা মাফ করে দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না।

এক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হলো আপনি উক্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলবেন– আপনি কারো থেকে ৫,০০০/- টাকা কর্জ নিয়ে আমার ঋণ

পরিশোধ করুন, আমি আপনার সেই ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করব। অত:পর সে যার থেকে ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আপনার পাওনা আদায় করবে, আপনি যাকাতের টাকা দিয়ে তার উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। এতে আপনার যাকাতও আদায় হবে এবং তার পাওনাও পরিশোধ হবে, তাছাড়া সরাসরি তার হাতেও যাকাতের ৫,০০০/- টাকা যাকাত হিসেবে তাকে দিয়ে পরক্ষণেই তার থেকে আপনার পাওনা আদায় করে নিতে পারেন। এ সুরতেও আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৮৭. প্রশ্ন ঃ কেউ যদি কাউকে টাকা কর্জ দেয়, তাহলে কর্জ দেয়া টাকার উপরও কি যাকাত আসবে?

উত্তর ঃ কর্জের টাকা যদি পরিশোধ হবে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তা হলে কর্জ দেয়া টাকার উপরও যাকাত হিসাব করতে হবে এবং সে বৎসরের যাকাত আদায় করতে হবে।

যদি কর্জ দেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার আশা না থাকে, তাহলে তাৎক্ষণিক উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না। তবে পরবর্তীতে হাতে এলে তার যাকাত দিতে হবে।

৮৮. প্রশ্ন ঃ কাগজের নোটের মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে কি না? কাগজের নোট কাউকে দেওয়ার পরে তা দিয়ে কিছু ক্রয় করার পূর্বেই তা হারিয়ে গেলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ স্বর্ণ রূপা বা মালপত্রের মূল্য হিসেবে যে কাগজের নোট দেশে দেশে প্রচলিত রয়েছে, এটি মূল স্বর্ণ-রূপা বা মালের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তাই কাগজের নোট দ্বারা যাকাত আদায় করলে, তা আদায় হয়ে যাবে। যাকাত নেয়ার উপযুক্ত কাউকে দান করার পর তা সে হারিয়ে ফেললেও তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাকে দেয়ার পূর্বে মালিকের বা মালিকের প্রতিনিধির হাত থেকে হারিয়ে যায়, তবে পুনরায় অন্য টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/৮৭)

৮৯. প্রশ্ন ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার দোকানে ৫০ হাজার টাকার মাল আছে। আমি যে মালিক থেকে মাল ক্রয় করি, তিনি আমার কাছে ১ লক্ষ টাকা পাবেন। আমি আবার বাকীতে বিক্রয় করার কারণে আমার গ্রাহকদের কাছে ২ লক্ষ টাকা পাব। এখন আমার উপর যাকাত ফরয হবে কি না? ফরয হলে কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ নগদ ৫০ হাজার ও বকেয়া ২ লক্ষ মিলে আড়াই লক্ষ থেকে ১ লক্ষ মালিকের টাকা বাদ দিয়ে দেড় লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।

তবে যে সব টাকা বাকী রয়েছে, সেসব টাকা যদি একদম না উঠানো যায়, তাহলে যেসব পরিশোধের আশা নেই এমন বকেয়াকে না ধরেও তার উপর যাকাত হওয়ার ব্যাপারে হিসাব করতে পারবে। এরপর যখন এসব বকেয়া আদায় করা হবে, তখন পূর্বে যাকাত না দিয়ে থাকলে পূর্বের সহ বর্তমানে উক্ত আদায়কৃত টাকার যা যাকাত হয়, তা আদায় করতে হবে। (ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/১৪৩, ১৫২, ১৪২; ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৩০৫; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৭৩)

৯০. প্রশ্ন ঃ আমরা জানি যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে একটি খাত থেকে অমুসলিমদের অর্থ সাহায্য করা যায়। তাহলে অমুসলিম প্রতিবেশীদেরকে পূজা- উপাসনার জন্য, মন্দির নির্মাণের জন্য মুসলিমগণ নিজস্ব সম্পত্তি থেকে জমি দান করা বা অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন পর্যায়ে পড়বে?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের পূজা-উপাসনা ও মন্দির নির্মাণের জন্য কোন মুসলিমের অর্থ কিংবা জমি দান করা জায়েয নয়। কারণ মূর্তিপূজা শিরক। শিরকের কাজে সহযোগিতা করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কোন মুসলিমের জন্য এটাও জায়েয নয় যে, সে কোন অমুসলিমের ধর্মীয় কাজে কোন প্রকার বাধা দেবে। অমুসলিমগণ নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় কাজ করবে, এতে বাধা দেয়া কারো পক্ষেই বৈধ নয়।

৯১. প্রশ্ন ঃ একজন গৃহিনী মহিলার ৮/৯ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তিনি নগদ টাকা রোজগার করেন না। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে যাকাত আদায় করবেন?

উত্তর ঃ কোন মহিলার ৮/৯ ভরি স্বর্ণালংকার থাকলে তার যাকাত দিতে হবে। তবে তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাতে কি পরিমাণ খাদ বা অন্য ধাতু মিশানো আছে। কারণ যে কোন স্বর্ণালংকারে খাদ মিশ্রিত থাকবেই। অতএব খাদের পরিমাণ বাদ দেয়ার পর স্বর্ণের পরিমাণ সাড়ে সাত তোলা বা তার অধিক হলে নির্ধারিত হারে যাকাত দিতে হবে। এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের অভিমত। অন্য তিন মাযহাব মতে, ব্যবহৃত অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে কোন ব্যক্তির যাকাতের হিসাব করা কালে তার মোট যাকাতযোগ্য সম্পত্তি থেকে তার ঋণ, সরকারের পাওনা বকেয়া কর ইত্যাদি বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে। ৮/৯ ভরি স্বর্ণের মালিক কোন মহিলার হাতে যাকাত দেয়ার মত নগদ টাকা না থাকাটা আশ্চর্যের বিষয়। যদি তাই হয় তাহলে তাঁকে অলংকারের কিছু অংশ বিক্রয় করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

৯২. প্রশ্ন ঃ যাকাতের টাকা পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য গরীব আত্মীয়দেরকে দেয়া যায় কিনা?

উত্তর ঃ যাকাত দাতা তার যাকাতের অর্থ সরাসরি উর্ধ্বতন ব্যক্তিদেরকে যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, দাদা-দাদীর পিতা-মামা, নানা-নানীর পিতা-মাতা প্রভৃতি এবং সরাসরি অধস্তন যেমন ছেলে-মেয়ে, ছেলের ছেলে-মেয়ে, মেয়ের ছেলে-মেয়ে তাদের ছেলে-মেয়ের প্রভৃতি ব্যক্তিদেরকে যাকাত দিতে পারবে না। এদেরকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। এসব লোক গরীব হলে এদেরকে যাকাত না দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-খয়রাত করা উচিত। এসব ছাড়া অন্য যে কোন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া যায়। দূর আত্মীয়, নিকট আত্মীয়, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় যাই হোক না কেন। বরং রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয়রাই যাকাতের টাকা পাওয়ার বেশি হকদার। আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও যে কোন গরীব লোককে যাকাতের টাকা বা মাল দেয়া যায়।

৯৩. প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ কিনতে গেলে যেই মূল্য দিতে হয়, বিক্রয় করতে গেলে সেই মূল্য পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় যাকাত প্রদানকালে স্বর্ণের ক্রয় মূল্য না বিক্রয় মূল্য সামনে রেখে যাকাতের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যাকাতযোগ্য কোন দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ও যাকাতের হিসাব করা কালে তার বাজার মূল্য এই দুইটির মধ্যে যে মূল্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি সেই মূল্যে যাকাতযোগ্য মালের মূল্য নিরূপণ করতে হবে। যাতে যাকাতের প্রাপকগণ একটু বেশি উপকৃত হতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে বাজার মূল্য অনুযায়ী হিসাব কষতে হবে এবং তদনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। বিশেষজ্ঞগণের নিকট এই শেষোক্ত মতই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অতএব আপনার স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য নিরূপণ করে তদনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে।

৯৪. প্রশ্ন ঃ সাহেবে নিসাব মহিলা তার ব্যবহারের জন্য তৈরী গহনাদি, যা নিসাব পরিমাণে পৌছে না, ঐ গহনার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর ঃ কেবল সোনা-রূপার গহনা হলেই তার যাকাত দিতে হয়। কিন্তু আপনার প্রশ্নে কিসের গহনা তার কোন উল্লেখ নেই। সাহেবে নিসাব মহিলাকে তার অন্যান্য যাকাতযোগ্য মালের সাথে তার সোনা-রূপার গহনার মূল্য যুক্ত করে এক সাথে যাকাত প্রদান করতে হবে। অলংকারগুলো যদি সোনা-রূপা ব্যতীত অন্য কোন ধাতু বা পাথর দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে তবে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

১৫. প্রশ্ন ঃ (ক) একজন ঠিকা ঝি-কে কাজের পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয়ার পর তাকে যাকাতের টাকায় একটি কাপড় কিনে দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

(খ) আজকাল টেলিভিশনে যেসব নাটক দেখানো হয় সেগুলো দেখা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ (ক) তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে যে, উক্ত কাপড় তাকে যাকাত হিসেবে দেয়া হয়েছে এবং এটা তার বেতনের অংশ নয়। তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

(খ) শুধু টেলিভিশনই নয়, যে প্রচার মাধ্যমেই ইসলামী নৈতিকতার পরিপন্থী বিষয় প্রচারিত হয়, তা নাটক, গল্প, কবিতা, ছবি, বিজ্ঞাপন যাই হোক সেই প্রচার মাধ্যম বর্জন করতে হবে। নাটকে একটি মহিলাকে একটি পুরুষ কর্তৃক জড়িয়ে ধরা এবং রাস্তাঘাটে অনুরূপভাবে জড়িয়ে ধরার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মহান আল্লাহ অশ্লীলতার প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আন-নুর : ১৯)

১৬. প্রশ্ন ঃ আমরা গরীব-ইয়াতীমদের সাহায্য, অসহায়-বিধবা মহিলাদের সহযোগিতা, গরীব অবিবাহিত মহিলাদের বিয়ে দেয়া এবং অধিক সন্তান ও কন্যা সন্তানের জননীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি সেবামূলক সংস্থা গঠন করেছি। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে যাকাত, ফিতরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা নিতে পারবো কি না?

উত্তর ঃ আপনারা যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। মূলত এটাই ইসলামের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম ওহীপ্রাপ্ত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এসে বলেন, "আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। তখন খাদীজা (রা.) অভয় দিয়ে বলেন, কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করবেন না। আপনি অসহায়-বঞ্চিতদের উপার্জনক্ষম করেন...... ।"

(সহীহ আল-বুখারী, বাব বাদইল ওয়াহয়ী)

বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ'র কন্যা যুদ্ধবন্দিনী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নীত হলে তিনি মুক্তির আবেদন করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা গরীব-অসহায় মানুষদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন..... ।" তিনি তার পিতার আরও কিছু সমাজকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এগুলো তো মুমিন ব্যক্তির কাজ (ইসলাম

বিশ্বকোষ, ২৪শ' খণ্ড)। অতএব আপনারা যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়াসহ বিভিন্ন রকম দান গ্রহণ করে গরীব-দুঃখীদের পুনর্বাসনের কাজ করতে পারেন এবং আপনাদের কাজকে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিন। তবে আপনাদের সংস্থার অর্থের সুষ্ঠু হিসাব ও নিরাপদ সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৭. প্রশ্ন ঃ পরিধেয় অলংকারাদির যাকাত নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কুরআনে আল্লাহ্ পাক কোন কোন বস্তুর কতটুকু পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর কোন এক সংখ্যায় দেখলাম সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার সমতুল্য গয়না (যার বর্তমান মূল্য সাড়ে ১০ হাজার টাকা) বা সোনা-রূপা জমানো টাকা মিলিয়েই হোক না কেন তার যাকাত আদায় করতে হবে। মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব লিখিত হাদীস শরীফের যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এক মহিলার হাতের কাঁকনের যাকাত আদায় করা হয়েছে কিনা রাসূল (সা.)-এর এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি পরিধেয় গয়নার যাকাত আদায় করতে বলেছেন। সে মোতাবেক আমার পরিধেয় গয়নার (নিসাব পরিমাণ নয়) যাকাত আদায় করে আসছি। কিন্তু মাওলানা মওদুদীর (র.)-এর রাসায়েল-মাসায়েলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কুরআন পাকের উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ পাক সোনা, রূপা, অর্থ, উট, গরু, ছাগল, ফসল প্রত্যেকটার আলাদা নিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং প্রত্যেকটার ব্যাপারেই নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত আদায় করতে হবে না। এ ব্যাপারে চরম দুশ্চিন্তায় আছি। সঠিক নির্দেশনা দান করুন।

উত্তর ঃ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সোনা ও রূপা পৃথক পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে নিসাব পূরণ করার জন্য উভয়টাকে একত্রে মিলাতে হবে কিনা এ মাসআলাটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (র.) এক বর্ণনা মতে সোনা ও রূপা উভয়টাকে একত্রে মিলালে সম্মিলিত মূল্য যদি সোনা ও রূপার যে কোন একটার নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের (র.) অপর বর্ণনা মতে সোনা ও রূপা উভয়টা পৃথক পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে তার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয় এবং নিসাব পূরণ করার জন্য উভয়টাকে একত্রে এনে মিলাতে হবে না।

(আল-ইফসাহ : ১/২০৭)

উপরোক্ত দুটি মতের যে কোন মত অনুযায়ী আমল করা যায়। তবে প্রথম মত অনুযায়ী আমল করার মধ্যে সতর্কতা রয়েছে।

৯৮. প্রশ্ন ঃ (ক) সঞ্চয় পত্রের যাকাত দিতে হবে কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

(খ) সরকারী কর্মচারীদের জিপিএফ এর সুদ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর ঃ সঞ্চয়পত্রের টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং সেই নিসাবের উপর যদি এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

সঞ্চয়পত্রের টাকা নিসাব পরিমাণ না হলেও যদি নিজের কাছে জমা টাকা ও সঞ্চয়পত্রে মিলে নিসাব পরিমাণ হয় এবং সেই নিসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সঞ্চয়পত্রের সাথে সুদের সম্পর্ক থাকলে তা ক্রয় করা বৈধ হবে না।

৯৯. প্রশ্ন ঃ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, মাছের চাষ ইত্যাদির খামারের মালিককে এগুলোর উপর উশর বা যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ গরু-ছাগলের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট কোটা পর্যন্ত পৌছলে তার যাকাত দিতে হবে। যেমন গরুর সংখ্যা তিরিশ এবং ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হলে যাকাত দান বাধ্যতামূলক। হাঁস-মুরগী, মাছ ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয়ের যাকাত দিতে হবে।

১০০. প্রশ্ন ঃ আমরা একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করি ২৫ জন মিলে এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা সঞ্চয় করবো এবং সাধ্যমত সমাজ সেবামূলক কিছু কাজে অর্থ ব্যয় করবো। আমার প্রশ্ন হলো, এই সমিতির মূলধনের অংশ থেকে যাকাত দিতে হবে কিনা।

উত্তর ঃ সমিতির মাধ্যমে যে সঞ্চয় আপনারা করবেন তার উপর আপনাদের ব্যক্তি মালিকানা বহাল থাকা অবস্থায় প্রত্যেকের অংশ স্বতন্ত্রভাবে তার যাকাতযোগ্য মালের সাথে যুক্ত হবে, অতঃপর তা নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যাকাত আরোপিত হবে। ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে তা সমিতির মূলধনে পরিণত হলে এবং তা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার শর্ত থাকলে উক্ত মূলধনের উপর যাকাত আরোপিত হবে না।

১০১. প্রশ্ন ঃ কোন এক হাফিজিয়া মাদরাসার জন্য যাকাত তহবিল থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে সেইখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নেই। উক্ত টাকা অন্য কোন হাফিজিয়া মাদরাসায় জমা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে থাকে তবে সেখানেই এই টাকা পৌছাতে হবে। আর যদি প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে তবে নিকটস্থ অন্য কোন হাফিজিয়া মাদরাসায় জমা দেয়া যাবে। অন্যথায় যে উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে ফেরত দিতে হবে।

১০২. **প্রশ্ন** ঃ আমার এক লাখ টাকা মূল্যের গহনা আছে। প্রতি বছর ৩০শে রজব ধরে আমরা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী একত্রে যাকাত আদায় করে থাকি। বিগত ২ বছর যাবৎ আমার নামায ও পর্দাজনিত কারণে আয় নেই। শহরে একখানা জমি আছে। স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ আয়ে। তবে সঠিক হিসাব নেই কার কত টাকা। কিন্তু এ বছর বিগত ৩০শে রজব হিসাব ধরলে বাড়ির নির্মাণ কাজে দেড় লক্ষ টাকা দেনা রয়েছে। সমস্ত খরচ স্বামীই বহন করেছে। বাড়ির আধা-আধি অংশ উভয়ের। স্বামীর ক্ষেত্রে এ বছর যাকাত আদায় করতে হবে না, কিন্তু আমার (স্ত্রী) পক্ষে গহনার উপর শুধুমাত্র যাকাত আদায় করতে হবে কিনা এবং স্বামীর টাকায় এ যাকাত আদায় করা যাবে কিনা, না গহনা বিক্রি করে আদায় করতে হবে দয়া করে সমাধান দিলে চিন্তামুক্ত হবো।

উত্তর ঃ বাড়ি নির্মাণ বাবদ যে ঋণ হয়েছে তা পুরোটাই যেহেতু আপনার স্বামী বহন করছেন এবং যেহেতু আপনার কোন ঋণ নেই, সেহেতু আপনার গহনার যাকাত আদায় করা আপনার উপর ফরয। আপনার গহনার যাকাত আপনাকেই আদায় করতে হবে। যাকাত আদায় করার মত নগদ টাকা না থাকলে কিছু গহনা বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করতে হবে। অবশ্য আপনার স্বামী যদি আপনার পক্ষ থেকে আপনার নির্ধারিত যাকাত আদায় করে দেন তাহলে তাতে আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

১০৩. **প্রশ্ন** ঃ (ক) বাসা ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়ের যাকাত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তবে কি আয়ের উপর, না বিল্ডিং-এর মূল্যের উপর নির্ধারণ করে দিতে হবে?

(খ) দোকান এর যাকাত দিতে হয় কি? যদি দিতে হয় তবে মালামাল সহ অগ্রিম জামানত এর উপর, নাকি শুধু মালামালের মূল্যের উপর?

উত্তর ঃ (ক) বাসা ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় আপনার অন্যান্য আয়ের সাথে যুক্ত হবে। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে আপনার মোট আয়ের উপর যাকাত ধার্য হবে। আপনার বিল্ডিং-এর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে না।

(খ) দোকান বা দোকান লিজ নেয়ার জন্য যে অর্থ মালিককে দিতে হয় তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে জমা দেয়া অর্থ আপনার হাতে ফিরে

আসার পর তা আপনার অন্যান্য যাকাতযোগ্য আয়ের সাথে যুক্ত হবে। আপনার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রীর যাকাত দিতে হবে, আপনার উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকলে।

১০৪. প্রশ্ন ঃ এক মাদরাসায় কতক শিক্ষক তাদের মাসিক বেতন মাদরাসার পক্ষ থেকে যাকাত এবং কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে তা থেকে নিয়ে থাকেন। কিন্তু উদ্বৃত্ত থাকলে অগ্রিম বেতন হিসেবে রেখে দেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বলেন, এটা হিললা করে দেয়া হয়। আমার জিজ্ঞাসা, যাকাতের টাকা জমা দেয়া ছাড়াই কি হিললা করে এভাবে খরচ করা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ একে তো যাকাত এবং কুরবানীর চামড়া– যা সমাজের বঞ্চিত, নিরন্ন মানুষের প্রাপ্য, তা মাদরাসার নামে সংগ্রহ করে আবার অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে শিক্ষকদের বেতন দেয়া হয়, তা কিভাবে জায়েয হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। এ জাতীয় ভিক্ষাই তো আমাদের মন-মানসিকতা ও আচার-ব্যবহারকে ভিক্ষুক সুলভ করে দিয়েছে।

১০৫. প্রশ্ন ঃ যাকাত ও রোযার ফিতরা কি অমুসলিম দরিদ্রজনকে দেয়া যায়? একটি পুস্তকে পড়েছি যে, বাধ্যতামূলক (ফরয) দান-খয়রাত অমুসলিমদের দেয়া যায় না। এ কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ যাকাত ও রোযার ফিতরা কেবল মুসলমান দরিদ্রজনকে দান করতে হবে। অমুসলিম দরিদ্রজনকে সাধারণ দান-খয়রাত করে সাহায্য করতে হবে। বাধ্যতামূলক দান-খয়রাত অমুসলিমদের দেয়া যায় না। যাকাত প্রদান সম্পর্কিত আয়াতের (সূরা আত-তাওবা ৬০ নং) আলোকে ফকীহগণ ও তাফসীরকারগণ এই মত গঠন করেছেন।

১০৬. প্রশ্ন ঃ ফোরকানিয়া মাদরাসা/মক্তবে সরকারীভাবে কোন অনুদান পাওয়া যায় না বরং জনসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত হয়। দেখা যায়, শিক্ষক বেতন বাকী পড়ায় মাদরাসায় পবিত্র কুরআন শিক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় উক্ত মাদরাসায় কুরবানীর জন্তুর চামড়া বিক্রয় টাকা ও ফিতরার টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ যাকাত, সাদকা ও কুরবানী চামড়া গরীব-মিসকীনের হক। শিক্ষকগণ যদি গরীব, মিসকীন হন অর্থাৎ যাকাত, সাদকা খাওয়ার উপযোগী হন, তাহলে তারা গরীব হিসেবেই তা গ্রহণ করতে পারবেন। বেতন হিসেবে তা গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না। শিক্ষক বা ছাত্রদের মধ্যে কেউ এ পর্যায়ের থাকলে কুরবানীর চামড়া তাদেরকে দেয়া যেতে পারে। মাদরাসা-মক্তব

চালানো ও শিক্ষক বেতনের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ইনকাম সোর্স তৈরী করতে হবে অথবা সাধারণ আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

এজন্য মেধা, সময় ও শ্রম ব্যয় এবং আল্লাহর দরবারে অভাব দূর করার জন্য দুআ করতে থাকলে আল্লাহ মাদরাসার অভাব দূর করে দেবেন।

১০৭. প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা দিয়ে বছরের প্রথমে অর্থাৎ ১-১-২০০০ একটি একাউন্ট খুললো। এই একাউন্টে প্রতি মাসে টাকা জমা ও উঠানো হয় এই হিসাবে ৩১-১২-২০০০ তার একাউন্টে ধরুন ২৫,০০০ টাকা থাকলো, তাহলে যাকাত কোন টাকার উপর দিতে হবে? যদি ২০,০০০ টাকা ২৮-১২-২০০০ জমা দেওয়া হয়।

উত্তর ঃ কেউ যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং সেই মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। হানাফী মতে বছরের শুরু এবং শেষে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে, বছরের মাঝে নিসাব হ্রাস পেলে সেটা ধরা হবে না, বরং যাকাত আদায় করতে হবে। বছর ধরতে হবে চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী। এই হিসাব শুরু এবং শেষে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মতে নিসাব পরিমাণ মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। বছরের মাঝে নিসাব হ্রাস পেলে পুনরায় যদি নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে পুনরায় নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর থেকে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ : ১/২৮২; আল-ইফসাহ ১/২১১)

১০৮. প্রশ্ন ঃ আমার নিকট ৭ ভরি ৪ আনা সোনা আছে। মেয়ের বয়স দশ বছর। মেয়েকে আত্মীয়-স্বজন দিয়ে মেয়ের হয়েছে ১ ভরি ৪ আনা। আমার স্বামী সরকারী চাকুরী করেন। বেতন যা পাই তা দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সংসার চালানো কষ্ট হয়। আপনার কাছে প্রশ্ন আমার ও মেয়ের সোনার যাকাত কি দিতে হবে?

উত্তর ঃ স্বর্ণের নিসাব হলো, সাড়ে সাত তোলা বা সাড়ে সাত ভরি। আপনার সাত ভরি চার আনা স্বর্ণে নিসাব পূর্ণ হয় না। আপনার মেয়ের এক ভরি চার আনা স্বর্ণের মালিক যদি সেই হয়, তাহলে তার স্বর্ণ আপনার স্বর্ণের সাথে মিলানোর প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় আপনার উক্ত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য মেয়ের এক ভরি চার আনা স্বর্ণের মালিক যদি সে না হয় বরং আপনি তাকে তা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তার প্রকৃত মালিক আপনি নিজেই, তাহলে আপনাকে স্বর্ণের যাকাত আদায় করতে হবে।

১০৯. প্রশ্ন ঃ (ক) ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি একাউন্টের সঞ্চয়ের উপর যাকাত কিভাবে আদায় করতে হয়?

(খ) মাসিক ১,০০০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে পাঁচ বছর মেয়াদী মুদারাবা সঞ্চয়ী একাউন্ট শুরুর প্রথম মাসে স্থিতি ১,০০০ টাকা, ২য় মাসে ২,০০০ টাকা ইত্যাদি। বছর শেষে বাৎসরিক লাভ/লোকসান সহ স্থিতি নির্ধারণ হয়। প্রত্যেক মাসের লাভ/লোকসান আলাদাভাবে জানা যায় না। এরূপ সঞ্চয়ের উপর কিভাবে যাকাত দিতে হবে?

(গ) প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি করা যাবে কি না?

উত্তর ঃ (ক) ব্যাংকে জমাকৃত টাকা যখন নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সম-পরিমাণ হবে তখন থেকে উক্ত নিসাব পরিমাণ টাকার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে লাভসহ জমাকৃত মোট টাকার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের শুরু এবং শেষে নিসাব ঠিক থাকলে যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে উঠা-নামা করলে তা ধর্তব্য নয়।

(খ) লাভ-লোকসানের হিসাব পাওয়া না গেলেও আপনার জমা টাকার হিসাব মতে যখন নিসাব পূর্ণ হবে তখন থেকে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর লাভসহ মোট টাকার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করবেন।

(গ) সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা জায়েয নয়।

১১০. প্রশ্ন ঃ আমরা জানি, যাকাতের নিসাব সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা। কেউ কেউ বলেন, সব সময় ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হয় না। তাহলে আমার প্রশ্ন কেউ যদি ৪/৫ ভরি সোনার গয়না সব সময় পরেন এবং তার কাছে গচ্ছিত আরও ৪/৫ ভরি থাকে সেক্ষেত্রে তাকে কি শুধু গচ্ছিত অলংকারের যাকাত দিলেই চলবে? নাকি ব্যবহৃত অলংকার সবটুকুরই যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ কারো মালিকানায় যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণালংকার অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যালংকার অথবা তার চাইতে বেশি থাকে তা ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, সর্বাবস্থায় তার যাকাত দিতে হবে।

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'জন মহিলা এসেছিল, উভয়ের হাতেই স্বর্ণের বালা পরা ছিল। তিনি

তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি এর যাকাত আদায় করেছ? তারা বলল, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আগুনের বালা পরিয়ে দেবেন? তারা জবাব দিল, না। তিনি বললেন, তাহলে এর যাকাত আদায় করো। (জামে আত-তিরমিযী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ অলংকারের যাকাত)
অনুরূপ হাদীস আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

১১১. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি ইসলামী ব্যাংকে এম.এস.এস. (D.P.S.) করেছি ১০ বছরের জন্য। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে জমা রাখি। এ পর্যন্ত আমার ২০,০০০ টাকা জমা হয়েছে। এ টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা? এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকে TDR ৫০,০০০ টাকা জমা রয়েছে। ব্যাংকে জমা থাকা অবস্থায় এ টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

(খ) ইসলামী ব্যাংকে সঞ্চয় রাখা টাকার যাকাত দিতে হবে কখন? ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের পরে, নাকি ব্যাংকে যত বছর টাকা থাকবে তত বছরই যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ (ক) কোন ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদের উপর যদি পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় এবং তার যদি এ পরিমাণ ঋণ না থাকে– যা পরিশোধ করার পর নিসাব পূর্ণ থাকে না– তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। নিসাব হলো, সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের অর্থ। সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার বর্তমান মূল্য (২০০৮ সাল) প্রায় ছাব্বিশ হাজার টাকা। কারো নিকট যদি ন্যূনতম ছাব্বিশ হাজার টাকা থাকে তাহলে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এ পরিমাণ টাকা তার বাড়িতে থাকুক বা ব্যাংকে থাকুক অথবা ঋণ দেয়া থাকুক কিংবা বাড়ি ও ব্যাংক মিলে একত্রে এ পরিমাণ টাকা থাকুক, ব্যাংকে ডিপিএস, টিডিআর কিংবা অন্য যে কোনভাবেই জমা থাকুক, সর্বাবস্থায় তার উপর যাকাত ফরয হবে।

(খ) ব্যাংকে জমা টাকা যতদিন নিসাব পরিমাণ থাকে, প্রতি বছরই যাকাত আদায় করতে হবে।

১১২. প্রশ্ন ঃ সরকারী কর্মচারী হিসেবে প্রতি মাসে তিনশত টাকা করে GPF এ বাধ্যতামূলক কেটে রাখে। বর্তমানে এই পরিমাণ টাকা জমা হয়েছে যাতে

যাকাত দেওয়া ফরয। তিনশত টাকা কাটার পর বাকী সব টাকা সাংসারিক কাজে খরচ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে যাকাত আদায় করার বিধান কি? উল্লেখ্য উক্ত ব্যক্তির অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।

উত্তর ঃ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমাকৃত টাকার যাকাত চাকুরীর শেষে উক্ত টাকা হাতে পাওয়ার পর বা আয়ত্তে আসার পর এক বছর অতিবাহিত হলে এবং তা নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। এ টাকা আয়ত্তে আসার পূর্বে তার যাকাত আদায় করা ফরয নয়।

১১৩. প্রশ্ন ঃ যাকাত আদায়ের জন্য দাতা ও গ্রহীতার মাঝে অথরিটি প্রয়োজন, কুরআন হাদীস থেকে জেনেছি সেই অথরিটি হল ইসলামী সরকার/রাষ্ট্র। আমার প্রশ্ন হলো যদি ইসলামী সরকার না থাকে তাহলে যাকাত আদায়ের জন্য বেসরকারী সংস্থা কায়েম করা কতটুকু জরুরী।

উত্তর ঃ ইসলামী সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই হবে মুসলিমদের সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যাকাতের প্রকৃতি হলো, যাকাত ইসলামী সরকারের বাইতুল মালে সংগৃহীত ও একত্র করা হবে এবং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে যাকাতের অর্থ থেকে দেশের অসহায়, দুঃস্থ ও দরিদ্র মুসলিমদের দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করা। মুসলমান অধ্যুষিত কোন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না থাকলে সে দেশের মুসলিমদের উপর ফরয সে দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রধান কাজ হবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সকল মুসলিমদের সংঘবদ্ধভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই যাকাত ভিত্তিক ইসলামী বাইতুল মাল বা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে অনায়াসেই ইসলামী বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাদ দিয়ে কিংবা এ কাজকে শিথিল করে যাকাত আদায় করার জন্য বেসরকারী সংস্থা কায়েম করা সঠিক নয়। কারণ যে সব মুসলিম আল্লাহর আইন ও তাঁর সৎ বান্দাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে না বরং মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পঙ্গপালের মত সেদিকে ছোটে, যাকাত ও শত ওয়েলফেয়ার সংগঠন দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করা কখনোই সম্ভব নয়। মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা আল্লাহর গযবেরই ফল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন : তবে তোমরা কি কিতাবের (আল-কুরআনের) কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ

অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই এবং কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। (সূরা আল-বাকারা : ৮৫)

অবশ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অংশ হিসেবে যাকাত কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে। বর্তমান অনৈসলামী এনজিওদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার মুকাবিলায় এবং অসহায়-দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের ঈমান-আকীদা রক্ষার জন্য যাকাত বড় ধরনের অর্থনৈতিক সহায়ক। এ প্রেক্ষাপটে যাকাতের কর্মসূচী হাতে নেয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

১১৪. **প্রশ্ন ঃ** ইসলামী ব্যাংকে ৩ বছর মেয়াদী ৬০ হাজার টাকার একটি "ফিক্সড ডিপোজিট" আমার নামে আছে। মেয়াদের ১ বছর গত হয়ে গেছে। আমাকে ঐ টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ এ পরিমাণ টাকা কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। ফিক্সড ডিপোজিট করলে সে কারণে এ টাকা থেকে যাকাত বাদ বা মাফ হয়ে যায় না। কাজেই এ টাকার উপর এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর আপনাকে অবশ্যই এ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ এ টাকা আপনার পূর্ণ এখতিয়ারাধীন। আপনি বেশি লাভের আশায় স্বেচ্ছায় সাময়িকভাবে এ টাকায় হাত না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লগ্নি করেছেন। সুতরাং এ টাকার যাকাত দিতে হবে।

১১৫. **প্রশ্ন ঃ** (ক) এক ব্যক্তি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চাকুরী করে। সমিতির নিয়ম অনুসারে সে ২ লাখ টাকার হাউস লোন গ্রহণ করে এক লাখ টাকা ইসলামী ব্যাংকে Fixed Deposit করেছে এবং বাকী টাকা সেভিংস একাউন্টে রেখে এর লভ্যাংশ দ্বারা দশ বছর মেয়াদি MSS ডিপোজিট চালায়। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর এই টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা? দিতে হলে কিভাবে?

(খ) আমরা জানি সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কোন ব্যক্তির নিকট এক বছর জমা থাকলে তার যাকাত দিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে উক্ত পরিমাণ সোনা ও রূপার বাজার মূল্যের কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রশ্ন হল, কত টাকা জমা থাকলে যাকাত ফরয হবে?

(গ) কোন ব্যক্তি চুক্তি ভিত্তিক ১৫ হাজার টাকা জামানত দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করে। তাকে এই টাকার যাকাত দিতে হবে কি না?

(ঘ) কোন ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংকে দশ বছর মেয়াদী MSS Deposit করে দ্বিতীয় বছরের শেষে তার ১২,০০০ টাকা জমা হয়। এই টাকার যাকাত দিতে হবে কি না? উল্লেখ্য আমরা জানি এক বছর গচ্ছিত থাকলে তার যাকাত দিতে হয় কিন্তু উক্ত পরিমাণ টাকা তার নিকট এক বছর গচ্ছিত ছিল না।

উত্তর ঃ (ক) প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এটা অন্যায় এবং গুনাহর কাজ। তবে তার নিকট ঋণের এ টাকা ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ-সম্পদ যদি না থাকে তাহলে এ ঋণ গ্রহণের এক বছর পর তার ফিক্সট ডিপোজিট ও তার লভ্যাংশ, সেভিংস একাউন্টে রাখা টাকা ও তার লভ্যাংশ এবং এম, এস, এস ডিপোজিট ও তার লভ্যাংশ মিলে যদি তার গৃহীত ঋণের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ থাকে তাহলে তাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

(খ) সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ কারো নিকট এক বছর থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

(গ) ফেরত পাওয়ার পর সে ঐ টাকার যাকাত আদায় করবে।

(ঘ) সে যদি পূর্ব থেকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে থাকে অথবা এ টাকা ছাড়া তার কাছে যদি আরো টাকা থাকে, সব মিলিয়ে সে যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, অতঃপর তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় ১২ হাজার টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এ টাকা প্রাপ্তির পর এ টাকা তার নিকট এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তখন যে পরিমাণ টাকা তার নিকট থাকবে সে তার যাকাত আদায় করবে।

১১৬. প্রশ্ন ঃ ব্যক্তির যাকাত আদায় করতে হলে তার যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট দেয়ার কথা। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নেই তাহলে বেসরকারী কোন সংস্থার নিকট যাকাতের সম্পদ অর্পণ করলে যাকাত আদায় হবে কি না? ব্যক্তি কোন পর্যায়ে নিজের যাকাত নিজে বন্টন করতে পারে? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ যাকাত আল্লাহ্ তায়ালার ফরয ইবাদাত এবং ইসলামের পাঁচ রুকন বা ভিত্তির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। সুতরাং যাকাত যেমন আল্লাহর বিধান অনুরূপভাবে এর পরিমাণ ও আদায়ের নিয়মসহ সবকিছুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যাকাতের মূল প্রকৃতি ও ভাবধারা হলো

ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মালে সংগৃহীত হওয়া। ইসলামী সরকারকে আল্লাহ তায়ালা এ মর্যাদা দান করেছেন যে, ইসলামী সরকারের নিকট অথবা ইসলামী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত আদায়কারীর নিকট যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান করলে তৎক্ষণাতই যাকাত দাতার যাকাত আদায় হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন : তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যেন এর মাধ্যমে সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারেন। (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনার পাঠানো লোকের নিকট যাকাত অর্পণ করলে কি আমাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে কায়েম নেই সেখানে বেসরকারী কোন ইসলামী সংস্থা যার যাকাত আদায় ও যাকাতের খাতসমূহে যথাযথভাবে যাকাত বন্টনের কর্মসূচী রয়েছে– তার নিকট বা তার কোন প্রতিনিধি বা সে সংস্থার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারীর নিকট যাকাতের অর্থ-সম্পদ অর্পণ করলে তৎক্ষণাৎ যাকাত দাতার যাকাত আদায় হবে কিনা? এ প্রশ্নের তিনটি দিক রয়েছে। এক. এরূপ কোন ইসলামী সংস্থা ইসলামী সরকারের মর্যাদা রাখে কিনা? এরূপ কোন সংস্থা ইসলামী সরকারের মর্যাদা রাখে এবং তার বা তার কোন প্রতিনিধির নিকট যাকাত প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ যাকাত আদায় হয়ে যাবে– এর স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন বর্ণনা এমনকি নির্ভরযোগ্য কোন মুজতাহিদের কোন রায় আমাদের নজরে পড়েনি।

দ্বিতীয় দিক হলো, এরূপ সংস্থা যাকাতের আট খাত অথবা কোন এক বা একাধিক খাতের প্রতিনিধি হবে, যাকাতের হকদারগণ যদি তাদেরকে প্রতিনিধি করে থাকেন তাহলে যাকাতের হকদারদের প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত সংস্থা বা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যাকাত প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ যাকাত দাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিক, যাকাত দাতাগণ উক্ত সংস্থার কার্যক্রম বা সংস্থার ব্যক্তিবর্গের উপর আস্থাশীল হয়ে সংস্থাকে তাদের যাকাত বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে নিজেদের যাকাতের অর্থ-সম্পদ সংস্থার নিকট অর্পণ করে। এমতাবস্থায় উক্ত সংস্থা যখন যাকাতের প্রকৃত হকদারগণকে যাকাত প্রদান করবে তখনই যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কোন সংস্থা যদি যাকাতদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যাকাত উসূল করে তাহলে সংস্থা বা

সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যাকাত প্রদান করলে যদিও যাকাত দাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে তবুও যাকাতের প্রকৃত হকদারদেরকে যাকাত প্রদান করা সংস্থার দায়িত্ব থেকে যাবে।

১১৭. প্রশ্ন ঃ (ক) আমি প্রতি হিজরী বছরের শেষে জিলহজ্জ মাসে যাকাত হিসাব করি এবং বছরের প্রথম থেকেই (মহররম থেকে) এবং রমযান মাসে বেশ কিছু পরিমাণ যাকাত অগ্রিম পরিশোধ করি। বছর শেষে জিলহজ্জ মাসে যাকাত হিসাব করে পূর্বে অগ্রিম দেওয়া যাকাত বিয়োগ করে বাকি অংশ পরে পরিশোধ করি। এভাবে কী আমার যাকাত আদায় হবে?

(খ) আমার থেকে কেউ ঋণ বা কর্জ নিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে যথাসময়ে সেই ঋণ আমাকে পরিশোধ করতে পারলো না। আমার যাকাতের অংশ থেকে তার এই ঋণের অংশ কেটে নিয়ে তাকে এভাবে ঋণমুক্ত করতে পারি কি?

(গ) ব্যাংকে জমা টাকার উপর যাকাত দিতে হয় জানি। ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম বা প্রতি বছর অথবা বছরে দুইবার জমা দিতে হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর (১৪ বা ২১ বছর পর) জমাকৃত প্রিমিয়াম ইন্স্যুরেন্সের অঙ্কে ফেরত দেওয়া হয়। প্রতি বছর জমাকৃত ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের উপর যাকাত দিতে হবে কি না, না কি নির্দিষ্ট সময়ের পর ইন্স্যুরেন্সের পুরো টাকা পাওয়ার পর যাকাত দিতে হবে? উল্লেখ্য যে, ব্যাংকে জমা টাকা যেমন আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যে কোন সময় তোলা যায়, ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম যা জমা দেয়া হয় তা আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং ব্যাংকের জমা টাকার মতো যে কোন সময় তোলা যায় না, কেবল নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাওয়া যায়।

(ঘ) আমার কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ার আছে এবং শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ারের অংশ টাকায় উল্লেখ আছে যা কোম্পানীর জমি, ভবন, ফ্যাক্টরী, মেশিনপত্র ইত্যাদির মূল্য হিসাবে বিবেচিত। এসবের উপর যাকাত দিতে হয় না, উৎপাদিত পণ্যের উপরই যাকাত দিতে হয়। এখন আমার এই শেয়ারগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের অংশ কিভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করবো? শেয়ার সার্টিফিকেটের ব্যাপারে যাকাতের বিধান কি?

উত্তর ঃ (ক) অগ্রিম যাকাত আদায় করা জায়েয। তবে আদায় করার সময় যাকাত আদায়ের নিয়াত করতে হবে।

(খ) এভাবে যাকাত আদায় হবে না।

(গ) বীমা কোম্পানীতে প্রিমিয়াম হিসেবে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে এবং প্রতি বছরই আদায় করতে হবে। যদি সে টাকা নিসাব পরিমাণ হয় অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ থাকে যার সাথে উক্ত প্রিমিয়ামের টাকা একত্রে মিলে নিসাব পরিমাণ হয়, আর সে নিসাবের উপর যদি পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়। বীমা কোম্পানীতে জমাকৃত টাকার উপর বীমাকারীর নিয়ন্ত্রণ থাকে না একথা ঠিক নয়। কারণ বীমাকারী নিজেই ইচ্ছা করে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা করে। বীমা এক প্রকার বিনিয়োগও বটে। তাছাড়া বীমা কোম্পানী বীমাকারীর টাকা তার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কাজেই এ টাকার উপর যাকাত ফরয না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।

(ঘ) শেয়ারের যাকাত আদায় করার বিধান হচ্ছে, শেয়ারের বাজার মূল্য ও কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত বার্ষিক লভ্যাংশ একত্রে মিলে যত টাকা হয় তার উপর যাকাত ফরয হবে। যদি তা শেয়ার হোল্ডারের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় ও নিসাব পরিমাণ হয় এবং সে নিসাব পরিমাণ টাকার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়। বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ারই পণ্যের রূপ লাভ করেছে। সুতরাং এটাকে পণ্য ধরে পুরো শেয়ারেরই যাকাত আদায় করতে হবে।

১১৮. প্রশ্ন ঃ আমাদের অফিসে কর্মচারীদের একটি সঞ্চয় ফাণ্ড আছে। ফাণ্ডের সদস্যরা প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকা ফাণ্ডে জমা রাখেন। এই টাকা চাকুরী চলে গেলে বা শেষ হলে সবাই তুলে নিতে পারবেন। তবে চাকুরী থাকাকালীনও একটা নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের টাকা কেটে রেখে সম্পূর্ণ টাকা তুলে নিতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন, এই জমাকৃত টাকার উপর যাকাত দিতে হবে কিনা? আর যাকাত দিলে কি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে, নাকি সমিতির পক্ষ থেকে পুরো টাকার যাকাত আদায় করতে হবে? বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর ঃ ফাণ্ডের সদস্যদের মধ্যে যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে কেবল তারাই যাকাত আদায় করবেন। তারা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করতে পারেন, সম্মিলিতভাবেও করতে পারেন।

১১৯. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রহমতে আমি প্রত্যেক বছর যাকাত দিয়ে আসছি। আমার এক ভাই কিছুটা গরীব। তার চিকিৎসার জন্য আমার যাকাতের থেকে কিছু টাকা দিতে পারি কি?

উত্তর ঃ তিনি যদি গরীব হন এবং যাকাত গ্রহণ করার হকদার হন তাহলে তার চিকিৎসার জন্য যাকাতের টাকা দেয়া জায়েয হবে।

১২০. প্রশ্ন ঃ সেপ্টেম্বর ২০০5 ইং মাসিক পৃথিবীর যাকাত প্রসঙ্গ আলোচনায় ১৭নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, "প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উঠানোর পর যাকাত দিতে হবে।" আমার প্রশ্ন– ইসলামী ব্যাংকে যেসব ডিপিএস করা হয় তার যাকাত দেওয়ার বিধান কি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মতোই, না অন্যভাবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ ডিপিএস নিসাব পরিমাণ হলে কিংবা ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্যান্য অর্থ-সম্পদের সাথে মিলে নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে ডিপিএসকারীর উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাত ফরয হওয়ার সময় থেকে প্রতি বছরই তার যাকাত আদায় করতে হবে, ডিপিএস ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এক না। কাজেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সাথে ডিপিএস এর তুলনা সঠিক নয়।

১২১. প্রশ্ন ঃ আমাদের এক বোনের বিয়ের পর থেকেই ওর যৌতুকলোভী স্বামীর সাথে কোনভাবেই বনিবনা না হওয়ায় অবশেষে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে ছাড়াছাড়ি (তালাক) হয়। পিতা তার দু'টি শিশু পুত্র-কন্যাকে ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃতি/অপারগতা প্রকাশ করায় তখন থেকেই ওই দুটি ছেলে-মেয়েসহ আমাদের বোনকে আমাদের আশ্রয়ে রাখি। সন্তানদের কথা ভেবে সেও আর দ্বিতীয় বিয়েতে রাজী হয়নি। বর্তমানে ওই দুটি ছেলে-মেয়ে হাইস্কুলে পড়ছে। এদিকে আমাদের ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ যাকাত দাতা।

প্রশ্ন হচ্ছে– আমরা কি আমাদের যাকাতের কিছু অংশ প্রতি বছর এককালীন কিংবা সারা বছরে কিছু কিছু আমাদের বোন এবং ওর সন্তানদের বাড়তি চাহিদা/খরচ নির্বাহের জন্য আমাদের বোনের হাতে দিতে পারি?

উত্তর ঃ বোন ও তার ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেয়া ভায়ের জন্য জায়েয। তবে এক সাথে দেয়াই ভালো। বোন তার নিজের ও তার ছেলে-মেয়ের প্রয়োজনে সারা বছর সেখান থেকে ব্যয় করবেন।

১২২. প্রশ্ন ঃ আমরা কতিপয় স্বল্প আয়ের লোক একটি সমিতি করেছি– যার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক ও সমাজকল্যাণ। প্রত্যেকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করি। এককালীনও কিছু টাকা জমা করতে হয়েছে। সমিতির মূলধন কয়েক লক্ষ টাকা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। সমিতির সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন ব্যবসায়িক

সেক্টরে বিনিয়োগ করেছি। যেমন: গাড়ী, দোকান ইত্যাদি। আমরা একটি যাকাত ফাণ্ড করতে চাই। এ ব্যাপারে নিম্নের প্রশ্নগুলোর জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিনির্ভর সমাধান পেলে কৃতার্থ হবো।

(ক) সমিতিতে যাকাত ফাণ্ড করা প্রয়োজন আছে কি না এবং তা শরীয়তসম্মত কি না?

(খ) সমিতির মোট মূলধনের ভিত্তিতে যাকাতের নিসাব হিসাব করতে হবে, নাকি ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত টাকার ভিত্তিতে হিসাব হবে? ব্যক্তিগতভাবে যদি কোন সদস্য 'সাহেবে নিসাব' না হয়ে থাকেন তাহলে সমিতির মোট মূলধনের ভিত্তিতে যাকাত ফাণ্ডে টাকা নেয়া হলে ঐ ব্যক্তির উপর (যিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহেবে নিসাব নন) যুলম করা হবে কিনা?

(গ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি, গাড়ি অথবা কোন মেশিনারীতে অর্থ বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থের যাকাত দিতে হবে, নাকি এসব থেকে অর্জিত আয় বা লাভের যাকাত দিতে হবে?

(ঘ) যাকাত আদায় না করার পরিণতি কি কি? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর ঃ (ক) যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে যাকাত ফাণ্ড গঠন করা জায়েয হবে।

(খ) সমিতির সদস্যগণ সমিতির উপর তাদের যাকাত আদায়ের ভার অর্পণ করলে মোট মূলধনের যাকাত আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে সমিতির কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে সাহেবে নিসাব না হলে সমিতিকে তার জমাকৃত টাকার যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা তার উপর যাকাত ফরয হয়নি। অবশ্য তিনি অনুমতি দিলে তার টাকায়ও যাকাত আদায় করা যাবে। তবে সেটা সাধারণ সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

(গ) বাড়ি, গাড়ি ভাড়ায় খাটানো হলে তার ভাড়ার উপর যাকাত আদায় করতে হবে। মেশিনপত্র উৎপাদনের কাজে খাটালে তার উৎপাদিত পণ্য বা তার মূল্যের উপর যাকাত আদায় করতে হবে।

(ঘ) কুরআন ও হাদীসে যাকাত আদায় না করার কঠোর পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এখানে কেবল একটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা হলো :
"যারা স্বর্ণ, রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে (সে দিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এখন জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর।"

(সূরা আত-তাওবা : ৩৪–৩৫)

১২৩. প্রশ্ন ঃ আমার স্ত্রী এবং দুই কন্যার স্বর্ণের অলংকার যদি একত্রে সাড়ে সাত ভরির বেশি বা সেই পরিমাণ হয় তাহলে কি যাকাত ফরয হবে? যদি পৃথকভাবে কারো গহনার পরিমাণই নিসাব পরিমাণের সমান না হয় তাহলে কার উপর যাকাত ফরয হবে?

উত্তর ঃ কারো একক মালিকানায় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার থাকলে তিনি স্বর্ণের সাহেবে নিসাব হবেন। সাহেবে নিসাব হওয়ার এক বছরের মাথায় তার উপর যাকাত ফরয হবে। স্ত্রী ও দু কন্যার ব্যবহারের স্বর্ণের মালিক যদি পৃথক পৃথকভাবে তারাই হয়, একক কোন ব্যক্তি না হয়, তবে তারা কেউ-ই যেহেতু সাহেবে নিসাব নয় সেহেতু তাদের কারো উপর যাকাত ফরয হয়নি।

১২৪. প্রশ্ন ঃ আমার নিজের নামে ইসলামী ব্যাংকে হজ্জ একাউন্ট রয়েছে। প্রত্যেক মাসে ৪৮০ টাকা জমা করি। এভাবে ১৬ বছর জমা করতে হবে। উক্ত টাকার যাকাত দেয়ার বিধান কি?

আমি নিজে ইসলামী ব্যাংকে পাঁচ বছর মেয়াদী বন্ড ক্রয় করেছি। উক্ত টাকার যাকাত কিভাবে দিতে হবে?

আমি নিজের নামে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ প্রত্যেক মাসে এম. এস. এস ১,০০০ টাকা করে ১০ বছর জমা রাখব। উক্ত টাকার যাকাত কিভাবে দিতে হবে?

উত্তর ঃ আপনি যদি সাহেবে নিসাব হন, তাহলে হজ্জ একাউন্টে জমা টাকা, বন্ড ক্রয় এবং ইসলামী ব্যাংকের এম. এস. এস করা সব টাকারই যাকাত দিতে হবে। আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য কোন টাকা বা যাকাতযোগ্য কোন সম্পদ যদি না থাকে এবং এ তিনটি একাউন্টে জমাকৃত টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যে দিন নিসাব পরিমাণ হবে সে দিন থেকে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আপনার উপর যাকাত ফরয হবে। বছর শেষে যে টাকার লাভের হিসাব পাওয়া যায় তার লাভ ও আসল সমুদয় টাকার যাকাত দিতে হবে। অনেকে মনে করেন, হজ্জ একাউন্টে জমা টাকার যাকাত দিতে হয় না। কেউ মনে করেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ড ক্রয় করলে উক্ত সময় শেষ না হলে যাকাত দিতে হয় না, আবার কেউ মনে করেন এম. এস. এস এর মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ টাকার যাকাত দিতে হয় না। এসব ধারণা সঠিক নয়। নিসাব পূর্ণ হলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

উশর
সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

১২৫. প্রশ্ন ঃ উশর কী? কি পরিমাণ ধান পেলে উশর দিতে হবে এবং কাকে দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগকে উশর বলা হয়, যা ফসলের যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। ধান বা যে কোন ফসল সাড়ে সাতাশ মণ (প্রায়) হলে এবং ফসল বিনা সেচে (অর্থাৎ আসমানের অথবা ঢলের পানিতে) উৎপন্ন হলে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ ফসলের যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হলে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে। উশর ফসলের যাকাত বিধায় যাকাতের খাতসমূহে অর্থাৎ যারা যাকাত নেয়ার উপযোগী তাদেরকে দিতে হবে।

১২৬. প্রশ্ন ঃ খারাজী জমি ও উশরী জমি কাকে বলে? বাংলাদেশের জমিতে উশর দিতে হবে কি না? দিলে কী হারে?

উত্তর ঃ সঞ্চিত অর্থ, সোনা-রূপা এবং বাণিজ্য পণ্যে যেমন, বছরান্তে যাকাত ফরয হয়, তেমনি জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপরও উশর দেয়া ফরয। উশরকে ফসলের যাকাত বলা যেতে পারে। খারাজ হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের পক্ষ থেকে কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত অথবা মালিকানাসূত্রে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব। সাধারণতঃ মুসলিম কৃষকদের বেলায় উশর এবং অমুসলিমদের বেলায় খারাজ প্রবর্তন করার নিয়ম। কিন্তু ইসলামী প্রশাসন জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে এর ব্যতিক্রমও করতে পারে। উশরের হার শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত। অর্থাৎ মধ্যম আকৃতির একটি পরিবারের সংবছরের খোরাক পরিমাণ বাদে অতিরিক্ত যা উৎপন্ন হয় তার দশ ভাগের একভাগ উশর বাবদ অবশ্য পরিশোধ্য। সম্প্রতি পাকিস্তানে উশর ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে পরিবার পিছু চব্বিশ মণের উপরে যা উৎপন্ন হয় তার উপর দশ ভাগের এক ভাগ উশর ধার্য করা হয়েছে। যেসব জমিতে সেচের পানি, সার এবং

কীটনাশক ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিচর্যা দিতে হয়, সেগুলোর উৎপাদনে উশর হবে বিশ ভাগের একভাগ। বাংলাদেশের কোন জমিতে উশর ধার্য হবে এবং কোন জমিতে খারাজ, তা নির্ধারণ করার অধিকার হবে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে সরকারের পরামর্শকগণের। তবে যেহেতু ফসলের যাকাত একটি ফরয দায়িত্ব, সেমতে হুকুমত ইসলামী না হওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে প্রত্যেক মুসলিম নিজ নিজ দায়িত্বে মালের যাকাত প্রদান করে থাকেন, সেভাবেই জমিতে উৎপাদিত উশর পরিশোধ করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। অবশ্য চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার অধিকারী দেশের বিজ্ঞ মুফতীগণই।

১২৭. প্রশ্ন ঃ জিযিয়া, উশর ও খারাজ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ 'জিযিয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ বদলা, কর, মাশুল। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজে প্রত্যেক মুসলিমকে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। অমুসলিম নাগরিকগণ প্রতিরক্ষা কর প্রদান করে প্রতিরক্ষার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। এ কারণেই এটিকে 'জিযিয়া' কর বলা হয়

'উশর' হচ্ছে যমিনে উৎপাদিত ফসলের যাকাত। যেসব জমিতে সেচ-সার প্রভৃতি অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না, বৃষ্টির পানিতেই ফসল উৎপাদিত হয়, সে ফসলের শতকরা দশভাগ যাকাত বাবদ দেয়া এবং যেসব জমিতে সেচ, সার প্রভৃতি খরচ করতে হয়, সে উৎপাদনের শতকরা পাঁচ ভাগ যাকাতরূপে প্রদান করতে হয়। শরীয়াতের পরিভাষায় এটাকেই উশর বলা হয়। ইসলামী সরকার নির্ধারিত রাজস্বের বিনিময়ে যে জমি কৃষকের নিকট পত্তন দিয়ে থাকেন সে জমির রাজস্বকে খারাজ বলা হয়।

ইসলামী সরকার যেসব জমির উপর খারাজ নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর উৎপাদন থেকে উশর দিতে হয় না। আবার যেসব জমিতে উশর নির্ধারিত হয় সেগুলোতে খারাজ দিতে হয় না।

১২৮. প্রশ্ন ঃ (ক) আমার নিজস্ব এলাকায় প্রচুর পরিমাণ গোল আলু চাষ করা হয়, এর উপর উশর হবে কি? উশর হলে কিভাবে আদায় করতে হবে?

(খ) গোল আলু পচনশীল ফসল। মৌসুমে এর বাজার দর খুবই কম থাকে, যার ফলে চাষাবাদের খরচই পোষায় না। ন্যায্য মূল্য পাওয়ার আশায় কয়েক মাস কোল্ড স্টোরে গুদামজাত করা ছাড়া তা রাখা যায় না। এগুলি গুদামজাত (কয়েক মাস) করার বিষয়ে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর ঃ (ক) প্রাকৃতিক উপায়ে বিনা সেচ খরচে জমি চাষ করা হলে উৎপাদিত ফসলের (উশর) দশ ভাগের এক ভাগ এবং সেচের মাধ্যমে চাষ করা হলে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। হানাফী মতে অন্যান্য ফসলের ন্যায় আলুও বিনা সেচে উৎপাদিত হলে উৎপাদিত আলুর দশ ভাগের এক ভাগ এবং সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে তার বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। তাঁদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

তিনি আরো বলেন : "ফসল কাটার সময় তার হক আদায় কর।"

(সূরা আল-আনআম : ১৪১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জমি আসমানের পানি, নদী, নালা, খাল প্রভৃতির পানি দ্বারা সিক্ত হলে উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) এবং সেচ দ্বারা সিক্ত হলে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। (সহীহ আল-বুখারী)

উশর ফসলের যাকাত। তাই যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করা হয় উশরও সেসব খাতেই ব্যয় করতে হবে।

যাকাতের খাত বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন : "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য।" (সূরা আত-তাওবা : ৬০)

(খ) ফসল উঠার সময় বা ফসলের মৌসুমে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকে বিধায় তখন তার দাম কম থাকে। এরপর ক্রমান্বয়ে সরবরাহ কমতে থাকে ও চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে স্বাভাবিক গতিতে মূল্য বাড়তে থাকে। মৌসুমী ফসলের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক নিয়ম। গোল আলু এটা মৌসুমী ফসল। তাই গোল আলুর বেলায়ও এ নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়াও গোল আলু পচনশীল ফসল। পচন রোধ করার জন্য আলু হিমাগারে রাখতে হয়। হিমাগারে আলু ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হোক বা চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য রাখুক বাজারে আলুর সংকট সৃষ্টি না হলে, আলুর মূল্য স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না হলে এবং হিমাগার থেকে চাহিদা মোতাবেক বাজারে সরবরাহ করা হলে অল্প বা বেশি সময়ও আলু হিমাগারে রাখা

জায়েয হবে। বাজারে আলুর সংকট দেখা দিলে কিংবা অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে অবশ্যই বাজারের চাহিদা মুতাবিক আলু সরবরাহ করতে হবে। অন্যথায় তা নাজায়েয মওজুদদারীতে পরিগণিত হবে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আলু বা যে কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুদামজাত করা জায়েয নয়।

১২৯. **প্রশ্ন ঃ** "পৃথিবীর" জুলাই ১৯৯৫ সংখ্যাতে প্রশ্নোত্তর বিভাগে উশর এর নিসাব সংক্রান্ত একটা প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন যে, "ধান বা যে কোন ফসল সাড়ে সাতাশ মণ (প্রায়) হলে উৎপাদিত ফসলের উশর আদায় করতে হবে।"

অথচ আল-কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৬৭ নং ও সূরা আনআমের ১৪১ নং আয়াতের দলিল অনুযায়ী ফসল ফলাদির পরিমাণ যাই হোক না কেন উশর দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতও তাই। হাদীসে পাঁচ ওয়াসাক নিসাবের উল্লেখ আছে, এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বক্তব্য হলো তা ব্যবসায়ের পণ্যের যাকাতের নিসাব।

এখন আমরা কোনটা অনুসরণ করবো? একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নিসাবের ব্যাপারে আলেম সমাজের পক্ষ থেকে জাতির সামনে একটা ঐক্যমতে আসা দরকার।

মাযহাব ভিত্তিক নিসাবের পরিমাণ যদি আলাদা থাকে তবে 'উত্তরে' তা উল্লেখ থাকা দরকার।

উত্তর ঃ ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত (উশর) ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাব শর্ত কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার (র.) মতে নিসাব শর্ত নয়। তাঁর মতে ভূমির ফসল বিনা সেচে প্রাকৃতিক পানি দ্বারা উৎপাদিত হলে তার পরিমাণ যাই হোক না কেন তার উশর (এক দশমাংশ) আদায় করতে হবে। এ মতের পক্ষে সূরা আল-বাকারার ২৬৭ নং আয়াত "তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।" সূরা আল-আনআমের ১৪১ নং আয়াত– "ফসল কাটার সময় তার হক আদায় কর" এবং সহীহ আল-বুখারীর একটি হাদীস– "বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলে উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) এবং সেচের সাহায্যে উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত হিসেবে) আদায় করতে হবে।"

হানাফী মাযহাবের দু'জন বিশিষ্ট ইমাম– আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.) সহ জমহুর ইমামগণের মতে, ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত (উশর বা নিসফে উশর) ফরয হওয়ার জন্য ফসল নিসাব অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হওয়া জরুরী। নিসাব পরিমাণ না হলে তার উপর যাকাত ফরয হয় না। তাঁদের মতের পক্ষে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হাদীসটি হল, "পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলের উপর যাকাত ফরয হয় না।"

ফসলের উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এছাড়াও মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "কেবল বিত্তশালী লোকদের উপরই যাকাত ফরয হয়। উশর বা নিসফে উশর উৎপাদিত ফসলের যাকাত। যাকাতের সকল ক্ষেত্রেই নিসাব রয়েছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মাল থাকা শরীয়াতে বিত্তশালী হওয়ার মানদণ্ড ধরা হয়েছে। কাজেই ফসলের উপর যাকাত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিসাব থাকাই যথার্থ।

এ মতের পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলীল সমূহের জবাবে বলা হয়, সূরা আল-বাকারার ২৬৭ নং আয়াত এবং সূরা আনআমের ১৪১ নং আয়াতে সাধারণভাবে ফসলের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং পাঁচ ওয়াসাকের হাদীস দ্বারা নিসাব নির্ধারিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসটির জবাবে বলা হয়েছে, হাদীসটিতে সাধারণভাবে বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলে উশর এবং সেচের সাহায্যে উৎপাদিত ফসলে নিসফে উশর দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। আর পাঁচ ওয়াসাকের হাদীস দ্বারা নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও একটি হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, "বিচরণশীল উটের যাকাত আদায় করতে হবে।"

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "পাঁচটির কম উটে যাকাত হয় না।" এ হাদীস দ্বারা পূর্বের হাদীসের সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং উটের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব ধার্য করা হয়েছে। এরূপ আরো অনেক নজির রয়েছে। সুতরাং ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রেও পাঁচ ওয়াসাকের হাদীস দ্বারা নিসাব ধার্য করা হয়েছে।

ফসলের যাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ থেকেই মতপার্থক্য হয়ে এসেছে। এ যুগের আলেমগণের পক্ষে সে মতপার্থক্য

উঠিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। উভয় মত অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে। শেষোক্ত মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য বলে আমরা মনে করি। অর্থাৎ ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে যাকাত ফরয হয় না।

১৩০. প্রশ্ন ঃ যাকাত যদি ফরয হয় তাহলে উশর কি? শরীয়াতের দৃষ্টিতে উশর আদায় করা কি? উশর কারা পাবে? উশরের নিসাব কি? আমরা যাকাতের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করছি, কিন্তু উশরের কথা বলি না কেন? উশর রাষ্ট্রের কোন খাতে জমা হবে? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর ঃ উশর হল ফসলের যাকাত। সোনা, রূপা ও নগদ টাকার যাকাত যেমন ফরয তেমনি ফসলের যাকাত তথা উশরও ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুব্হানাহু তায়ালা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।"

(সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

উশর যেহেতু ফসলের যাকাত, সেহেতু যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করা হয় উশরও সেই সব খাতেই ব্যয় করতে হবে।

উশরের নিসাব: উশরের নিসাব হল সাড়ে সাতাশ মতান্তরে আঠাশ মণ। এক জাতীয় ফসল যেমন ধান অথবা গম ইত্যাদি এ পরিমাণ হলে তখন উশর ফরয হয়। বাংলাদেশের জমির ফসলে উশর ফরয কিনা? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি ছিল তাই যাকাতের ন্যায় উশর আদায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হত না। বর্তমানে সেই বিভ্রান্তি অনেকটা দূর হয়েছে এবং উশরের ব্যাপারে যাকাতের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১৩১. প্রশ্ন ঃ আমের উশর (যাকাত) আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ আম বা এ জাতীয় পচনশীল ফল এবং শাক-সব্জির উপর উশর আদায় করা ফরয কিনা এ ব্যাপারে প্রাচীন ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ভূমিতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসল শাক-সব্জি ও ফলের উশর (যাকাত) আদায় করা ফরয। এসব ফলন পচনশীল হোক বা না হোক এবং এর পরিমাণ যাই হোক, উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ– যদি বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হয় অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ যদি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, যাকাত হিসেবে আদায় করা ফরয।

হানাফী মাযহাবের অপর দু'জন ইমাম এবং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে পচনশীল ফসল, শাক-সব্জি ও পচনশীল ফলের যাকাত আদায় করতে হবে না। অনুরূপভাবে ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ সেরের ওজনে সাড়ে সাতাশ মতান্তরে আঠাশ মণের কম ফসলেরও যাকাত আদায় করতে হবে না। এ মতে যেসব ফসল রাখা যায় এবং ওজন বা (পাত্র দ্বারা) পরিমাপ করা হয় এবং তার পরিমাণ সাড়ে সাতাশ মতান্তরে আঠাশ মণ বা তার চাইতে বেশি হয় তার যাকাত আদায় করা ফরয।

উভয় মতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল রয়েছে। কাজেই যে কোন একটি মতের উপর আমল করা যেতে পারে।

১৩২. প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত (উশর) আদায় করা ফরয কি?

উত্তর ঃ বাংলাদেশের ভূমি উশরী। সুতরাং বাংলাদেশের মুসলিমদের ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে। বৃষ্টির পানি দ্বারা যে ফসল উৎপাদিত হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক দশমাংশ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। আর যে ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

১৩৩. প্রশ্ন ঃ (ক) যেই জমির কর বা খাজনা পরিশোধ করা হয়, সেই জমির ফসলের উপর যাকাত ফরয হয় কিনা? যদি আদায় করতে হয়, তাহলে আম, কাঁঠাল, লিচু, মিষ্টি কুমড়া, শসা ইত্যাদি ফসলের যাকাত কি নিয়মে আদায় করতে হবে? দলীলসহ জানালে উপকৃত হবো।

(খ) যেই জমির ফসল বৃষ্টির পানিতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেচ দেয়া লাগে না কিন্তু অধিক ফসলের জন্য সার এবং পোকা-মাকড় দমনের জন্য বিষ প্রয়োগ করতে হয়– এইরূপ জমির ফসলের যাকাত দেয়ার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ (ক) খাজনা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর। উশর মুসলিমদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফরয ইবাদাত। খাজনা আদায় করার কারণে উশর মাফ হওয়ার বা আদায় না করার প্রশ্ন অবান্তর। অধিকাংশ ইমাম এবং হানাফী মাযহাবের দু'জন ইমাম– ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে শাক-সব্জি ও পচনশীল ফলমূলের উপর উশর ফরয

নয়। এ মতে শাক-সব্জি ও ফলমূলের উশর দিতে হবে না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শাক-সব্জি ও ফলমূলেরও উশর আদায় করতে হবে।

(খ) যে জমির ফসল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয় সেচ দেয়া লাগে না তার যাকাত হবে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ প্রতি দশ মণে এক মণ। সার ও কীটনাশক দেয়ার জন্য এ পরিমাণের তারতম্য হবে না।

১৩৪. প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকার ইমাম সাহেব যমীনের ফসলের উশর দেয়ার জন্য লোকদের জোর তাকিদ দিচ্ছেন এবং এ উশর আদায়কে ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। প্রশ্ন হল আমাদের দেশে ফসলের উশর দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ উশরী যমীনে উৎপাদিত ফসল থেকে উশর (এক দশমাংশ) গরীব-মিসকীনদের দান করা ওয়াজিব। আমাদের দেশের জমি উশরী কিনা এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের যথেষ্ট আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনও সকল উলামায়ে কিরাম ও মুফতীগণের ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। অপর দিকে বাংলাদেশের জমিকে উশরী আখ্যা দিয়ে ঘোষণা দেয়া যায় না। তবে সতর্কতা বশত: উশর দিলে অবশ্যই উত্তম হবে।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৫৮, ইমদাদুল ফাতওয়া ২য় খণ্ড)

১৩৫. প্রশ্ন ঃ উশরের বিধান জানতে চাই। আমার একটা জমি আছে। বর্গা দিয়ে রেখেছিলাম। সার বীজ কিছুই দেইনি। জমিতে বর্গার অর্ধেক ফসল ১ মণ ১০ সের সরিষা পেয়েছি এর ওশর কীভাবে কতটুকু কাদেরকে দেবো অথবা কোনো জমিতে বর্গার ভাগ ২ মণ ধান পেলাম ওশর কীভাবে দেবো?

উত্তর ঃ উশর শব্দের অর্থ হলো যে কোনো পূর্ণ জিনিসের এক দশমাংশ। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের সকল খরচ বাদেই সমস্ত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করে দেওয়া। জমী যদি ইজারা দিয়ে রাখা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবানুসারে মালিকের ওশর দিতে হবে। ইজারা বা ভাড়ার যে টাকা হাতে এসেছে জমি বাবদ সে টাকার দশ ভাগের এক ভাগ সাদাকা করে দেবে। আর যদি মালিক নিজেই ফসল করেন তাহলে সমস্ত ফসলে এক দশমাংশ সাদাকা করে দেবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ৬৬, ৬৯ পৃষ্ঠা)

সাদাকাতুল ফিতর
সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

১৩৬. প্রশ্ন ঃ বেনামাযীকে ফিতরা দিলে, ফিতরা আদায় হবে কিনা? যদি আদায় হয় তাহলে তা দলীলসহ জানাবেন। আর যদি আদায় না হয় তাও কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ জানাবেন।

উত্তর ঃ যাকাত ফিতরার যারা হকদার তাদের মধ্যে ফকীর-মিসকীনও রয়েছে। কাজেই দরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি নামাযী না হলেও তাকে ফিতরা দেয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যাকাত হলো কেবল ফকীর-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদেরকে এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য– এটা হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

(সূরা আত-তাওবা : ৬০)

১৩৭. প্রশ্ন ঃ সাদাকায়ে ফিতর (ফিতরা) কাদের উপর ওয়াজিব?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে যার নিকট তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের পরিমাণ মাল আছে তার উপর সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) পরিশোধের দায়িত্ব বর্তায়। তাকে তার নিজের ও তার পোষ্যদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য যারা ফিতরা দিতে অক্ষম তারাও যদি নিজেদের ফিতরা একে অপরকে দান করে তবে তারাও ফিতরা প্রদানের সাওয়াব পাবে।

১৩৮. প্রশ্ন ঃ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলিমের জন্য রমযানের রোযা ফরয। আবার ফিতরা হলো রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা স্বরূপ। আমাদের জানা মতে ঈদের দিনের সকালে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব। এখন কথা হলো যেসব অভাবী ব্যক্তি ফিতরা নিয়ে থাকেন, তাদের পক্ষে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব কিনা? অনেকে বলেন, ফিতরা যেহেতু রোযার ভুল-ত্রুটির কাফফারা স্বরূপ, সেজন্য দরিদ্র জনগণেরও ফিতরা দিতে হবে।

উত্তর ঃ সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দু'টি মত আছে। এক মতে ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় যদি কারো নিকট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন- বসবাসের ঘর, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, চলার বাহন ইত্যাদি ছাড়া নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য সম-সাময়িক বাজার মূল্যের সম-পরিমাণ) সম্পদ থাকে তাহলে ঈদের নামাযের পূর্বেই তার নিজের ও তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। তবে সে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। উপমহাদেশের অধিকাংশ লোকই এ মতের উপর আমল করে চলছে। এ মতে মিসকীন, গরীব লোকদের উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয় বরং তারা তা নিতে পারবে। (দেখুন: হেদায়া, ১/১৮৮–৮৯; কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ও অন্যান্য হানাফী ফিকহের কিতাব)

এক্ষেত্রে অপর মতটি হল, যার নিকট তার নিজের ও তার পরিবারবর্গের এক দিন ও এক রাতের খাবারের অতিরিক্ত অন্তত আড়াই কেজি পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী মওজুদ থাকে তার উপর তার নিজের ও তার অধীনস্থ তার পরিবার-পরিজনের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এ মতে মিসকীনরাই সাদাকাতুল ফিতর গ্রহণ করবে। (সাইয়্যেদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ : ১/৩৪৯, দারুল ফিকর বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ)

এ দুটি মতের যে কোন একটির উপর নির্দ্বিধায় আমল করা যায়। আর উভয় মতে যারা সাদাকাতুল ফিতর গ্রহণ করার উপযোগী সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। তবে হাদীসে এসেছে, সাদাকাতুল ফিতর রোযাদারকে অনর্থক কথা ও কাজ এবং অশালীন কথা থেকে পবিত্র করে, তাই যাদের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় সম্ভব হলে তাদের পক্ষেও তা আদায় করা উত্তম।

১৩৯. প্রশ্ন ঃ রাসূলের (সা.) যুগে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল বলে অধীনস্থ ব্যক্তিদের ফিতরা গৃহকর্তার পক্ষে দেওয়া ওয়াজিব ছিল। কিন্তু বর্তমানে যেসব কাজের ছেলে/মেয়ে বাসায় থাকে তারা বেতনভুক্ত। এমতাবস্থায় এই ধরনের অধীনস্ত কাজের মেয়ে/ছেলের পক্ষ থেকে গৃহকর্তার জন্য ফিতরা দেওয়া জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ বেতনভুক্ত যেসব কাজের ছেলে-মেয়ে বাসার কাজ করে থাকে তাদের গৃহকর্তার উপর তাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে তারা ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারে। এরা নিতান্তই গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়ে। তাই তাদের উপরও নিজেদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তারা কেবল খাওয়া-পরা ও কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাসায় কাজ করে থাকে। গৃহকর্তারাও তাদেরকে কাজের বিনিময়ে খাওয়া-পরা এবং বেতন দিয়ে থাকে মাত্র। গৃহকর্তারা এদের সার্বিক দায়-দায়িত্ব বহন করে না এবং তারাও সর্ব বিষয়ে গৃহকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয় বিধায় তাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা গৃহকর্তার উপর ওয়াজিব হয় না। বরং তারা গরীব হওয়ার কারণে গৃহকর্তারা তাদের যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর ও অন্যান্য দান-সাদাকা তাদেরকে দিতে পারবে।

১৪০. প্রশ্ন ঃ সাদাকাতুল ফিতর কাদেরকে দেয়া জায়েয এবং কাদেরকে দেয়া জায়েয নয়? আপন বোন, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্কন্যা, ভাগনে, ভাগনী, চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন এদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ সাদাকাতুল ফিতর গরীব-মিসকীনদেরকে দিতে হবে। যাদেরকে দেয়া যাবে না নিম্নে তাদের তালিকা দেয়া হল :

০১. ধনী ব্যক্তি।

০২. কাফির, মুরতাদ, নাস্তিক।

০৩. নিজের মূল ব্যক্তিবর্গ যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তৎপূর্ববর্তীগণ এবং নিজের শাখা-প্রশাখা যেমন ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী ও তৎনিম্নবর্তীগণ।

০৪. স্ত্রী।

এসব লোকদেরকে সাদাকাতুল ফিতর দেয়া জায়েয নয়। এ ছাড়া গরীব ভাই-বোন, চাচা, মামা ও তাদের সন্তানদেরকে এবং অন্যান্য গরীব আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই সাদাকাতুল ফিতর দেয়া জায়েয হবে। বরং নিজের গরীব নিকটাত্মীয়দেরকে দেয়া উত্তম।

(দেখুন: ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৩৩৭–৩৯; অন্যান্য ফিকহের কিতাবসমূহ)

১৪১. প্রশ্ন ঃ চাউলের মূল্যের হিসাবে ফিতরা দেওয়া যায় কিনা? কেজির হিসাবে একজনের ফিতরার পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ ফিতরার পরিমাণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহাবী আবু সায়ীদ আল খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা ছোট-বড়, স্বাধীন দাস নির্বিশেষে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' খাদ্যবস্তু বা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খুরমা কিংবা এক সা' কিসমিস ফিতরা হিসেবে আদায় করতাম এবং এভাবেই আমরা ফিতরা আদায় করতেছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা.) একবার হজ্জ কিংবা উমরা করার উদ্দেশ্যে আসলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন : সিরিয়ার অর্ধ সা' গম (মূল্যমানের দিক থেকে) এক সা' খুরমার সমান বলে আমি মনে করি। অতঃপর লোকেরা তা গ্রহণ করল। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বলেন : আমি আজীবন অর্ধ সা' গম দ্বারা ফিতরা আদায় করেছি। (রাওয়াহুল জামাআহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৪৯)

এ হাদীসে এসেছে খাদ্যবস্তু বা প্রধান খাদ্য দ্বারা আদায়কৃত ফিতরার পরিমাণ ছিল এক সা'। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হলো চাউল। কাজেই হাদীসের বর্ণনা মতে চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করলে ফিতরার পরিমাণ হবে এক সা'। সা' হলো পরিমাপ করার পাত্র। ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামগণ দুটি সা' এর পরিমাপ গ্রহণ করেছেন। হিজাযী সা' ও ইরাকী সা'। হিজাযী সা'র পরিমাণ হলো ২ (দুই) কেজি ৫০০ গ্রাম এবং ইরাকী সা'র পরিমাণ ৩ (তিন) কেজি ১৪০ গ্রাম। ফিতরার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব ইরাকী সা' গ্রহণ করেছে। অতএব কেউ চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করলে হানাফী মাযহাব অনুসারে প্রতিটি ফিতরার পরিমাণ হবে ৩ কেজি ১৪০ গ্রাম এবং আহলে হাদীস বা অন্য মাযহাব অনুসারে প্রতিটি ফিতরার পরিমাণ হবে ২ কেজি ৫০০ গ্রাম।

যেসব বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায় হানাফী মতে তার মূল্য দ্বারাও ফিতরা আদায় করা যায়।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-843-017-6